উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)
& Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Skill Enhancement Course)

কোর্সের শিরোনাম : সাংবাদিকতার ভাষা

কোর্স কোড : NSE-BG-02

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance
Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)
& Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Skill Enhancement Course)

কোর্সের শিরোনাম : সাংবাদিকতার ভাষা

কোর্স কোড : NSE-BG-02

মডিউল : ১, ২
Module : 1, 2

কোর্স বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Skill Enhancemen Course)	কোর্স লেখক Course Writer	কোর্স সম্পাদক Course Editor
মডিউল : ১ **Module : 1**	অনামিকা দাস সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল : ২ **Module : 2** মডিউল : ৩ **Module : 3**	শ্রী অমল সরকার এক্সিকিউটিভ এডিটর, 'দ্য ওয়াল' প্রাক্তন সিনিয়র এডিটর 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' গ্রুপ অনামিকা দাস সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং : গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঃ স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি ঃ

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,
প্রাক্তন অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ডঃ প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (Skill Enhancement Course)

কোর্সের শিরোনাম : সাংবাদিকতার ভাষা

কোর্স কোড : **NSE-BG-02**

মডিউল-১ বিজ্ঞাপন

একক-১ ❑ বিজ্ঞাপন কী? 9 – 27

একক-২ ❑ বিজ্ঞাপনের ভাষা 28 – 53

একক-৩ ❑ বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ 54 – 88

মডিউল-২ সাংবাদিকতার ভাষা

একক-৪ ❑ সংবাদের খুঁটিনাটি 91 – 109

একক-৫ ❑ সংবাদের ভাষা 110 – 120

মডিউল-৩ জনমানসে বিজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতার প্রভাব

একক-৬ ❑ জনমানসে বিজ্ঞাপন ও সংবাদপত্রের প্রভাব 123 – 134

একক-৭ ❑ জনমানসে সাংবাদিকতার প্রভাব 135 – 164

মডিউল ১ : বিজ্ঞাপন

একক ১ ❑ বিজ্ঞাপন কী?

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ বিজ্ঞাপন কী?

১.৪ বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ

১.৫ বিজ্ঞাপন বিবর্তনের ইতিহাস

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১.১ উদ্দেশ্য

বিপর্নন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞাপন। একটি ভোগ্যপন্য তৈরি করে, তার মূল্য নির্ধারণের পর সুন্দর আকর্ষক মোড়কে বিভিন্ন দোকানে পৌঁছে দিলেই বিপর্নন সফল হয় না। পণ্যটির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারীর সকলকেই সেই পণ্যটি সম্পর্কে অবগত করা প্রয়োজন। পণ্যটি সম্পর্কে জানার পর, পণ্যটি তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে তবেই গ্রাহক সেই পণ্যটি কেনার আগ্রহ অনুভব করবেন। পণ্য-প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে পণ্য-ব্যবহারকারীর সংযোগের মাধ্যম বা যোগসূত্র হল এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনই বিপর্ণনের সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাদুটি সমুন্ন করে। তাই বিজ্ঞাপন-ব্যতিরেকে আধুনিক বিপর্ণন এখন অচিন্ত্যনীয়।

বিজ্ঞাপন আজ আমাদের জীবনে এমনই অঙ্গাঙ্গীজড়িত যে, দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমরা কোনো-না-কোনোভাবে বিজ্ঞাপনে নিমগ্ন সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা, সমাদুমাধ্যম এবং পথের উভয় পার্শ্বে-থাকা ব্যানার বা ফ্লেক্সে আমাদের চোখ অভ্যস্ত। আমরাই গ্রাহক। আমরাই ব্যবহারকারী। তাই আমাদের অর্থাৎ গ্রাহকের মনোভাব যাতে বিশেষ একটি পণ্যেরচ অনুকূলে প্রবাহিত হয়, বিজ্ঞাপন সর্বদা সেই চেষ্টায় রত। তাই, আধুনিক বিজ্ঞাপন আজ মানুষের মনস্তত্ত্বের বিষয় জ্বর উঠেছে।

আলোচ্য এককে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা প্রদানই এই এককের উদ্দেশ্য।

১.২ প্রস্তাবনা

বিজ্ঞাপন কাকে বলে, বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ, বিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনায় বর্তমান এককটি আবর্তিত। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এককের অন্তিমে সংযুক্ত হয়েছে অনুশীলনী ও গ্রন্থপঞ্জি।

১.৩ বিজ্ঞাপন কী?

'বিজ্ঞাপন' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'বিশেষভাবেজ্ঞাপন', অর্থাৎ কোনোকিছু বিশেষভাবে জানানো। 'বিশেষভাবে' শব্দেই যুষ্ট যে, এটি 'সাধারণ' জ্ঞাপকের তুলনায় পৃথক। একটি উদাহরণ বিষয়টি যুষ্ঠ করা যাক। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির কোনো একটিই পণ্য বিক্রি করছে। ধরা যাক, চলভাষ বা মোবাইল। অ্যাবূপল, স্যামসাং, নোকিয়া, অপো, সোনি—ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, প্রতিটি মোবইল কোমুানীর বিজ্ঞাপনের ধরণ আলাদা। প্রচার-মাপকাঠিতে কোথায় তারা পৃথক? কোনো মোবাইল-কেম্পানীর জানাচ্ছে, তাদের অমুক মডেলে ডিমপ্লে-র আয়তন সর্বাধিক, কেউ দাবি করছে, তাদের চলভাযে ক্যামেরা অত্যন্ত উচ্চ-গুণসমুন্ন, আবার কেউ-বা বলছেন, ব্যাটারির দীর্ঘমেয়াদী নিশ্চয়তা একমাত্র তাদের চলভাষ-ই প্রদান করছে। অর্থাৎ পণ্য এক্ষেত্রে এক হলেও প্রতিটি চলভাষ-কোমুানিই 'বিশেষভাবে' তাদের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যকে গ্রাহক বা উপভোক্তার কাছে বারংবার দাগিয়ে দিচ্ছে—কখনও ছবিতে, কখনও গান বা ছিঙ্গেলের মাধ্যমে আবার কখনও-বা দৃশ্য-ত্রাব্য মাধ্যমের সুবিধা গ্রহণ করে মানুষের মনে সেই কোম্পানির বিশেষ পণ্যটি সম্পর্কে 'যজাগ' করে তুলছে। মানুষের মন অবচেতনেই স্বীকার করে নিচ্ছে, তমুক কোম্পানীর চলভাষটি উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ 'বিশেষভাবে জ্ঞাপন' বা বিজ্ঞাপন এভাবেই অনেকক্ষেত্রে হয়ে উঠছে আমাদের মনের নিয়ন্ত্রক। পার্থিব জীবনকে উপভোগের যে-স্পৃহা মানুষের নবাগত, তাকেই উস্‌কে দেয় বিজ্ঞাপন। সাধ এবং সাধ্যের অনুপাত যে-মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়, সেই মানুষও স্বপ্ন দেখতে থাকেন, কোনো একদিন তিনি একটি বিশেষ কোম্পানীর বিশেষ পণ্যের ভোক্তা হয়ে উঠবেন—জীবনযাপনে হবেন 'উন্নত'।

প্রশ্ন হল, বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা কী? কাকে বলব বিজ্ঞাপন? বিজ্ঞাপন ইংরিজিতে 'advertisement' ক্লদে হপকিনস ('Claude Hopkins') তাঁর 'Scientific Advertising' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'বিজ্ঞাপন মানে আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র সেলসম্যানশিপ বা বিক্রির পারদর্শিতা। ...বিজ্ঞাপনের কাজ কোনো কিছুকে কেবল তুলে ধরা নয়, কেবল পরিচয় তৈরি করা নয়, এর কাজ হল বিক্র করা'। ('বিষয় বিজ্ঞাপন', রংগন চক্রবর্তী)। অন্যদিকে ডেভিড ওগিলভি-র মতে, 'বিজ্ঞাপনের কাজ মনোরঞ্জন বা শিল্প করা নয়, বিজ্ঞাপনের কাজ হল ইনফরমেশন দেওয়া।' ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞাপনের অন্যতম কাণ্ডারী সুভাষ ঘোষালের মতে, 'একটি বিজ্ঞাপন কাজ করছে কিনা, অন্য বিজ্ঞাপনের তুলনায় সেটা ভালো না মন্দ—সেই বিষয়ে মতামত দিতে পারে কেবলমাত্র একজনই ; সে হল ক্রেতা। তার মানে বিজ্ঞাপনের একমাত্র কাজ বিক্রি করা।'

হে. ওয়ালটার টমসন-এর জেরেসি কালমোর বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছে, 'বিজ্ঞাপনদ এমন বার্তা যা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জানানোর জন্য এবং প্রভাবতি করার জন্য মূল্য দিয়ে প্রচার করা হয়।' ডেভিড বার্নস্টাইলের মতে, 'বিজ্ঞাপন বিভিন্ন পণ্য সংক্রান্ত ধারণার উৎস এবং সংযোগ—বা ব্যবহারকারীকে পণ্যটি ব্যবহার করতে উৎসাহী করে তোলে।' খ্যাতনামা বিজ্ঞাপন-লেখক রোজার রিভস্‌-এর মতে, 'একজনের ধ্যানধারণা অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর কলাকৌশলই হল বিজ্ঞাপন।'

এককথায় বলতে গেলে, বিজ্ঞাপন এমন এক সার্বজনীন সংযোগ মাধ্যম—যে মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন পণ্য প্রস্তুতকারর সংস্থা তাদের পণ্যের গুণাবলী প্রচার করেন এবং সম্ভাব্য গ্রাহক বা উপভোগের মনে পণ্যটি ব্যবহারের দুর্দম আকাঙ্খা জাগ্রত করে। গ্রাহক তার আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে হয় তখনই সেই পণ্যটি কেনেন, নয়তো ভবিষ্যতে কেনায় পরিকল্পনা করেন; অথবা পণ্যটি তাঁর সাধ্যতীত ছেলে তাকে বর্জন করেন।

বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য 'প্রচার' বা 'বিক্রি' হলেও, সমস্ত বিজ্ঞাপন পণ্যবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় না। সরকারি বেসরকারি বহু বিজ্ঞাপনদ জনসাধারণের সচেতনতারক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। 'How to Become an Advertising Man' গ্রন্থে জেমস ওয়েব ইয়াং জানাচ্ছেন, কোনো বিজ্ঞাপনের অন্তরে মূলত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে—(১) উদ্দেশ্য, (২) লক্ষ্য, (৩) বার্তা এবং (৪) মাধ্যম। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক—

(১) **উদ্দেশ্য (কেন এই বিজ্ঞাপন)** ঃ ধরা যাক একজনচ ব্যবসায়ী একটি বিশেষ ভোজ্যতেল আবিষ্কার করেছেন, যেটি দেখতে সাধারণ হলে ও গুণমানে উৎকৃষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য হল, বাজারে সেই ভোজ্যতেলকে বিক্রি করা। বিক্রির সেই প্রচারকার্যেই তিনি বিজ্ঞাপন সংস্থার দ্বারস্থ হলেন।

(২) **লক্ষ্য (Target Group)** ঃ ওই ভোজ্যতেল-ব্যবসায়ী/সমাজের কোন্ স্তরের মানুষকে লক্ষ্য করে বানিয়েছেন? তিনি তাঁর সোর্স কাজে লাগিয়ে দেখেছেন, আর্য-সামাজিক স্তরে একেবারে নিম্নবত্তি এবং উচ্চবিত্তশালী মানুষ সচরাচর তাঁদের ভোজ্যতেলের কোম্পানি পরিবর্তন করতে নারাজ। তাহলে সেই ব্যবসায়ীর ব্যবসার 'target group' কারা? আর্য-সামাজিক স্তরে যারা মধ্যবিত্ত। বিজ্ঞাপনী প্রচার ঠিক হলে এই মধ্যবিত্ত নতুন ভোজ্যতেল একবার হলেও ব্যবহার করে দেখবেন। অর্থাৎ, গ্রাম-শহরতলী শহরের মধ্যবিত্ত গৃহিনীরাই এই ভোজ্যতেলের 'target'।

(৩) **বার্তা (Message)** ঃ এবার ঠিক করতে হয়, বিজ্ঞাপনী-বার্তায় ঠিক কতটুকু জানানো হবে? বাজারে ভোজ্যতেলের অভাব নেই। ঘুম কমদামি থেকে দামি ভোজ্যতেল—সবই সুলভ। এত প্রতিযোগিতার মাঝে বিশেষ এই ভোজ্যতেলটি কীভাবে নিজের প্রচার করবে? এমনভাবে সেই বিজ্ঞাপনীবার্তা লেখা হবে, যাতে তা একটি নিটোল সামাজিক গল্প বলতে ও এবং মধ্যবিত্তস্তরের মানুষকে সেই গল্প বিশ্বাস করাতে সমর্থ হবে। ধরা যাক, গল্পটা হল এরকম—একই সংসারে জ্যাঠা-কাকা বাবার হেঁসেল আলাদা। একদিন কাকার হেঁসেলে সেই বিশেষ ভোজ্যতেলটি ব্যবহার করে রান্না হল। অতি সংক্ষেপে দেখানো হল, কীভাবে পেষাই যন্ত্রের চাকা-সর্ষে থেকে তেল নিষ্কাশিত করছে। এবার, রান্নার সেই সুবাসে আকৃষ্ট হলেন জ্যাঠা-বাবার পরিবারও। সমস্ত তিক্ততা ভুলে তখন জ্যাঠা-কাকা-বাবা আবার একত্র হলেন। একান্নবর্তী পরিবার রক্ষা পেল। ভাঙনের-মুখে দাঁড়ানো একটি যৌথ পরিবার শুধু ওই তেলের গুণেই অন্তিম ভাঙন রোধে সক্ষম হল। অর্থাৎ ভোজ্যতেলটি হয়ে উঠল ওই পরিবারটিকে পুনরায় একত্রকরণের একটি ধনাত্মক অনুঘটক (positive catalyst)

এখন, এই গল্পের সারাৎসারকে কীভাবে বিজ্ঞাপনী-বার্তায় পরিস্ফুট করা যায়? বিজ্ঞাপন এজেন্সিটি এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত বাক্যটিকে সাধু থেকে চলিতভাষায় পরিবর্তন করে বার্তা দিল—'এক তেলে চাকা ঘোরে, এই তেলে ঘোরে মন'। বাবা-জ্যাঠার 'মন' 'ঘুরল' বলেই-না তারা আবার একত্রিত হল!

(৪) **মাধ্যম (Medium)** ঃ বিজ্ঞাপনীবার্তা তো তৈরি হল। এখন এই বার্তা কোন্ মাধ্যমে target group-এর কাছে পৌঁছবে? মধ্যবিত্ত গৃহিনীদের কাছে সহজে পৌঁছতে গেলে বিশেষত সন্ধেবেলা দূরদর্শনে-যন্ত্রচারিত জেলি সোপ বা জনপ্রিয় ধারাবাহিকগুলির ফাঁকে বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দুধারে ও হোর্ডিং ব্যানার ও ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চলতে পারে। এছাড়া ফেসবুকের মতো সমাজমাধ্যম তো আছেই।

এইভাবেই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বার্তা এবং মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে কোনো একটি বিজ্ঞাপন।

১.৪ বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ

বিজ্ঞাপন আসলে প্রচার বা জ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে কোনো একটি পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। মাধ্যম এবং গ্রাহক অনুসারে বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদ আছে। যেমন, মুদ্রণমাধ্যম (লিফলেট, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, হোর্ডিং, ফ্লেক্স, ব্যানার ইত্যাদি), বৈদ্যুতিক মাধ্যম (বেতার, দূরদর্শন) এবং সমাজমাধ্যম।

অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের কার্যকরী প্রচারক্ষেত্রে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যানুসারেও বিজ্ঞাপন পৃথক হয়। কার্যকরী প্রচারক্ষেত্রে বলতে বোঝানো হয়, বিজ্ঞাপনটি ঠিক কতখানি ভৌগোলিক এলাকায় প্রচার বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। যদি বিজ্ঞাপনটি দেশের কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে (পূর্বাঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চল) প্রচারিত হয়, তাহলে সেটি জাতীয় বিজ্ঞাপন হিসেবে গণ্য হবে। কোনো নির্দিষ্ট একটি শহরে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হলে, সেটি হবে স্থানীয় বিজ্ঞাপন। আর, যে-বিজ্ঞাপন একযোগে বিভিন্ন দেশে সেই দেশের, প্রচলিত ভাষায় সম্প্রচারিত হয়, তখন সেই বিজ্ঞাপনটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উদারহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় টিভি-র কেব্‌ল চ্যানেলে যন্ত্রচারিত কোনো শাড়ি বা গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপন—স্থানীয় বিজ্ঞাপন। কলকাতার দুর্গাপুজো-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলি মূলত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য। সেগুলি আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন সমগ্রভারত-ব্যাপী প্রচারিত পোলিও টীকাকরণের বিজ্ঞাপন জাতীয় বিজ্ঞাপন। আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলার বিজ্ঞাপনগুলি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন হিসেবে পরিগণিত।

বিজ্ঞাপনের প্রকারভেদগুলি এখানে আলোকিত হল—

(১) স্থানীয় বিজ্ঞাপন ঃ

স্থানীয় বিজ্ঞাপনের অন্য নাম বলা যেতে পারে, খুচরো পণ্য বিক্রির জন্য প্রদেয় বিজ্ঞাপন। স্থানীয় বিজ্ঞাপন, সেই অঞ্চলের মানুষকে স্থানীয় ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটার, দোকান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক

তথ্য জ্ঞাপন করে। গৃহশিক্ষকরা অনেকক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ডিলারদেয় সঙ্গে যোগাযোগ করে শিয়ালেটের মাধ্যমে প্রচারকার্য গলান। কোভিড-পরবর্তী সময়ে হোম ডেলিভারি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলি মূলত সংবাদপত্রের সঙ্গেই পরিবেশিত হত। কখনো কোনো এলাকায় বিশেষ একটি দোকানে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে বা শুভ উদ্বোর্ধনের দিনটিতে বিশেষ মূল্য ছাড়ের ঘোষণাও স্থানীয় বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক মানুষরা জানতে পারেন। সেই অঞ্চলে কোন্ পণ্যটি কোন্ দোকান থেকে তাঁদের সাধ্যকুমারী ক্রয় করা সম্ভব।

(২) আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন ঃ

স্থানীয় বিজ্ঞাপনের তুলনায় বৃহত্তর গণ্ডীতে বিবরণ করে আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন। স্থানীয় বিজ্ঞাপন সেখানে কোনো একটি শহর বা শহর তলিতে আবদ্ধ, আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন সেখানে ভারতের কোনো একটি অংশের এক বা একাধিক রাজ্যে যন্ত্রচারিত। হস্তাশিল্পের মতো ক্ষুদ্র কারিগর শিল্পের যখন মেশা হয়, তখন তা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচারিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাঁদের হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে হাজির হন একটি নির্দিষ্ট স্থানে। এই মেলার প্রচারটি সেক্ষেত্রে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন হিসেবে গণ্য হয়।

(৩) জাতীয় বিজ্ঞাপন ঃ

সমগ্র দেশের গ্রাহকদের উদ্দেশে কোনো পণ্য পরিষেবার বিজ্ঞাপন বা সচেতনামূলক বিজ্ঞাপন যন্ত্রচারিত হলে, সেটি জাতীয় বিজ্ঞাপনের পর্যায়ে পড়ে। কোভিড-টীকাকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ২০২০-২০২২ সারা দেশব্যারী যে-প্রচার চলেছিল, সেটি জাতীয় বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত। অনেকক্ষেত্রেই এইধরনের জাতীয় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দেশের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সাহায্য নেওয়া হয়। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বিনোদন জগত থেকে শুরু বিভিন্ন ক্রীড়াব্যক্তিত্বকে সেই জাতীয় বিজ্ঞাপনের 'মুখ' করে তোলা হয়।

(৪) আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন ঃ

বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি দামি বা নামী পণ্য একযোগে অনেক দেশে বিক্রি করেন। সাধারণত যে দেশে বিপণনের ব্যবস্থা আছে, সেই দেশে তাঁরা প্রয়োজনবোধে উৎপাদনের ব্যবস্থাও করেন। সেক্ষেত্রে, জনপ্রিয় এবং আন্তর্জাতিক মানের সামগ্রীর প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের গুরুত্ব বিবেচনা করে সেইসমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলি পরিচিত আন্তর্জাতিক নাম এবং মোড়ক (packing)-এর সাহায্য নেন। যেহেতু যেকোনো আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যন্ত্রচারিত হয়, তাই একইসঙ্গে একাধিক দেশের উপযোগী বিষয় স্থিরীকরণ বহুজাতিক কোম্পানিগুলির প্রাথমিক কৃত্য হয়ে দাঁড়ায়। সেইকারণেই দেশ ও পরিবেশভেদে বিজ্ঞাপনের পাত্র-পাত্রী, আচার, আচরণ, ভাষাভঙ্গী—সবই পরিবর্তিত হয়; অথচ বিজ্ঞাপনের মূল আবেদনটি থাকে অপরিবর্তিত। মানধিক কালব্যাপী অলিম্পিক অনুষ্ঠান চলার সময় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যন্ত্রচারিত হয়। দেশ-ভেদে ভাষা হয়ে যায় পৃথক; কিন্তু মূল বিজ্ঞাপণী-বার্তাটি থাকে অক্ষত। এটিই বল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন।

(৫) প্রতিষ্ঠানগত বা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ঃ

কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সুনাম বৃদ্ধিতে সেই কোম্পানির সদর্থক প্রচারের জন্য যে-বিজ্ঞাপন করেন, সেই বিজ্ঞাপনকেই প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপন বলে। এই বিজ্ঞাপনে কোনো বিশেষ পণ্য বা পরিষেবার প্রচারের পরিবর্তে কোম্পানির ইতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলে। কোম্পানির নানাবিধ কাজকর্ম, ক্রমোন্নতি, রাজস্ব খাতে দেয় কর বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন এবং বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে কোম্পানির অংশগ্রহণের বিবরণ দিয়ে জনসাধারণের মনে কোম্পানি সম্পর্কে একটি সদর্থক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করে এই প্রতিষ্ঠানগত বা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন। প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য কোম্পনির ভাবমূর্তি (image) গড়ে তোলা।

কোম্পানির ভাবমূর্তির কারণেই কোম্পানি-সৃষ্টি পণ্যের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়। ব্যবহারকারীদের মনে কোম্পনির তৈরি পণ্যগুলি সম্পর্কে একটি সদর্থক বিশ্বাস জন্মায়। যেমন, হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানি যদি কোনো নতুন পণ্যের প্রচার করেন, ব্যবহারকারীরা সেটি একবার পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী হবেন। কারণ, ব্যবহারকারীর মনে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রস্তুতকারক কোম্পানি হিসেবে হিন্দুস্থান লিভারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল। হিন্দুস্থান লিভারের ভাবমূর্তির জন্যই ব্যবহারকারীরা এই কোম্পানির নতুন পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হবেন। কিন্তু এই একইপণ্য অপেক্ষাকৃত-অনামী কোনো কোম্পানি বাজারে আনলে, ব্যবহারকারীরা সহজে সেই পণ্যটি না-ও গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, সেই অজানা কোম্পানির তুলনায় হিন্দুস্থান লিভারের ভাবমূর্তি জনমানসে উজ্জ্বলতর।

(৬) জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন (Public Service Advertisement) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনের মতো জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন ও কোনও পণ্য বা পরিষেবা বিক্রির উদ্দেশ্যে নির্হিত হয় না। মূলত সামাজিক কল্যাণে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন করা হয়। যেমন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের করণীয় কী, সেই সম্পর্কে বিজ্ঞাপন তৈরি হলে তা জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন হিসেবে কর্তব্য। আবার সাক্ষরতা অভিযান, পোলিও টীকা, কোভিড টীকা গ্রহণের মতো বিজ্ঞাপনগুলি আসলে জনসাধারণের সচেতনতার উদ্দেশ্যে নির্মিত।

(৭) সরাসরি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন (Direct Response Advertisment) ঃ

কোনো পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে-বিজ্ঞাপন নির্মিত হয়, সেটিই হল সরাসরি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন। দূরদর্শন বা মোবাইলের লাইভ অনুষ্ঠানে যখন ঘোষিত হয়, 'আসুক নম্বরে কোন করে এখনই অর্ডার দিন' তখন বোঝা যায়, যে তাকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণের জন্যই সেই বিজ্ঞাপনে নির্যতন। এর উদ্দেশ্যেই হল, গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া দ্রুততার

সঙ্গে প্রত্যক্ষকরণ। অনেক সময় মোবাইলে ফোনের মাধ্যমেও এই আবেদন জানানো হয়। তবে সরাসরি বিক্রির জন্য ব্যবহৃত হতে প্রত্যক্ষ বাক বা direct mail । আগে ডাক-ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকরা বিভিন্ন জিনিসের (হতে পারে বই বা পত্রিকা) বিজ্ঞাপন পেতেন। বর্তমানে মোবাইল-যুগে অনেক সহজে ও অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময়ে কোনো পণ্য গ্রাহকমানসে পৌঁছায়।

(৮) শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন (Classfied Advertisement) ঃ

মুদ্রণ-মাধ্যমে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনের যে দুটি শ্রেণী সাধারণভাবে চিহ্নিত, তার প্রথমটি হল শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে সংক্ষিপ্ত আকারে, সরল ভাষায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বার্তা প্রচারিত হয়। সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেশের বিষয়েই শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হয়। যেমন, বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনা-বেচা, কর্মসংস্থান, পাত্রপাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। সংবাদপত্রে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের শ্রেণীবিভাগ করে, একই বিষয়ভুক্ত বিজ্ঞানগুলি পরপর শ্রেণীবদ্ধভাবে মুত্রিত হয় বলেই এই বিজ্ঞাপনগুলি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন নামে পরিচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিয়মিত আয়ের উৎস এই শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন।

৯. প্রদর্শমূলক বিজ্ঞাপন (Display Advertisement) ঃ

মুদ্রণ-মাধ্যমে প্রদর্শিত বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় শাখাটি হল এই প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্রে এবং পত্রিকায়, যে-বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিবরণ, চিত্র, জ্ঞাতব্য তথ্যাদি বিজ্ঞাপনদাতায়ত প্রয়োজনঅনুসারে আকর্ষভাবে প্রকাশিত হয়, সেই বিজ্ঞাপনই হল প্রদশিমূলক বিজ্ঞাপন। সম্ভার, ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণে ও আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সাধারণত এই ধরনের সব বিজ্ঞাপনেই ছবি ব্যবহৃত হয়। এইকারণেই বিভিন্ন পণ-প্রস্তুতকারী সংস্থা প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপনের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল—এর প্রমাণ, ভারতে 'সর্বাধিক প্রচারিত' এক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম এবং কখনো কখনো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্রিকা নিয়মিত আয়োজন মূলত প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে থাকেন। অর্থাৎ এককথায়, মুদ্রণমাধ্যমে আয়ের প্রধান উৎস এই প্রদর্শনমূলক বিজ্ঞাপন।

১.৫ বিজ্ঞাপন ঃ বিবর্তকের ইতিহাস

'বিজ্ঞাপন' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'বিশেষভাবে জ্ঞাপন'। জনমানসে কোনো তথ্য জ্ঞাপনের বঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থ অঙ্গীভূত হয়েছে আধুনিক যুগে; তার আগে যা ছিল, সবই হল 'লৌকিক বিজ্ঞাপন'। সেগুলির কোনো বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল না। বরং জনগণকে অবগতকরণের স্বার্থে নানামাধ্যমে তা প্রচারিত হত।

ডঃ চন্দন বাঙ্গাল তাঁর 'বিজ্ঞাপন নিয়ে' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন, 'আগুন জ্বালিয়ে সংবাদ প্রেরণের ঘটনা পরবর্তীকালে অনেক রাজা-মহারাজাদের ইতিহাসে

দেখা গেছে। রাজা-মহারাজার সংবাদ প্রেরণের জন্য রাজধানী থেকে নির্দিষ্ট কয়েক ক্রোশ দূরে দূরে উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করতেন। ....শত্রুপক্ষের আক্রমণ বা অন্য কোনো বিপদ সংকেত বোঝাতে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি একটি স্তম্ভে প্রথমে, তারপর প্রথম স্তম্ভের আলো দেখে দ্বিতীয় স্তম্ভ, এরপর তৃতীয়... চতুর্থ... পঞ্চম.... এইভাবে পর্যায়ক্রমিক স্তম্ভের শিখরে আগুন জ্বালিয়ে রাজধানী লাগোয়া স্তম্ভ পর্যন্ত আগুন জ্বালানো হতো। এই আগুন দেখে রাজধানীর প্রত্যেকে আসন্ন বিপদ থমকে সতর্ক হয়ে যেতেন।

আবার অনেক ক্ষেত্রে ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি ইত্যাদির সাধমেও বিপদ সংকেত দেওয়া হতো। এখনো গ্রামে-গঞ্জে কোনো বিপদ, বিশেষত ডাকাত পড়লে শাঁখ বাজানোর রীতি লক্ষ্য (যৎ) করা যায়। যদি আমরা ধর্মীয় আকারের বাইরে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করি, তাহলে নববধূর গৃহ প্রবেশ কিনা যদ্যোহাতের গৃহ প্রবেশ্যের সময় দেওয়া শঙ্খধ্বনিকেও বিশেষ জ্ঞাপন কিম্বা বিজ্ঞাপন হিসেবে গ্রহণ করা বলে। এই ধ্বনির মাধ্যমে পড়শির কাছে খবর পৌঁছে যায়।

প্রাচীনকালে রাজা-রাজড়া, জমিদারেরা বিশেষ কোনো বক্তব্যকে প্রজাসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চমৎকার এক কৌশল নিতেন। যাকে আমরা চলতি কথায় বলি—"ঢ্যাঁড়া পেটানো"। একজন ব্যক্তি একটি ঢোল সঙ্গে নিয়ে বাজাবে বা চৌরাস্তায় অর্থাৎ যেসব জায়গায় লোকসমাগম একটু বেশি সেখানে উপস্থিত হতেন। প্রথমে ঢোল বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তারপর মূল বক্তব্য বিষয় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন। আবার কখনো কখনো ঢোলের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তব্য বিষয়টিকে বলা হতো। গ্রামেগাঞ্জের যোলআনা কমিটি বিশেষ কোনো সভা-সমিতি কিম্বা সিদ্ধান্ত নিহত জনসমাগমের জন্য এই ধরনের পদ্ধতি এখানো অবলম্বন করে থাকেন। এখনো পঞ্চায়েত বা পুরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো খবরাখবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য "ঢ্যাঁড়া পেটানো" হয়। কাছেই আলোচ্য এই প্রথাটির অবলুপ্তি এখনো ঘটেনি। এটি ও এক ধরনের বিজ্ঞাপন।'

যদিও আজকাল ক্রমেই শহর গ্রামকে গ্রাস করায় সেখানে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্য জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ঢ্যাঁড়া পেটানোর প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। বরং কোনো যানবাহন ভাড়া করে সেখানে আগে-থেকে-রেকর্ড-করা কোনো বক্তব্য শোনানো হয়, নয়তো কোনো ব্যক্তি মাইক্রো,,, সেই বক্তব্য শোনাতে শোনাতে গ্রাম পরিভ্রমণ করেন।

উপরি-উক্ত গ্রন্থ সূত্রেই জনা যাচ্ছে, 'বিজ্ঞাপনের যে লিখিত চেহারা তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছোতে আরো বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন অর্থে প্রাচীন যুগের অনেক সম্রাট তাঁদের রাজ্য চালনার সুবিধের জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পাহাড়ের গায়ে অথবা পাথরে খোদাই করে রাখতেন জ্ঞানকে অবহিত করবার জন্য। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় ৩০০ খিস্টপূর্বাব্দের সম্রাট অশোকের শিলালিপি। এছাড়াও চুনাগড় লিপি, লক্ষণ সেনের আনুলিয়া শিলালিপি, নানাঘাট শিলালিপি, নাসিক প্রশস্তি, এলাহাবাদ প্রশস্তি, আইহোল প্রশস্তি, হাতিগুম্ফা লিপি ইত্যাদিতেও জনগণকে বিশেষভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু

বার্তা ও তথ্য খোদিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আলোচ্য বিজ্ঞাপনগুলির উদ্দেশ্য মূলত অবাণিজ্যিক হলেও এর আগে থেকেই যে বাণিজ্যিকভাবে বিজ্ঞাপন চালু হয়ে গিয়েছিল তা অধিকাংশ গবেষকই মেনে নিয়েছেন। অনুমান করা হয়, প্রায় ২২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাণিজ্যিক কিংবা অবাণিজ্যিক উভয় বিজ্ঞাপন ছিল মূলত এধরনেরই লেখ্য। কখনো পাথরের গায়ে, কখনো তামা কিম্বা ব্রোঞ্জের হাতের উপর খোদাই করে পণ্য বা তথ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবার চেষ্টা করা হতো এই সময় পথের বিজ্ঞাপণগুলিতে।

বিভিন্ন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভূমধ্যসাগরবেষ্টিত দেশগুলিতে খননকার্য চালান। এই দেশগুলি আনুমানিক খ্রিষ্ট জন্মের ৩০০০ বছর আগেকার ভূখণ্ড হিসেবে পারিচিত। খননকার্যের ফলে মাটির বাটিতে খোদাই করা বেশ কিছু অক্ষর পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে লিপি বিশারদেরা এগুলি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। গবেষণা থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তা খুবই চমকপ্রদ। গবেষকরা মনে করেছেন, মাটির বাটিতে খোদাই করা ওই অক্ষরগুলি ছিল সলম পুথিলিপিকর, জুতো প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপন।

আনুমানিক ২০০০ খ্রিষ্টাপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের হিমারবির রাজত্বকালেও বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের নমুনা পাওয়া গেছে। একই নমুনার সাক্ষাৎ সিন্ধু সভ্যতাতেও মিলেছে। শ্রীবসের ভগ্নাবশেষে যে বিজ্ঞাপনটি পাওয়া গেছে তার বয়স আনুমানিক ৩০০০ বছর। এটি প্যাপিরামের উপর লিখিত হয়েছিল। ছাপু নামে একজন মিশরীয় তাঁতি বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিলেন। এতে লেখা ছিল—শেম নামে তাঁর পলাতক ক্রীতদাসকে ধরে আনতে পারলে এক স্বর্ণ মুদ্রা এবং ওই পলাতক ক্রীতদাসের সঠিক (সৎ) খবর যদি কেউ দিতে পারেন তাহলে তাকে অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

গবেষকদের মতে, পূর্ব চীনের ইউনান শহর থেকে সং রাহবংশের সময়কালে তৈরি ব্রোঞ্জের পাতের লেখা বিজ্ঞাপনটি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। New Family Needle কোম্পানি তাদের তৈরি সূচ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপকে লেখে— "We buy high quality steel rods and make fine quality needles, to be ready for use at home in no time." এই বিজ্ঞাপনের উপরের অংশে ছিল খরগোশের লেগো।

তবে এরও আগে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকায় পাথরের দেওয়াল খোদাই করে কিংবা গ্রাফিও অঁকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতির নমুনা মিলেছে। ভারতে প্রায় ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ আগে পাথরে খোদাই করা নোটিশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাসের উপর লিখে পণ্যের প্রচার করা হতো। পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষে। প্রাচীন আরবের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্যাপিরাসের উপরে লেখা বাণিজ্যিক বার্তা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি লিফলেট ব্যবহারের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ বছর আগে ও প্রাচীন গ্রামে এধরনের বিজ্ঞাপনের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল।

ইউরোপে চারণকরিয়া পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবার জন্য, জনঘনত্বপূর্ণ নানা অঞ্চলে গিয়ে ঘুরে তালে লয়ে ছন্দে গীতিকবিতার ঢঙে নানা পণ্যের গুণগান করতেন। এঁদের মুখে

মুখেই বিভিন্ন পণ্য জনমানসে প্রচার লাভ করত। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনের গীতিকবিতা নিয়ে সংকলিত হয়েছে 'Les Cris de Paris' বা 'Street cris of Paris' মূলত ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিজ্ঞাপনের গীতিকবিতা এই সংকলমে স্থান পেয়েছে। আজকের হকারদের পণ্য বিক্রির কৌশলটিয় উৎস, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় আধুনিক মুদ্রণের ইতিহাসের শুরু হয়েছে আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দের ও আগে। অনেক গবেষক মমে করেছেন, এই ইতিহাসের যাত্রা শুরু চীনের হান সাম্রাজ্যের সমাজকালে। এই সময়ে রেশমের কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা ছবি ও নকশা মুদ্রিত করবার চল ছিল। বর্তমান গবেষকরা এই পদ্ধতিটিকে "Old Block printing" বলেছেন। মোটামুটিভাবে নাম শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত । পদ্ধতির জন্য কাপড়, স্ট্যাম্প ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো।'

একথা বলাই বাহুল্য যে, শিল্প বিপ্লবের পরই-বিজ্ঞাপন শিল্প সংঘটিত হয়ে ওঠে। জার্মানিতে জোহানেস গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গেই শুরু হয় পাশ্চাত্য মুদ্রণের যুগ। ডঃ চন্দন বাঙ্গাল আমাদের জানাবেন যে, ডাইজেটদ তিতেয়ো যুদুকির 'Dimond Sutra' নামাঙ্কিত বৌদ্ধ দর্শনের গ্রন্থটিই পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রিত বই। সেটি Old block printing-এর মাধ্যমে আনুমানিক ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। আধুনিক মুদ্রণ-যন্ত্রে ছাপা গ্রহটি হল ১৪৫৫ সালে মুদ্রিত ল্যাটিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। পরবর্তীকালে সেটি 'গুটেনবার্গ' বাইবেল' নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মুদ্রিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন কোনটি? মনে করা হয়, উইলিয়াম ক্যাকসটন তাঁর 'The recuyell of the Historyes of Troye' শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থ প্রচারেয় উদ্দেশ্যে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কাগজে একটি বিজ্ঞাপন প্রদান করেন। সেটিই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মুদ্রিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। এই প্রবণতাটিই পরবর্তীকালে হ্যাণ্ডবিলের আকার ধারণ করে। আনুমানিক ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি ছিল একটি ওষুধের বিজ্ঞাপন।

২৩ আগস্ট ১৬২২-এ নিকোলাস ব্রাউন এবং ন্যাথানিয়েল বাটার ইংল্যাণ্ডের 'The Times Handlist' সংবাদপত্রে তাঁদের প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন প্রদান করেন। বলা হয়, সেটিই ছিল শপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন। ভেনিসে 'The Mercurius Gallobelgicus' বা সংক্ষেপে 'Mercury' শীর্ষক এক সাপ্তাহিক সরকারি গেজেটে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হত। পণ্যের প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে এই ধারণাটি ক্রমে বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন দেশে—ইতালি, জার্মানি, হল্যাণ্ড, ব্রিটেনে। সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যাপক প্রচলন ঘটে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের। এগুলিতে ঘেমনন্ত পণ্য বিজ্ঞাপিত হত, সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল না। চকলেট, কফি, ওষুধ, বই, ভোগ্যপণ্য, নিরুদ্দেশ সংবাদ ইত্যাদি। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞাপনে প্রথম ছবির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞাপনদাতা দুটি মূল্যবান রত্ন খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান করেছিলেন।

১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনে প্রকাশ পায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Corant'। কিন্তু কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৭০৪-এ প্রকাশিত হয় 'The Boston News letter'।

সেটিতে নিউইয়ার্কের লব্ আইল্যাণ্ডের অষ্টার কে-তে জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে সেটিকেই সংবাদপত্রে মুদ্রিত প্রথম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

১৭০৪ থেকে ১৭২৯—এই পঁচিশ বছরে বিজ্ঞাপনের জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটানোর কাণ্ডারী ছিলেনচ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ১৭২৯-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি প্রকাশ করেন 'The Pencilvenia Gezzeett' নামক একটি দৈনিক সংবাদপত্র। পত্রিকাটিতে একটি পৃথক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের দ্রব্য বরাদ্দ ছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিকভাবে বিজ্ঞাপনের প্রচার ও প্রয়ার। এই নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাধিতে প্রচুর বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হত। ফলে কাগজটিতে সম্পাদকীয় লাভের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় বিপুল। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রটি এইজাতীয় বিপুল মুনাফা অর্জনের পর ও পত্রিকার দাম বাড়ানোর পরিবর্তে অনেক হ্রাস করে। ফলে স্বাভাবিকতাভাবেই পত্রিকাটির বিক্রি বহুগুণ বেড়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই বিজ্ঞাপন জগতে রূপচর্চার জন্য হরেকরকম প্রসাসন সামগ্রীর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দে 'Spectator' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় সুন্দরী নারীদের হাতের সৌন্দর্য রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসাসন সামগ্রীর একটি বিজ্ঞাপন।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সুত্রপাত ঠিক কেন্ সময়ে ঘটেছিল, তা নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও, অদ্যাবধি সংবধিত বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপনটি হল। পঞ্চানন কর্মকার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের একটি বিজ্ঞাপন। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে 'Calcutta Chronicle' শীর্ষক পত্রিকায় সেটি প্রকাশ পায় । (উৎস-'বিজ্ঞাপন নিয়ে ডঃ চন্দন বাঙ্গাল)

শ্রী রংগন চক্রবর্তীর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১৭৮৯ সালে কলকাতায় 'বেঙ্গল গেজেট' ক্রমে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পর ১৭৮৬ সালের মধ্যে চারটি সাপ্তাহিক এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। 'বেঙ্গল জার্নাল' নামক কাগজটি সরকারি সমস্ত বিজ্ঞাপনের প্রকাশস্থল ছিল। 'দ্য করিয়া' নামক বম্বে-থেকে-প্রকাশিত সংবাদপত্রটি মারাঠি, গুজরাটি, কোম্পানি, উর্দু ও কন্নড় ভাষায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করত।

বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রথম যুগে প্রধান ছিল শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বা ক্লাফিনয়েড অ্যাডভার্টিজমেণ্ট। বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত ডাক-ঠিকানায় অর্ডার দিলে প্রত্যাশিত পণ্যটি পাওয়া যেত। প্রথম দিকের বিজ্ঞাপনে অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই ছিল পেটেল্ট ওযুধের। তৎকালীন কলকাতায়-ন্দিত বৃহৎ পণ্যাধার ছিল হোয়াইটওয়ে লেড্ল বা আমি অ্যাণ্ড নেডি স্টোর্স-এদের খদ্দের ছিল মূলত ভারতে বসবাসকারী সাহেব মেম। ফলে মূলত তাদের জন্যই বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হত। মেয়েদের প্রসাযনা, পুরুষদের সাহেবি পোশাক, রেস্তোরাঁ আর হোটেলের বিজ্ঞাপনও ছাপা হত। বিজ্ঞাপিত পণ্যের মধ্যে ছিল সাহেব তথা দেশীয়, ধনী ব্যক্তিদের জন্য বিনোদন, মোটর গাড়ি, বৈদ্যুতিক জিনিস, গ্রামোফোন, ফ্যুট বানোনোর দোকান, বাড়ির লিষ্ট ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যেরও অভাব ছিল না। সেই সময় ছিল না কোনো বিজ্ঞাপন এসেছিল।

মূলত দৈনিক সংবাদপত্রগুলিই ব্যাবসাদারদের থেকে বিজ্ঞাপন জোগাড়ের উদ্দেশ্যে এজেণ্ট বিয়োগ করত। তাদের প্রাপ্য কমিশনের পরিমান ছিল মোটামুটি এক শতাংশ। পরবর্তীকালে এই কমিশন পনেরো শতাংশে নির্ধারিত হয় এবং বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি হিসেবে নানা রদবদলের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণভাবে সেই কমিশনই প্রচলিত ছিল। বৃহৎ এজেন্সিরা সম্পূর্ণ কমিশন পেলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এজেন্সিগুলির সমস্যা হওয়ায় ক্লায়েস্টদের পক্ষ থেকেই বলা হত কমিশন ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বর্তমানে এই ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। 'বিটেনারশিপ ফি' বা মাসিক একটি নির্দিষ্ট বাঁধা পেশাদারি দক্ষিনার বিনিময়ে এজেন্সিরা কাজ করে।

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ভারতবর্ষে বিলাতি পণ্য বর্জন এবং দেশি পণ্য ব্যবহার শুরু হয়। 'Rays before Satyajit' গ্রন্থে ছন্দক সেনগুপ্ত আলোচনা করেছেন, কীভাবে যত্যদুতের পূর্বপুরুষ সুকুমার রায়-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার ও আত্মীয়বর্গ সেইসময় স্বদেশী পণ্য নির্মানে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী এক্যের বিপরনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপেন্দ্রকিশোরের ছোটোবোসের স্বামী হেমেন্দ্রমোহন বসু। সাহেবি আধুনিকতার পরিবর্তে তিনি স্বদেশি আধুনিকতায় 'কুণ্ডলান' চুলের তেল, 'দেলখোশ' পারফিউম ও পানের সঙ্গে 'অনুপান' হিসেবে 'অঠ্ঠলীন' তৈরি করেন। হেমেন্দ্রমোহন-আবিষ্কৃত নানাবিধ পণ্যের মধ্যে এই তিনটিই ছিল বিখ্যাত। বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগেই তিনি ব্যাবসা শুরু করেন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। চীন, শ্রীলঙ্কা, ইরান, জাপান—ইত্যাদি নানা দেশে তাঁর বাণিজ্য প্রসারিত ছিল।

স্বদেশি পণ্যের পাশাপাশি যেই পণ্যের বিক্রির ক্ষেত্রে হেমেন্দ্র মোহন বিজ্ঞাপনের নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ করেছিলেন। তিনটি বিখ্যাত পণ্যের একত্র বিজ্ঞাপণটি ছিল এইরকম—"কেশে মাখো কুণ্ডলীন, রুমালেতে দেলখোশ, পানে খাও তাম্বুলীন, ধন্য হোক এইচ বোস"। কেশতৈল কুণ্ডলীনের প্রচারে ও প্রসারে তিনিই কুণ্ডলীন পুরস্কারের প্রচলন করেন। ১৮৯৬ সালে প্রবর্তিত এই পুরস্কার প্রদত্ত হত ছোটগল্পকারদের। হেমেন্দ্রমোহন নিজস্ব কুণ্ডলীন প্রেম থেকে একটি বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করতেন, সেই সংখ্যায় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি মদ্রিত হত। গল্পলিখনের শর্ত ছিল একটিই—গল্পগুলিতে কুণ্ডলীন কোশতৈল বা দেলখোশ সুবাসের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। কুণ্ডলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম বর্ষে বিজয়ী হন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি তাঁর প্রাপ্য মানবিক প্রদান করেন রবিবারের ব্রাহ্ম স্কুলে। (উৎস-বিষয় বিজ্ঞাপন, রংগন চক্রবর্তী)

বাংলা বিজ্ঞাপনের জগতে হেমেন্দ্র মোহন বসুর পরেই উল্লেখ্য শ্রী মতিলাল বসু। তাঁর ছিল তেলের ব্যবসা। শ্রীমতিলাল বসু এণ্ড কোম্পানি থেকেই প্রস্তুত হত লক্ষীবিলাস তেল। এই তেলের বিজ্ঞাপনে দাবি করা হত, এই তেল যাবতীয় শিরঃপীড়া, হাত-পা জ্বালা ইত্যাদি প্রতিকারে অব্যর্থ। কোম্পানির মতে, সুগন্ধি গোলাপ ফুলের সুগন্ধে মাথা ঠাণ্ডা করার পাশাপাশি প্লাহা-যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরোনো চর্মরোগ থেকে মুক্তিলাভের জন্য লক্ষীবিলাস তেল অত্যন্ত কার্যকরী।

শ্রী রংগন চক্রবর্তীর গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বেতে প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞাপন এজেন্সি তৈরি হয়। নাম ছিল 'বি দওারাম অ্যান্ড কোং'। এরপর ১৯০৭-এ হল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি'—এটিও হল কোশেতে। কলকাতায় 'ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজিং প্রতিষ্ঠিত হল ১৯০৯-এ। ১৯১৪-য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধের খবর পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন মানুষ ভরসা রাখল সংবাদভাবে। দৈনিক খবরের কাগজের কাটাত গেল বেড়ে। যুদ্ধের পরেই-ভারতীয় বাহারে বিদেশি পণ্যের আগমন শুরু হলে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনও বাড়ল পাল্লা দিয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেইক বিজ্ঞাপন এজেন্সির সংখ্যাও যে-সেইসময় বর্ধিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম বহুজাতিক এজেন্সি হিসাবে ভারতে আসে জে. ওয়াটার টমসন'। বহুজাতিক সংস্থা লিভার ব্রাদার্স ব্যবসার বিজ্ঞাপনে 'লিনটান' নামের (লিডার্স ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাডভাটাইজিং জার্ভিসের সংক্ষিপ্ত রূপ) এজেন্সি তৈরি করে।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস অনুসারে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল বাংলায় প্রথম রেডিও যন্ত্রচার শুরু হয়। স্বল্পদিনের মধ্যেই এই যন্ত্রটি বাংলার জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। তখন বিভিন্ন রেডিও কোম্পানিকে তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁদের রেডিও-র বিজ্ঞাপন প্রদান করতে দেখা যায়। যেমন—

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'রবিবারের চিঠি' পত্রিকায় ডেরেডিও কোং নামের-একটি রেডিও কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেশ। সেটি ছিল এইরকম

" ১০্ টাকায়
মেন সেট রেডিও
ও লাউড স্পিকার
৩ ভালঙ্
ডি, সি,
মেন সেট

১০ টাকায় মাসিককিস্তিতে আমরা আপনার বাড়িতে ৩ ভালঙ্ ডি, সি, মেন সেট, লাউড স্পিকার ও সমস্ত সরঞ্জামসহ রেডিও সেট বসাইয়া দিয়া আসিব।

মূল্য ১১৬।।০ টাকা। অর্ডার দেওয়ার সময় ৩৬।।০ টাকা অগ্রিম দেয়—বক্রী টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ১৲ টাকা কিস্তিতে।"

রেডিওর দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এন.বি.সেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স কোম্পানি 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় তাদের বিজ্ঞাপন দেয়—

''আজ ১০ বৎসর—
সেনোলায়
।
রেডিও সেট
।
রেডিও গ্রামো
।
এমপ্লিফায়ার
।
সহর ও পল্লীতে

প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। সমস্তই বিলাতী সরঞ্জাম-সুর ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়, দাশ খুবই কম।

আজই অনুবন্ধান করুন।"

বাংলার পুলিস বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনরেল বাংলার বিপ্লবীদের মাথার দাম ধার্য করেও বিজ্ঞাপন দিতেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মাষ্টারদা সূর্য সেনকে নিয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত, নব-আবিষ্কৃত রসোমালাইয়ের বিজ্ঞাপন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞাপনটিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের পুরস্কার দিকটিও প্রকাশিত—

''নূতন আবিষ্কার! নূতন আবিষ্কার!
'রসোমালাই'
ধূলা ও মাছি আবরক কাঁচের
ঘরে রক্ষিত
আসল বাগবাজার
রসগোল্লা ও সন্দেশ
শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দাস
৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাকো
'''

'ক্যালকাটা কেমিক্যাল' নামক একটি সংস্থা নিয গাদের উপকারিতাকে তাদের পণ্য প্রস্তুততে কাজে লাগিয়ে মার্গো সাবান, মিম টুথপেস্ট, রেণুকা টয়লেট পাউডার ইত্যাদি বানায়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কোম্পানির মার্গো সাবানের বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম—

"এই দারুণ গরমের দিকে—
আরামে থাকা যায়, যদি প্রতিদিন স্নানের ,,,
ক্যালকেমিকোর
সুগন্ধিনিম টয়লেট সাবান
মার্গোযোগ
ব্যবহার করা হয়, এবং স্নানান্তে দুবেলা মাখা হয়
ক্যালকেমিকোর সুগন্ধি নিমের টয়লেট পাউডার
রেণুকা
ব্যবহার ছুলি, মেচেতা, ঘামাচি, চুলকানি দূর হয়
এবং বর্ণের ঔজ্বল্য বৃদ্ধি করে।
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-বালিগঞ্জ, কলিকাতা"

১৯৩৭-এ রোডার্স অ্যাণ্ড কোং-এর বাদ্যযন্ত্রের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় যে, শুধু এই দেশেই নয়, বিদেশেও এই কোম্পানির বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল—

"এবার পূজায় বাদ্যযন্ত্রের মূল্য আশাতীত হ্রাস হইল।
আমাদের যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র বহুদিন হইতে ভারতের
নানাস্থানে এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশে পর্য্যন্ত আদৃত হইতেছে।
তার চারণ আমাদের প্রত্যেক যন্ত্রের অংশ নিখুঁত ভাবে
তৈরি এবং তদ জন্য গ্যারাণ্টী দেওয়া হয়।
এবার পূজায়, রেকর্ড, গ্রামোফোন
প্রভৃতির বিপুল আয়োজন করা
হইয়াছে। তালিকার জন্য লিখুন।
রডার্স এণ্ড কোং "

বিজ্ঞাপনটির বাঁদিকে ছিল হারমোনিয়াম-বাদনরতা এক রমনীর চিত্র।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিভিন্ন কোম্পানির ঝর্ণা কলম বা ফাউণ্টেন পেন এবং কালি বিজ্ঞাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। স্টালিং কোম্পানির ফাউণ্টেন পেশের একটি বিজ্ঞাপন দেখা যাক। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। বিজ্ঞাপনী বার্তাটি ছিল এইরকম—

''দশবৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত

স্টালিং ফাউণ্টেন পেন

১৪ ক্যারেট স্বর্ণের নানাপ্রকার সরু ও মোটা নিব সমন্বিত।

ব্রিটেনে প্রস্তুত এই অন্তনলবিহীন, সুন্দর, সুদৃশ্য ও স্বচ্ছ
ফাউণ্টেন পড়িলে ভাঙ্গিবে না ও আগুনে পুড়িবে না।
একবারমাত্র কালি ভরিলে ১২০০০ শব্দ একসঙ্গে লিখিতে
পরিবেশ। কালি ভরিবার প্রণালীও অত্যন্ত সহজ। এই
নিবের বিশেষত্ব এই যে কলম যেভাবে ইচ্ছা ধরিয়া
সুন্দর ভাবে লিখিতে পারা যায়।
স্টার্লিং ফাউণ্টেন পেনের সব রকম কলারে এই
পেনসিল তৈয়ারী। ইহারাও অভঙ্গুর, অদাহ্য ও
আগাগোড়া ব্রিটিশ মে। মূল্য প্রতি পেনসিল ৩৮০।
অপর Marker-এর এই Quality-র পেনসিল বাজারে
৭টাকা দামে বিক্রি হয়।
ইহা ব্যতীত ঃ
''স্কাউট'' ও ''জকি'' পেন পাওয়া যায়।''

'বিষয় বিজ্ঞাপন'-এর সূত্রে উপরি-উক্ত উদাহরণগুলি সহ আরও বিজ্ঞাপনের জন্য ডঃ চন্দন ব্যাঙ্গালোর 'বিজ্ঞাপন নিয়ে' দ্রষ্টব্য। জানতে পারছি কিংবা শতাব্দীর মাঝামাঝি যখনচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে টালমাটাল দশা, তার কয়েক বছর পরে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পাশাপাশি তুনসংখ্যা বৃদ্ধি, সেইসঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা পাল্লা দিয়ে ক্রমবর্ধমান, সেই সময়টিই ছিল 'বিজ্ঞাপনের সুবর্ণ যুগ, যার প্রধান বাহক ছিল প্রিণ্ট বা ছাপার হরফে প্রকাশিত মিডিয়া।' ১৯৩৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'Indian Languages Newspapers Association'। এর উদ্দেশ্য ছিল দৈনিক সংবাদপত্রগুলির স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে সংযোগসাধন। ১৯৪১-এ ভারতীয় ভাষায়-প্রকাশিত সংবাদপত্রের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় 'Indian Languages Newspapers Association'। বিজ্ঞাপনে মূলত ইংরেজি ভাষারই প্রাধান্য ছিল। ফলে বিদেশি ভাবধারাই ছিল সেখানে আদর্শস্বরূপ। কারণ, 'বিদেশি বা তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের ধারণা ছিল যে ভারতীয়রা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা বোঝে না, তাদের শিক্ষিত করে তোলাটা বিজ্ঞাপনের কাজ।' যদিও, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই প্রবণতার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

ভারতীয় বিজ্ঞাপনে যুগান্তর-সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন বলা হয় 'ডালডা' বনসুতির বিজ্ঞাপনকে। কারণ সেই প্রথম সম্পর্ণ ভারতের জন্য, ভারতীয়দের জন্য বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেন করা হয়। ১৯৩৭-এ ভারতের বাজার দখল করে নেয় এই ডালডা'—এমনই ছিল সেই সর্বগ্রাসী প্রচার যে, 'ডালডা' আসলে একটা ব্র্যাণ্ডের নাম, তা ভুলে গিয়ে যেকোনো রকম বনসুতি তেল বা ভেজিটেবল তেলকেই সাধারণভাবে 'ডালডা' বলে ডাকা শুরু করেছিল।

১৯০৫-এর দশকে আকাশবাণীতে বিজ্ঞাপন প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বিজ্ঞাপনদাতারা রেডিও সিলোন আর গোয়া রেডিওতে বিজ্ঞাপন দিতো। রেডিও সিলোনের প্রোগ্রাম বাদুত বাড়িতে বাড়িতে, তখন বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল বিশাল গীতমালা—আমিন মায়ালি ছিলে তার সঞ্চালক।

১৯৬৭-র পয়লা নভেম্বর আকাশবাণীতে 'বিবিধ ভারতী'র মাধ্যমে বোম্বে, পুনে ও নাগপুরে বিজ্ঞাপন চালু হয়। এই 'পাইলট প্রজেক্ট' ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাড়া জাগানোয় ধীরে ধীরে বেতারে বিজ্ঞাপন বিস্তৃত হয়, কলকাতাত বেতারে বিজ্ঞাপন চালু হয় ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 'বিবিধ ভারতী'র বিজ্ঞাপন কার্যক্রমের 'জয়মালা', 'ভুলে বিষয়ে গীত', 'সরমনকে সিতারে', 'হাওয়া মহল' অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে শোনা যেত। হরলিক্সের 'যুচিত্রার সংসার', শ্রাবন্তী মজুমদারের বেশ কিছু রেডিও অনুষ্ঠানগুলিও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭০-এর গোড়ায়-ঘটে-যাওয়া বাংলাদেশ যুদ্ধ, ১৯৭৫-র ইমারজেন্সি ইত্যাদির কারণে ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি টাল খেয়েছিল। কিন্তু এরই পাশাপাশি সংঘটিত হচ্ছিল মিডিয়া টেকনোলজি। রেডিওতে সেইসময় বিজ্ঞাপন সুমযর্ড অনুষ্ঠান চালু হয়। জাতীয় টেলিভিশনে প্রচারিত হতে থাকে বিভিন্ন চলচ্ছবি। ১৯৭০ ও ১৯৭৮-এর ন্যাশনাল রিডারশিপ সার্ভের ফলে বিজ্ঞাপনদাতারা ক্রেতাদের সম্পর্কে তথ্য জানায় পাশাপাশি নিজেদের মূল্যায়িত করতে থাকেন। ১৯৮২-তে দিল্লীর এশিয়ান গেমমকে কেন্দ্র করে উৎসাহ ও উন্নয়নের জোয়ার আসে। ছাপার জগতে আসে নতুন যন্ত্র। ফলে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে রঙিন বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

বামপন্থী রাজনীতি ১৯৭০-এর দশককে মুর্ত্তির দশক করতে চেয়েছিল। নানা কারণে তা সকল দাবি। ১৯৮০-র দশকে ভারত এগিয়ে গেল মুক্তির বাজারের দিকে। সেই যাত্রায় মূল বাহন হল নতুন মিডিয়া—টেলিভিশন। ১৯৮২-র এশিয়াভের সময় রঙিন সম্প্রচার শুরু হওয়ায় টেলিভিশনের বিক্রি বেড়ে যায়। প্রথম রঙিন টিভি-র বিজ্ঞাপনটি ছিল 'বম্বে ডাইং'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমগ্র বিশ্বে মুক্ত বাহারের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ান আমেরিকা। ফলে বাহার-ভর্তি-পণ্য, যা-কিনা আমি চাইলেই কিনতে পারি—এই অবস্থান থেকে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বহুলাংশে বর্ধিত হল। আমেরিকার ধনতন্ত্র শেখাল, সুপার মার্কেটে গেলে, সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে না, মিলবে হাজারো জিনিস।

ভারতে ১৯৯০-র দশক থেকে ধীরে ধীরে দিল্লী বিজ্ঞাপনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং বোম্বেকে অতিক্রম করে যায়। তবে এই দশকের গোড়ার দিকে ভারতের বাজার ফিরে যে-দুনিয়াজোড়া উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, পরবর্তীকালে নানাকারণে স্তিমিত হয়ে আসে। কারণ, ভারতের বাজার ঘিরে যে-বিপুল সম্ভাবনার কথা ভাগ হয়েছিল, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, তা নয়। এদেশের বহু মানুষই দারিদ্রসীমার নীচে

বসবাসকারী। হতো সেইকারণেই ২০০৮-এ বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সময় ভারতের বাজারেও তার প্রভাব পড়ে। তবে দেশীয় অর্থনীতিতে ভারতের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকায় সেই প্রভাব মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে, ১৯৯০ থেকে প্রায় কুড়ি বছর ধরে চলে আসা বাজারের আত্মবিশ্বাসে আঘাত লেগেছিল প্রবল। সেই-আঘাত থাকলে দেশ ঘুরে দাঁড়ায় ২০১০-এ। উৎপাদন নতুন শিখর স্পর্শ করে।

১.৬ সারাংশ

'বিজ্ঞাপন' শব্দের অর্থ হল বিশেষভাবে জ্ঞাপন।' বিজ্ঞাপনের কাজ পণ্য বিক্রিকরা নয়। বরং পণ্য কেনার জন্য গ্রাহক বা উপভোক্তাকে উৎসাহিত করা। বিজ্ঞাপনের মূল বৈশিষ্ট্য চারটি—উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বার্তা এবং মাধ্যম। বিজ্ঞাপন নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, প্রতিষ্ঠানগত বা ব্যবসায়িক, জনসেবামূলক, সরাসরি বিক্রির জন্য, শ্রেণীবদ্ধ, প্রদর্শনমূলক। বিজ্ঞাপন কালে কালে বিবর্তিত হয়েছে। আগে যা ছিল 'লৌকিক বিজ্ঞাপন', পরে তাই-ই হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞাপন। সেখানে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিক স্বার্থ। আগুন জ্বালিয়ে বা ট্যাঁড়া পিটিয়ে সংবাদ জানানো থেকে শুরু করে বর্তমানে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে নিমজ্জিত হয়েছি আমরা।

১.৭ অনুশীলনী

(ক) বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বিজ্ঞাপন বলতে কী বোঝ?

২. বিজ্ঞাপনের কয়েকটি প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বিজ্ঞাপনের কাজ কী?

২. বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কেন?

৩. বিজ্ঞাপনী বার্তা কী?

৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনের পার্থক্য কী?

৫. একটি জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন ব্যাখ্যা করুন।

৬. 'গুটেনবার্গ বাইবেল' কী?

৭. ১৯৮০-র দশকে কেন বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল?

(গ) অতিসংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. 'বিজ্ঞাপন' শব্দের অভিধানিক অর্থ কী?

২. বিজ্ঞাপনে 'target group' কারা?

৩. বিজ্ঞাপনের একটি বৈদ্যুতিক মাধ্যমের উল্লেখ করুন।

৪. একটি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের উদাহরণ দিন।

৫. কলকাতায়-প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কী?

১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বিজ্ঞাপন নিয়ে', ডঃ চন্দন বাঙ্গাল, অক্ষরবৃত্ত, ডিসেম্বর ২০২১।

২. 'বিষয় বিজ্ঞাপন', রংগন চক্রবর্তী, দেজ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৩. 'বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞা, বিবর্তন এবং ভূমিকা', জয় সরকার নেতাজি সুভাষ যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.জি.ডি.জে.এম.সি ষষ্ঠ পত্র-(খ)-এর পাঠউপকরণ, জয় সরকার, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-২০২৪।

একক ২ ❑ বিজ্ঞাপনের ভাষা

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বিজ্ঞাপনের ভাষা বলতে কী বোঝায়?

২.৪ মুদ্রিত মাধ্যমের বিজ্ঞাপন

২.৫ বেতারের বিজ্ঞাপন

২.৬ দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন

২.৭ ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপন

২.৮ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানা পরিভাষা

২.৯ সারাংশ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

২.১ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপনের কাজ মূলত জানানো বা জ্ঞাপন, মানুষের মনকে প্রভাবিত করা এবং পণ্যটি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে মানুষের স্মৃতি-উদ্‌বেজিত করে তোলা। বাজারে নতুন কোনো পণ্য এলে সেই পণ্যটি সম্পর্কে উপভোক্তাকে সচেতন করা, কোনো পরিবর্তনচ বা মূল্যে কোনো বিশেষ ছাড় পাওয়া গেলে তা জানানো, পণ্যটি কীভাবে ক্রিয়াশীল, তার প্রচার করে বিজ্ঞাপন। নিজস্ব ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে বিজ্ঞাপনদাতা বা বিভিন্ন কোম্পানিগুলি নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করে চলে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভাষা উপভোক্তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষক করে তোলা হয়। বিজ্ঞাপনের ভাষা বলতে আমরা সাধারণ মানুষ যা বুঝি, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে তার অভিঘাত পৃথক। আলোচ্য এককে বিজ্ঞাপনের সেই ভাষা সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রদান করাই মূল উদ্দেশ্য।

২.২ প্রস্তাবনা

শুধু বিষয়লিপিই নয়, শিরোনামসহ নানাবিধ বৈশিষ্ট্য কীভাবে একটি বিজ্ঞাপনের 'ভাষা' হয়ে ওঠে, মুদ্রিত মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের তুলনায় কীভাবে রেডিও, দূরদর্শন, সমাজমাধ্যমের বিজ্ঞাপন পৃথক হয়ে

যায়—সেই আলোচনায় বর্তমান এককটি আবর্তিত। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এককের অন্তিমে সংযুক্ত হয়েছে অনুশীলনী ও গ্রন্থপঞ্জি।

২.৩ বিজ্ঞাপনের ভাষা বলতে কী বোঝায়

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি বা কাব্য বিভিন্ন হরফে লিখিত বিষয়বস্তুই বিজ্ঞাপনের একমাত্র ভাষা নয়। শিরোনাম ও মূল বিষয়লিপি সহ বিভিন্ন লেগো বা ট্রিউমার্ক, ছবি—ইত্যাদিও বিজ্ঞাপনের ভাষার অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞাপনের এই ভাষা রচনার ক্ষেত্রে যে মডেলটি ব্যবহৃত হয়, সেটি হল A-I-D-A—অর্থাৎ Attract বা আকর্ষণ করা, Interest বা আগ্রহ জাগানো, Desire বা পণ্যটি কিনতে ইচ্ছুক করে তোলা এবং Action বা শেষে পণ্যটি কেনা। এই মডেলটিই বহু বছর ধীর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে। এই মডেল অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি-লেখক (copy writer) আশা করেন, বিজ্ঞাপনের শিরোনাম এবং চিত্র গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিষয়লিপিতে লিখিত পণ্যটির বিশেষ গুণ তাদের কী সুবিধা দেবে। সেটি জেনে গ্রাহক পণ্যটি সম্পর্কে উৎসাহিত হওয়ার পরই পণ্যটি কিনবেন, অর্থাৎ ব্যবহার করবেন।

বিজ্ঞাপন রচনার বৃহদাংশাই উপভোক্তার অগোচর থাকে। বিজ্ঞাপন আমরা দেখি বা শুনি। তাই-বিজ্ঞাপনে কী বলা হবে এবং কীভাবে বলা হবে, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য এবং পরিষেবার বিক্রি মূলত এই দুইয়ের ওপরেই নির্ভরশীল।

সাধারণ মানুষের ধারণা, বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে যা লেখা থাকে, সেটিই বিজ্ঞাপনের ভাষা। কিন্তু বিজ্ঞাপনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়ায় বিজ্ঞাপণী বিষয়লিপি এখন নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। তাই বিজ্ঞাপনীর ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিরোনাম, চিত্র, বিশদ বিষয়লিপি, বিজ্ঞাপনদাতার নাম, লোগো ইত্যাদি।

বিষয়লিপি লেখক সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি সৃষ্টি বা পরিকল্পনা করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, শিল্পীরা বিজ্ঞাপনটি রূপায়িত করেন। বিজ্ঞাপনের সমগ্র আবেদক, উপস্থাপন, গ্রাহকদের প্রভাবিত করায় বিভিন্ন উপকরণ সাজানোর সম্পূর্ণ পরিকল্পনার দায়িত্ব থাকে বিষয়লিপি লেখকের।

একটি বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির নানাবিধ অঙ্গ—শিরোনাম, অন্যান্য লিখিত অংশ। উপ-শিরোনাম, চিত্রকল্প, বিষয়লেখ, সমাপ্তি, কোম্পানির নাম। এই সমস্ত অঙ্গগুলি একত্রে বিজ্ঞাপনের দেহ নির্মাণ করে। একযোগে একটি বার্তা প্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে। সেখানে প্রাণ সঞ্চার করেন শিল্পী। বিজ্ঞাপনের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন অঙ্গগুলির ভূমিকা আলেচনা করা যাক—

১ শিরোনাম ঃ

শিরোনাম, বিজ্ঞাপনী বিষয়লিপির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিরোনাম আকর্ষণ না হলে অনেকক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনটি সাফল্যের মুখ দেখে না। ফলে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম উপভোক্তার নজর আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

মুদ্রিত বিজ্ঞাপন মূলত তিনটি উপাদানে নির্মিত—শিরোনাম, চিত্র এবং বিষয়লিপি। অধিকাংশক্ষেত্রে গ্রাহক বিজ্ঞাপনের শিরোনামটুকুই পড়েন, বাকি অংশ অপঠিতই থেকে যায়। তাই মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শিরোনামলিখন এবং শিরোনামের মূল্যায়নের জন্য স্বাধীনতা অবলম্বন করে গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলে। যে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম উপভোক্তাকে আকর্ষণ করে, গ্রাহক সেই বিজ্ঞাপনের পথটিই কিনতে উৎসাহিত হন। এর অন্যথায় বিজ্ঞাপনটি হয়ে যায় ব্যর্থ। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তাই শিরোনামেই সুফুষ্ঠ করা হয়। যেমন, গৃহিনীদের উদ্দেশ্য করে শিরোনামেই লেখা হয়, 'আপনার রান্নাঘরে কি অসুক পণ্যটি আছে? কিংবা, 'আপনি কি ব্যবসার কথা ভাবছেন? তাহলে দেরি না করে আজই চলে আসুন অমুক জায়গায়'।

শিরোনামের প্রধান কাজ পণ্য চিহ্নিতকরণ! অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের শিরোনাম থেকেই পাঠক বুঝে যায়, সেটি কোন্ পণ্যো, বিজ্ঞাপন। ফলে, শিরোনামে কোনো ধোঁয়াশা রাখলে চলবে না। শিরোনাম লিখনেরে কিছু নির্দেশাবলি মেনে চলা হয়। যেমন—

এক. ব্যক্তি পাঠকের উদ্দেশ্যে কথা বলা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ প্রতিটি পাঠক যাতে মনে করেন, তিনিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিজ্ঞাপনে 'আপনি' শব্দব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত।

দুই. প্যণ্যটি ব্যবহারে উপভোক্তার কী সুবিধা হবে, সেটি শিরোনামেই সুষ্ঠভাষায় উল্লেখ করা হয়।

তিন. শিরোনানে কঠিন শব্দ পরিহার করা হয়। পাঠককে বিভ্রান্ত না করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য। তাই মহন শব্দ ব্যবহারে বিজ্ঞাপনের রচনা হয়— directuers তার প্রধান উদ্দেশ্য।

চার. পাঠকের হৃদয়স্পর্শী শব্দ ব্যবহারে বিজ্ঞাপন আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

পাঁচ. একই কথার পুনরাবৃত্তিতে পাঠক বা উপভোক্তা পণ্যটি সম্পর্কে যদিহান হয়ে উঠতে পারেন। তাই সেটি বর্ষ্নীয়।

ছয়. দীর্ঘ শিরোনাম পাঠনে পাঠক অনীহা বোধ করতে পারে। তাই বিজ্ঞাপনী শিরোনাম হবে সংক্ষিপ্ত। একান্তই যদি শিরোনাম বড় হয়, সেক্ষেত্রে উপ-শিরোনামের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

১ **বিষয়লিপি ঃ**

বিজ্ঞাপনী শিরোনাম যে-প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে সম্পূর্ণ করে বিষয়লিপি বা বিজ্ঞাপনের কাম্য। আগ্রহী উপভোক্তা শিরোনামপাঠক পা তাই মনোযোগ সহকারে বিষয়লিপিটি পড়েন। এই বিষয়লিপিতেই পণ্যটি কেনার যৌদ্ধিকতা উপস্থাপন করা হয়। তাই গ্রাহকের মনোভাব বা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেই রচিত হয় সেই বিষয়ালিপি। এর প্রতিটি শব্দ হয়ে ওঠে পণ্যটি বিক্রির সহায়ক। তাই বিষয়লিপির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠাত সেখানে বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরা যাক, কোনো ডিটারজেণ্ট বা পাউডারের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, এক চামচ পাউডারে এক বালতি কাপড় কাচা হয়। এই দাবি উপভোক্তারা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। তাই অনেকক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 'পরীক্ষা করে দেখুন' বা 'না হলে পয়সা ফেরত দেওয়া

হবে'। ট্রেনেও যারা হকারি করেন, বিশেষত কোনো প্যাকেটহাত খাবার, বলেন, 'পছন্দ না হলে ট্রেনের জানলা-দরজা খোলা আছে, ফেলে দেবেন, পয়সা লাগবে না।' বা কখনো বলেন, 'এই লেবু টক প্রমাণ করতে পারলে দশটা লেবু ফ্রি দেব।' অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা বিজ্ঞাপনী বিষয়লিপির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।,

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, টানা গদ্যে বিষয়লিপির পরিবর্তে ছন্দে লিখিত বিষয়লিপি উপভোক্তাকে তুলনায় বেশি আকৃষ্ট করে। এ ও দেখা যায়, টাস গদ্যের বদলে কথোপকথনমূলক সংলাপ ব্যবহার করলে বিষয়ালিপিটি গ্রাহকের কাছে আকর্ষক হয়।

সূচনা, অবয়ব এবং সমাপ্তি—এই তিন মিলে বিষয়লিপি গঠন করে। সূচনা বা lead কী? বিষয়ালিপির প্রথম বাক্যটি সূচনা হিসেবে গণ্য হয়। এই প্রথম বাক্যটি হল শিরোনাম এবং বিশদ বিষয়লিপির সংযোগসাধক। বিষয়লিপির অবয়ব বা Body তে থাকে বিজ্ঞাপনের বিশদ বিবরণ। বিজ্ঞাপনের শিরোনামে যে-দাবি করা হয়েছে, সেই দাবিকে যুক্তি এবং আবেগের সমন্বয়ে উপস্থাপিত করা হয় অবয়বে। এর উদ্দেশ্য একটাই—সম্ভাব্য গ্রাহককে বা উপভোক্তাকে যুক্তিসহ বুঝিয়ে তার আবেগকে জাগ্রত করা, যাতে সে পণ্যটি কেনে। যদি একাধিক যুক্তি বা আবেগের অবতারণার প্রয়োজন থাকে, সেক্ষেত্রে জোরালোতম যুক্তিটি প্রথমে পরিবেশন করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি ক্রমান্বয়ে সহিত থাকে। এখানে খেয়াল রাখতে হয়, যুক্তিগুলি যেন উপভোক্তার মনে স্বচ্ছন্দভাবে পারস্পারিক ক্রম-উত্তরণ ঘটানোর সহায়ক হয়ে ওঠে। বিষয়লিপির সমাপ্তি বা, Closing-এ কী থাকে? শিরোনাম, সূচনায় উপস্থাপিত বিষয় এবং বিষয়লিপির বিশদ বিবরণের যথাযথ পরিসমাপ্তি। সমাপ্তি অংশ আসলে বিজ্ঞাপথের সারাংশকে গ্রাহকের মনে জাগরুক রাখে। সেক্ষেত্রে কখনো গ্রাহককে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান হয়,। যেমন, 'পরীক্ষা করে দেখুন,' 'দেরি করবেন না, আজই আসুন,' 'আপনার নিকটবর্তী ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন' ইত্যাদি বাক্যবন্ধ বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির সমাপ্তি অংশকে ধারণ করে থাকে।

বিষয়লিপির সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্বে থাকে চিহ্নিতরকণ। সেখানে থাকে বিজ্ঞাপনদাতার নাম, লোগো (Logo) অর্থাৎ বিশেষ হরফে লেখা নাম বা বিজ্ঞাপিত পণ্যটি চিহ্নিতকরণের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞাপনদাতার নামের সঙ্গে কোশে বিশেষ স্লোগান ও সেখানে থাকতে পারে।

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি নানাবিধ হতে পারে। যেমন—

ক. সংবাদ ঃ

সোজাসুজি বক্তব্যের মাধ্যমে এখানে পণ্যটির প্রকৃত অবস্থার বিররণ প্রদান করা হয়। সংবাদপত্রের সংবাদ যেমন প্রত্যক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে ঠাণ্ডা ঘটনা পাঠকের সামনে তুলে ধরে, ঠিক তেমনই বিজ্ঞাপিত পণ্যের কার্যকারিতা বা গুণাবলী সংবাদ উপস্থাপনের ভঙ্গিতে গ্রাহককে জানানো হয়। বাজারে নতুন পণ্যের পরিচয় করানো বা চালু পণ্যের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের সংযোজন। জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে সংবাদ কৌশল ব্যবহৃত হয়।

খ. যুক্তি ঃ

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি উপভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কোনো বিশেষ পণ্য ব্যবহারের পক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে বিষয়লিপিতে। বিজ্ঞাপতি পণ্য এবং প্রতিযোগী পণ্যগুলি সম্পর্কে ব্যবহারকারীর একটি সাধারণ ধারণা থাকলে তবেই এই কৌশলে কার্যকরী হয়। ব্যাখ্যা এবং কার্যকারিতার তুলনামূলক উপস্থাপন গ্রাহকের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। সাধারণত, বিপণনের ক্ষেত্রে যেমনন্ত পণ্যের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বেশি, সেক্ষেত্রে উপভোক্তাকে প্রভাবিত করতে বিষয়লিপির ভাষায় যুক্তির-অবতারণা করা হয়ে থাকে।

গ. ভাবমূর্তি গঠন ঃ

বিজ্ঞাপন সর্বদাই চেষ্টা করে এমনভাবে একটি বিশেষ পণ্যের প্রচার করতে, যাতে সেই পণ্যটি বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয়, জনমানথে সেই পণ্যটি সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। পণ্যটির সম্ভাব্য উপভোক্তার জীবনযাত্রার মান লক্ষ্য করে এই ভাবমূর্তি গঠন করা হয়। যেমন, যুবকদের সিগারেট—'চার্মস', কিশোর—কিশোরীদের জন্য ঠাণ্ডা পানীয়—'থাম্বস আপ'।

ঘ. আবেগময়তা ঃ

আবেগঘন বার্তা মানুষের মনে সাধারণত অধিকতা ক্রিয়াশীল হয়। মানুষের আনন্দ, দুঃখ, হাসি, কান্না, রাগ ইত্যাদি অনুভূতিগুলি সূক্ষ্ম সচেনতা না থাকলে বিষয়লিপির ভাষায় এই আবেগময়তা তৈরি করা যায় না। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, যুক্তির তুলনার এই-আবেগের আবেদন জনমানসে বেশি ক্রিয়াশীল হয়। যেমন ধরা যাক, পুরোনো কোডাক ফিল্মের বিজ্ঞাপন। সেখানে বলা হত, কোগক ফিল্ম বিক্রি করে না। ব্যবহারকারীর হৃদয়ে জাগায় স্মৃতি ভালোবাসা। থাকলে তো কোডাক কোম্পানি ফিল্ম-ই বিক্রি করছে, চাইছে লোকে তার ফিল্ম-ই কিনে ব্যবহার করুক। কিন্তু পরিবেশনের ভঙ্গিতে ও আবেগময়তায় লোকের মনে হয়, কোডাক কোম্পানি শুধু ব্যবসার খাতিরেই ফিল্ম বেচছে না, আমার স্মৃতি আমায় ভালোবাসাও বলতে অমশিন থাকে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখছে। যে কোম্পানি গ্রাহকের কথা ভাবছে, সেই কোম্পানির পণ্যই উপভোক্তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে। তাই আবেগময় ভাষা বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী।

এই নানাবিধ বিষয়লিপির ভাষা উপস্থাপনভঙ্গির গুণে পৃথক হয়ে যায়। যেমন, ধরা যাক, সাধারণ মানুষের বাড়ির একটি ঘরোয়া পরিবেশ কোনো পণ্য তার বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে ব্যবহার করতে চাইছে। দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনে একজন লোক সকালে দাড়ি কামাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর গাল কেটে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে বলছেন, 'ওঃ! বোরো নটা কোথায়?' সাধারণ মানুষের জীবনে বিয়তই এই ঘটনা ঘটে গেল। তাই দৈনন্দিন জীবনে এক অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে এই ধরনের বাক্য না বাক্যাংশ

ব্যবহৃত হয়। গ্রাহক যাতে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির ভাষায় দিকানুদৈনিক কথোপকথনের, ভঙ্গি উপস্থাপিত হয়।

অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং সেটির ব্যবহারে কোনো কাল্পনিক চরিত্র বা অ্যামিমেটেক কারেকটারের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। মূলও পণ্যটির সঙ্গে গ্রাহকের একাত্মতা কৃষিই এর মূল উদ্দেশ্য। যেমন, বাচ্চাদের জন্য তৈরি পণ্য—বাবলগাম, চকলেট, ক্রিম দেওয়া বিস্কুট ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এইধরনের আজগুবি বা ফ্যাণ্টরির সাহায্য গৃহীত হয়। ফলে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির ভাষাটিওট এমন হয়, যাতে ছোটরা সহজেই সেই চরিতের সঙ্গে মিলে গিয়ে পণ্যটি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞাপিত পণ্যের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকসময় কোনো জনপ্রিয় তারকাকে বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। আসলে সেই তারকার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে, তাঁকে এক অনুকরণীয় চরিত্র বা role model হিসেবে গ্রাহকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এই সমস্ত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিষয়লিপির ভাষা এমন হওয়া বাধ্যতামূলক, যা ওই জনপ্রিয় তারকার জীবনযাপনের সঙ্গে মানানসই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত কোনো সৎ-আদর্শবাদী মানুষ যদি কোনো প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে উপভোক্তার কাছে সেটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ, শিক্ষাব্রতী মানুষের জীবনে প্রসাধনী দ্রব্যের গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম। তুলনায়, তিনি যদি কোনো বিশেষ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করেন, তা অনেকবেশি গ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

তবে, কোনো প্রিয় তারকাকে পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ঝুঁকিও কম নয়। তারকা ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত সাফল্য বা ব্যর্থতা সেই পণ্যটির বিপণনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদি কোনো চিত্রতারকার প্রশংসাপত্রে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয় এবং সেই তারকার পরপর একাধিক ফিল্মি বক্স-অফিসে সাফল্যের মুখ দেখে, তাহলে বিজ্ঞাপিত পণ্যটি লাভবান হয়। অন্য দিকে সেই তারকাই যদি-ব্যর্থ হন, তাহলে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়ে। আপনাদের মনে পড়তে পারে, প্রাক্তন ভার চার ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী ম্যাফোলা সাদাতেলের বিজ্ঞাপন করতেন। সেই বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়লিপি উপভোক্তাকে জানাত যে, ম্যাফোলা তেল রান্নায় ব্যবহার করলে হৃদরোগের আশঙ্কা কমে। অথচ সেই সৌরভ গাঙ্গুলীই যখন হৃদয়রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন অনেকেই সৌরভের সমালোচনা করতে ছাড়েননি এবং সৌরভ গাঙ্গুলী-বিজ্ঞাপিত পণ্যটিও তখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য গ্রাহককে জানাতে হলে বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'এবার', 'এখন', 'নতুন' ইত্যাদি-শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ উপভোক্তাই এইধরনের শব্দকে অগ্রাহ্য করতে পাবেন না।

বিজ্ঞাপিত পণ্যের কার্যকারিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিরা ভাষায় অতীত ও বর্তমানের অবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা হয়। রান্নাঘরে যারা গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেন, তাঁরা জানেন যে, গুঁড়ো দুধ

ব্যবহারের প্রধান সমস্যা, চা বা হলে দ্রবীভূত করার সময় সেটি ডেলা পাকিয়ে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় তাই কী লেখা হয়? 'গুলবার সময় ডেলা পাকিয়ে যায় গ'। অর্থাৎ উপভোক্তার মনে এই লাইনটি তৎক্ষণাৎ যে-প্রতিক্রিয়াটি জাগিয়ে তোলে, সেটি হল, বিজ্ঞাপনে চা বা জলে দুধ গুলে যেহেতু দেখানো হচ্ছে, সেটি ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে না, তাই-পণ্যটির কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে প্রমানিত। এইভাবেই বিজ্ঞাপনের ভাষা গ্রাহকের মন প্রভাবিত করে।

ı চিহ্নিতকরণ প্রতীক ঃ

চিহ্ন-ও বিজ্ঞাপনের একটি ভাষা। সেই বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমেহ কোনো পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই চিহ্নিতকরণ প্রতীকের ক্ষেত্রে-সাধারণত ব্যাণ্ড নাম এবং ট্রেড মার্ক সমার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ট্রেড মার্ক আসলে পণ্যের পরিচিতির সহায়ক। কখনো কখনো ট্রেড মার্ক ব্যবহার করা হয় ব্র্যাণ্ড নাম হিসেবেও। কোনো ছবির সাহায্য ছাড়া হরফের সাহায্যের ব্রাণ্ড নাম বোঝানো যেতে পারে। যেমন, কোকাকোলা—এটা একটা ব্যাণ্ড নাম। কিন্তু যে-বিশেষ ধরনের অক্ষরে বা স্টাইলে 'শেকাকোলা' শব্দটি লিখিত হয়, সেটিই হল ট্রেড মার্ক। এই বিশেষ ধরনের অক্ষর, ও স্টাইলে লেখার বিষয়টিই হল লেগো (logotype)। কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে দুটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইনগত বিষয়ে ট্রেডমার্ক-এর গুরুত্ব বেশি। ট্রেডমার্ক ভারত সরকারের রেজিস্টার অফ ট্রেডত মার্কের দপ্তরে রেজিস্ট্রি করা হয়। পণ্যের জন্য কোনো কোম্পনি কোনো ট্রেডমার্ক রেজিষ্ট্রি করলে, সেই ট্রেডমার্ক বা নাম অন্য কোনো কোম্পানি বা পণ্য ব্যবহার করতে পারে না। কারণ, ট্রেডমার্কই-গ্রাহকদের পণ্য চেনাতে সাহায্য করে থাকে। তাই ট্রেডমার্ক-ই হল কোম্পানির বিজস্ব চিহ্ন। অন্য কোনো কোম্পনি তা ব্যবহার করলে আইনযুগ ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। যেমন, কে.সি.দাসের (K. C. Das) রসগোল্লার কথা আমরা সকলেই জানি। বছর কয়েক আগে বস্ত্রবিক্রেতা এক কোম্পানি এই একই ট্রেডমার্ক (K. C. Das) ব্যবহার করায় রসগোল্লা-কোম্পানি K. C. Das মামলা করে এবং বস্ত্রবিপনন কোম্পানিটি সেই মামলায় পরাজিত হওয়ায় তারা নিজেদের ট্রেডমার্ক-এ একটি অতিরিক্ত 'এস' (S) যোগ করতে বাধ্য হয়—তাদের ট্রেডমার্ক হয়ে দাঁড়ায় K. C. Das।

পণ্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক ও ব্যাণ্ডনামের পাশাপাশি এক বা দু'লাইনের স্লোগান ও সমান কার্যকরী। যেমন, আমুল বাটারের বিজ্ঞাপনে 'utterly butterly delicious', বোরোলীনের বিজ্ঞাপনে 'বঙ্গজীবনের অঙ্গ'। পুরুযেরা অঙ্গের অন্তর্যামের ক্ষেত্রে ডলার কিনলে আরাম ফ্রি, লাস্ক সাবানের বিজ্ঞাপনে 'চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান', চেসয়ী গ্লিসারির সাবানের ক্ষেত্রে 'এল শীতের শুষ্ক রুক্ষ দিন/প্রিয় ত্বকের যত্ন নিতে চাই। চেয়সী গ্লিসারিন; পাদুকা বা ছুতোর ক্ষেত্রে 'পায়ে পায়ে আনন্দ ইত্যাদি।

স্লোগানের মূল উদ্দেশ্য হল, বিজ্ঞাপন অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং পণ্যের মূল বার্তাটি গ্রাহককে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করালো,। স্লোগান বছরের পর বছর-ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপিত পণ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ধারণাটি কিছু আকর্ষক (Catchy) শব্দের সাহায্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও

নিটোল আকারে স্লোগানকে পরিস্ফুট করা হয়। তাই স্লোগানের ভাষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার—

ক. স্লোগানের ভাষা যেন সহজবোধ্য হয় ও আকর্ষক (Catchy) হয়।

খ. স্লোগান যেন সংক্ষিপ্ত হয় এবং তা সহজে মনে রাখার সহায়ক হয়।

গ. প্রতিযোগী পণ্যগুলি থেকে নিজের পণ্যের পার্থক্য যেন স্লোগান সূচিত করে।

ঘ. পণ্যের কোনো বিশেষ গুণকে যেন স্লোগান বহুগুনিত করে তোলে।

ঙ. গ্রাহকদের মনে রাখার সুবিধার্থে ছন্দ ও যুব স্লোগানে ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

চ. স্লোগান যেন কখনোই গ্রাহককে বিভ্রান্ত না করে।

কোনো বিজ্ঞাপিত পণ্য গ্রাহকদের চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে ট্রেডমার্ক, ব্র্যাণ্ডনাম ও স্লোগানের পাশাপাশি মানব জনপ্রিয় হল বিজ্ঞাপনে প্রতীকের ব্যবহার। যেমন, একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে দুটি হাত দু'পাশ থেকে আগলে রেখেছে, যাতে প্রদীপটি নিভে না যায়, সর্বক্ষণ জ্বলন্ত থাকে—এই প্রতীক থেকেই মানুষ বুঝে নেন, সেটি আসলে জীবন গমার বিজ্ঞাপন। দুটি ছাত যেমন প্রদীপের শিখাটিকে আগলে রাখে, জীবন বীমা ও তেমনি একটি পরিবারকে জীবন বীণাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও সুরক্ষা প্রদান করে। অনেকক্ষেত্রে জীবনবীমার এমন পলিবিও থাকে, সেখানে জীবনবীমাকারী অবসর গ্রহণের পর-ও জীবনবীমায় লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত পান। সেক্ষেত্রে বিষয়লিপির ভাষায়ত লেখা হয়। 'জিন্দেগি কি সাথ ভি, জিন্দেগি কি বাড ভি'।

বিজ্ঞাপনে প্রতীকের ব্যবহারের পরেই গুরুত্বপূর্ণ রূপকল্প বা image। রূপকল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ কোনো চিত্র বা কোধোগ্রাফ, কোনো কারুশিল্প, আঁকা ছবি অথবা রূপকল্প সৃষ্টিতে সহায়ক উপাদান ব্যবহার করা হয়।

যে-ধারণা বা বিষয় বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত হয়, সেটি সাধারণত চিত্ররূপ এবং শব্দের সমন্বয়। বিজ্ঞাপনে জ্ঞাপনের বিষয়টি সফল হওয়ার জন্য চিত্ররূপ এবং শব্দের ব্যবহার একে অন্যের পরিপূরক হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে শব্দের ব্যবহারই মুখ্য—বিভিন্ন হরফের বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বার্তা জ্ঞাপন করা হয়। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে চিত্রের ব্যবহারই, সে ফোটোগ্রাফই হোক, বা অঙ্কিত ছবিই হোক—মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজ্ঞাপনের সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা একইসঙ্গে চিত্ররূপ এবং শব্দের ব্যবহার বিষয়ে চিন্তা করে বিষয়লিপি রচনা করেন।

বিজ্ঞাপন নানারকম চিত্ররেখা ব্যবহার করা হয়। চিত্ররেখার বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে মোট দৃষ্টি মূল আকারের চিত্ররেখা এখানে বর্ণিত হল—

এক. সাধারণ মানের চিত্ররেখা (Sstandard layout)—এই চিত্ররেখায় শিরোনাম, চিত্ররূপ বিষয়লিপি, বিজ্ঞাপনদাতার নাম সবই সমান প্রাধান্য পায়।

দুই. সম্পাদকীয় চিত্ররেখা (editorial layout)—বিজ্ঞাপনটি এক্ষেত্রে কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনার মতো আকার নেয়।

তিন. পোষ্টার চিত্ররেখা (poster layout)—এই ধরনের বিজ্ঞাপনে রূপকল্পের ওপরই মূল গুরুত্বপ্রদান করা হয়।

চার. কার্টুন চিত্ররেখা (cartoon layout)—যে-বিজ্ঞাপনে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য কোনো কার্টুনের চিত্র ব্যবহার করা হয়, সেটিই হল কার্টুন চিত্ররেখা।

পাঁচ. ছবি-শিরোনামের চিত্ররেখা (picture caption layout)—বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং পরিষেবা উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন চিত্র ও শিরোনাম এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ছয়. একগুচ্ছ ছবির চিত্ররেখা (picture clusteup layout)—এক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেকগুলি চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিষেবার বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তব্য গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়।

বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত চিত্ররেখার নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়—

এক. বিজ্ঞাপনে কোনো ছবি বা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করলে ছবিটি যেন বিজ্ঞাপনের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে রাখা হয়। অর্থাৎ চিত্ররেখাটিই সেখানে প্রাধান্য পায়। প্রসাসন ও জামা-কাপড় বা কোনো ফ্যাশনেলে পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই চিত্ররেখা বিশেষ কার্যকরী।

দুই. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিরোনাম সাধারণত বিজ্ঞাপনের শতকরা পনেরো ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে। সাধারণত বিজ্ঞাপনের ছবির নীচে এবং বিষয়লিপির ওপরে শিরোনামের অবস্থান। মূল শিরোনাম যদি ছবির উপরে থাকে, তাহলে ছবির নিচে একটি উপ-শিরোনাম থাকলে, বিষয়লিপির সঙ্গে উপভোক্তার সংযোগের সুবিধা হয়।

তিন. পণ্যের নাম যদি বিজ্ঞাপনের শিরোনামেই সুস্টভাবে যা থাকে, অথবা ছবির সঙ্গে দেওয়া না-হয়, তাহলে নামটি বিজ্ঞাপনে সুস্টভাবে থাকা দরকার। হরফের ফলে,বৈপরীত্যের ব্যবহার অথবা চারধারে সাদা জায়গা ছেড়ে পণ্যটির নাম অথবা নাম সমেত মোড়কটি দেখানো প্রয়োজন।

চার. একই চিত্রকল্প বা প্রতীক বারংবার ব্যবহার করলে। গ্রাহকদের পণ্যটি স্মরণ করতে সুবিধা হয়।

পাঁচ. বিজ্ঞাপনের চারদিকে যদি কোনো বর্ডার থাকে, তাহলে পত্রিকাটিয় অন্যান্য অংশ থেকে বিজ্ঞাপনটিকে আলাদাভাবে দেখার সুবিধা হয়।

প্রতিটি বিজ্ঞাপনে ভারসাম্য বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়ত। উপভোক্তা যখন কোনো বিজ্ঞাপন দেখেন, তখন সেই বিজ্ঞাপনের ভারসাম্য বজায় থাকলে, তার চোখের পক্ষে বিজ্ঞাপনের উপর থেকে নিচে স্বচ্ছন্দে বিবরণ করা সম্ভব। ভারসাম্যহীন বিজ্ঞাপন পাঠকের চোখকে ধাক্কা দেয়। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপকের পক্ষে যথার্থ আবেদন সৃষ্টি করা অসম্ভব।

ভারসাম্যকক্ষর্থে বিজ্ঞাপনের সমস্ত উপাদানগুলি সমান্তরাল হিসেবে অথবা উল্লম্বাকারে সাজানো থর থাকে। বিজ্ঞাপনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সাধারণত দু'ধরনের উপায় অবলম্বিত হয়—সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য

এবং সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্য। সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য সাধারণত নিয়মমাফিক, গতানুগতিক এবং স্থির—যেকারণে অনেকেই এই ভারসাম্যকে নীরস বলে অভিহিত করেন। সামঞ্জস্যদীন ভারসাম্যে চিত্ররেখার (চরিত্র) বেশি। তাই সেটি তুলনায় অধিকতর আকর্ষণ এবং গতিশীল হওয়ায় পাঠক বা উপভোক্তাকে প্রভাবিত করে। সামঞ্জস্যহীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চিত্ররেখা প্রস্তুত কঠিনতম। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ভারসাম্য উপলব্ধ না হলেও একটি অন্তর্নিহিত ভারসাম্যে বিজ্ঞাপনটি গ্রন্থিত থাকে।

১ হরফের ব্যবহার ঃ

বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপিতে বা শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দগুলি বেহাত শব্দসমষ্টি হয়। বিজ্ঞাপনের হরফ, চিত্রের সঙ্গে একাত্মভাবে একটি বিশেষ বার্তা, আবেগ ও মেজাজ উপস্থাপক করে পাঠকের মনকে আবর্তণের প্রচেষ্টা থাকে। সেক্ষেত্রে শিরোশসমহ বিষয়লিপিতে ব্যবহৃত হরফ ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত পণ্য বা পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হরফের চরিত্র নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, কোনো যুগশ্ছী বা পারফিউমের বিজ্ঞাপনে সাধারণত কোনো রোমণ্টিক অনুভূতি জাগানোর প্রচেষ্টা থাকে। তাই সেই বিজ্ঞাপনে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সাধারণত ছিমছাম, শৌখিন হয়; অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত পণ্য এবং বিজ্ঞাপনের মূল আবেদনের যুগের একটি সামঞ্জস্য যেখানে রক্ষিত হয়। আবার এর বিপরীতে যদি কোনো গাড়ির টায়ারের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, সেখানে দেখা যাবে, সেখানে সাধারণত মোটা ও বড় হরফ নির্বাচত হয়। টায়ারের বিজ্ঞাপনে শক্তি ও নির্ভরতার প্রতিশ্রুতি পাঠকমনে মুদ্রিত করে দেওয়ার জন্যই ওই বিশেষ হরফের নির্বাবন। কাজেই বিজ্ঞাপনে পণ্যের চরিত্র, ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয় হরফের চরিত্র।

বিজ্ঞাপনের চিত্ররেখা এবং বিষয়লিপি অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের হরফ ব্যবহৃত হয়—কখনও ৮, ১০, ১২, ১৪ আবার কখনও বা ১৬, ১৮, ২০, ২২ ইত্যাদি। অক্ষর বা হরফ বিজ্ঞাপনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি হরফের চারপাশে কতখানি ফাঁকা স্থান থাকলে তা পাঠকের আগ্রহ উদ্‌যোজিত করবে, সেটির প্রতি নজর রাখেন চিত্ররেখা প্রস্তুতকারক। খেয়াল রাখতে হয়, শিরোনাম ও বিষয়লিপিতে হরফের ব্যবহার যেন সহজপাঠ্য হয়, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে যাতে কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি যা করে। যেমন, শিরোনাম বা বিষয়লিপি যদি বিজ্ঞাপনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে পাঠকের চোখ ক্লান্ত হতে পারে। দুটি পঙক্তির মধ্যে যথেষ্ট শূন্যস্থান না থাকলেও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তাই গ্রাহকের আগ্রহ সৃষ্টিতে বিষয়লিপির উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হরফকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য দীর্ঘ বিষয়লিপিকে ছোট ছোট অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপনে শুধু বড় হরফের ব্যবহার ও কাঙ্ক্ষিত নয়—বড় ও ছোট হরফের মিশ্রিত বিজ্ঞাপন পাঠেই পাঠক বা ব্রাহক অত্যন্ত। গুরুতপূর্ণ অংশটিকে বিষয়লিপিতে বড় হরফে ব্যবহার করলে বিজ্ঞাপনে একটি সামঞ্জয্য রক্ষিত হয়। হরফের রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রঙের তুলনামূলক বৈপরীত্য, আবার কখনও-বা গুরুত্ব অনুসারে শুধু দুটি বা তিনটি রঙের ব্যবহারে বিজ্ঞাপনকে আকর্ষক করে তোলা হয়।

এছাড়া, পণ্যের পরিচিতি সহায়ক চিহ্ন বা trade mark, চিত্ররেখা বা sketch, ছবি বা photography কিংবা illustration-ও বিজ্ঞাপনের ভাষার অন্তভুর্ক্ত। বিজ্ঞাপনকে গ্রাহকের মনে সুমুদ্রিত করে তুলতে, ইতিহাসকে ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানা উপাদানে বিজ্ঞাপনের ভাষা নির্মাণ করা হয়। 'ভাষা' অর্থে তা কেবল হরফেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কোনো বিশিষ্ট লোগো (logo), কার্টুন, ছবি, trade mark-এর

বিশেষত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির এক বা একাধিকের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় একটি সার্থক বিজ্ঞাপনের ভাষা। সেক্ষেত্রে বিষয়লিপি রচয়িতা, চিত্রশিল্পীর অনন্যতার পাশাপাশি সৃজনাত্মক কর্মী সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪ মুদ্রিত মাধ্যমের বিজ্ঞাপন

মুদ্রিত অবস্থায় বিজ্ঞাপন কোথায় দেখা যায়? বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকা, গ্রন্থ, পাঁজি বা পঞ্জিকা, হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যামফেট, ব্যানার, হোর্ডিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এইসমস্ত বিজ্ঞাপন কীভাবে প্রস্তুত হয়, সেটি পরবর্তী এককে আলোচ্য। তাই এখানে মূলত মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের কিছু নিদর্শন আলোচনা করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সহ আরও নানা বিজ্ঞাপনের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ চন্দন বাঙ্গালের 'বিজ্ঞাপন নিয়ে'।

এক. বোরোলিনের বিজ্ঞাপন ঃ

চিত্তাকর্ষক তথ্যে গ্রাহককে আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চ সাথে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' বোরোলিনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 'বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা' শিরোশনে সেখানে অলিম্পিকের একটি ইতিহাস মুদ্রিত হয়। লেখা ছিল—

'সম্ভবত খৃঃ পূঃ ১৩৭০ সালে গ্রীসে অলিম্পিক উৎসবের শুরু হয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৭৭৬ সালের আগের অলিম্পিকগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। এলিস শহরের করিবাস এই অল্পিম্পিকে বিজয়ী হন। তাই সে ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান।

গ্রীক দেবতা জিউস বা জুপিটার অলিম্পাসের সম্মানে আয়োজিত ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়েই অলিম্পিকের শুরু। এই উৎসবের গোড়ায় জিউস এবং অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হতো।

গ্রীকরা বিশ্বাস করতো যে জিউসদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় শরীর ও মনের ক্ষমতা প্রদর্শন করা। অলিম্পিকের প্রথম কেন্দ্র অলিম্পিয়ার সমতল ভূমিতে তাঁর এক বিশাল মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে ভাস্কর ফিডিয়ামের তৈরি হাতির দাঁত ও সোনার মূর্তিটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম বলে গণ্য হতো।'

ইন্টারনেটহীন সেই যুগে কোম্পানির লক্ষ্য ছিল, এই ধরনের তথ্য পরিবেশন করে 'বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা'র সেইজন্যে বোরোলীনের বিশ্বস্ততা পাঠক মনে মুদ্রিত করে দেওয়া—''বোরোলীন অলিম্পিক গল্পমালা পড়েছিস? বেশ ভলো কিন্তু!' অনেকটা এই ধরনের লোকমুখে প্রচার করা।

দুই. কেশপ্রসাধন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ঃ

১৯৮০-র দশকে লোকপ্রচলিত ছড়া ব্যবহার করে ওয়েসিস ডাবল একশন হেয়ার ফার্টিলাইজার কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম—

'আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্যি গেল পাটে।
খুকু গেলো জল আনতে

পদ্ম দীঘির ঘাটে।।
পদ্ম দীঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল।
হাঁটুর উপর দুলছে খুকুর
গোছা ভরা চুল।।
ঘন কালো সুন্দর চুলের জন্য
ওয়েসিস
ডাবল অ্যাকশন
হেয়ার ফার্টিলাইজার”

পদ্মদীঘির ‘কালো জলে’ যখন খুকু জল আনতে যায়, তখন আনত খুকুর ‘গোছা ভরা চুল’ ওই ‘কালো জলে’ প্রতিফলতি হয়ে কি আরও কৃষ্ণতর হয়ে ওঠে না? এই রূপকল্পটিকেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন. ফেরার বিপ্লবীর খোঁজে বিজ্ঞাপন ঃ

১৯৩২-এ মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ‘most wanted’ স্বাধীনাত সংগ্রামী। সূর্য সেন ফেরার হলে তাঁর মাথার দাম ধার্য করে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়—

‘বিজ্ঞাপন

১০,০০০্ টাকা পুরস্কার

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, যে কেহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মোকদ্দমার নিম্নলিখিত ফেরারী আসামীর সন্ধান করিয়া ধারইয়া দিতে পারিবে তাহাকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই পুরস্কার অদ্য হইতে একবৎসর পর্যন্ত বহার থাকিবে।

নিম্নে যে ফটো দেওয়া হইল উহা ১৯২৪ সালে লওয়া হইয়াছিল—

(সূর্য সেনের ছবি)

নাম—সূর্য্যকুমার সেন ওরফে মাস্টার দা।

পিতার নাম—মৃত

গ্রাম—

থানা—

জেল—চট্টগ্রাম।

বয়স প্রায় ৪১ বৎসর, খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি কামান, দেশী মিলের সরু-পেড়ে ধুতি, ফতুয়া এবং সার্ট পরিধান করিত।

বঙ্গদেশীয় পুলিশ বিভাগের
ইন্সপেক্টর জেনেরাল মহোদয়ের
অনুমত্যনুসারে।

তাং ২২শে জুন, ১৯৩২।'

চার. ভারতীয় রেলওয়ের বিজ্ঞাপন ঃ

সমর অস্ত্র সরবরাহের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম—

'একখানি ট্রেন ১৮৬ মাইল লম্বা

ইহা বহু ট্রেনের সমষ্টি—কিন্তু ভারতের রেলওয়ে-সমূহ বহু যাত্রা বহন করিয়া থাকে—প্রত্যহ ১৭ লক্ষ—এবং একসঙ্গে যদি সকলের বসিবার জায়গা করিতে হয়, তবে ১৮৬ মাইল লম্বা একখানি ট্রেন দরকার!

এবার ভাবিয়া দেখুক—প্রত্যহ কমপক্ষে ৩,৯৬৫ খানি ট্রেন চলাচল করিতেছে এবং কলিকাতার জন-সংখ্যার সমসংখ্যক লোককে সত্বর ও নিরাপদে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় রেলওয়ে সমূহের ইহাই প্রধান কাজ নহে।

অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ভারতের সর্ব্বতর পাঠাইতে হইতেছে—যোদ্ধদের জন্য অস্ত্র, কারখানা সমূহের জন্য কাঁচামাল। প্রত্যহ ২০,৫৪৬টি মালগাড়ী বোঝাই দেওয়া হইতেছে। আপনাদের জন্য-তথা ভারতের জন্য ভারতের রেলওয়েসমূহ এই কাজ করিতেছে। অনাবশ্যক ভ্রমণ কমাইয়া আপনাদের সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করুন। রেলওয়ে সমূহকে একটি বিরাট কাজ করিতে হইতেছে।

রণসম্ভার প্রেরণের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করুন

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলুন'

সমর অস্ত্র সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের জন্য এই বিজ্ঞাপনটি ছিল ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে একটি আবেদন। একসঙ্গে অসংখ্য মানুষের কাছে কোনো সাধারণ বার্তা পৌঁছোনোর কাজে এভাবেই ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞাপন।

পত্রপত্রিকা বা অন্যান্য মুদ্রিত মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট একটি ব্যকরণ বা কিয়ম মাব্য করা যায় না। কারণ, পাঠককে গ্রাহকে পরিণত করার ক্ষেত্রে সেখানে বোধগম্যতার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই সেখানে বেশিরভাগক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনাকে এড়িয়ে গিয়ে অডিবা-য় নির্ভর করা হয়। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই ভাষাই হল 'telegraphic language'। সেখানে বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে ক্রিয়াপদহীন। ক্লাসিফায়েড এলাকার অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলি এর উদাহরণ।

আধুনিক যুগের অনেক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে 'Tagline' বা 'Catch line' ব্যবহার করে জনমানসে নির্দিষ্ট একটি পণ্য অফুটে আগ্রহকে জাগরুক রাখা হয়। যেমন, এভারেডি টর্চের বিজ্ঞাপনে 'মাঝরাতের অতিথি', গ্রামাফোনের বিজ্ঞাপনে 'সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামাফোন', বোরোলীনের বিজ্ঞাপনে 'বঙ্গ জীবনের অঙ্গ', বাটা কোম্পানীর জুতোর বিজ্ঞাপনে 'হাঁটা মানেই বাটা', লাইফবয় সাবানের বিজ্ঞাপনে 'লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে' ইত্যাদি।

মুদ্রিত মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একসময় পঞ্জিকা বা পাঁজি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহ-নক্ষত্র তিনি সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি পঞ্জিকাগুলি বিজ্ঞাপনের এক সুবৃহৎ সম্ভার নিয়ে হাজির হত। কী ছিল না সেখানে? বশীকৰণ, শত্রু দমন, কয়েক মিনিটে বশীকরণ, দাম্পত্য কলহের সমাধান, ব্যবসায় লাভের পদ্ধতি, নানা সংকট দূরীকরণ, নানা বাধা কাটিয়ে সন্তানলাভের উপায়, পারিবারিক শান্তিরক্ষার উপায়, যৌনরোগসহ নানান গুপ্ত রোগের প্রতিকার থেকে শুরু করে পশুপাখি পালন, আবার রামায়ণ, মভাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে-ও শোভিত হন পঞ্জিকার পৃষ্ঠা।

২.৫ বেতারের বিজ্ঞাপন

মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষই-ই মূল উদ্দেশ্য। রেডিও বা বেতারের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। কিন্তু যেহেতু এটি মুদ্রিত মাধ্যম নয়, কোল শ্রবণমাধ্যম, তাই এই বিশেষ মাধ্যমের ক্ষেত্রে পরিবেশিত বিজ্ঞাপনের ভাষাটি স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রিত মাধ্যমের তুলনায় পৃথক হয়। সেক্ষেত্রে শুধু ঘনির সাহায্যে একটি রূপকল্প নির্মাণ করা হয়। সেই নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি মান্য করা হয়—

এক. বেতারে বিজ্ঞাপনে-অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা কণ্ঠস্বর হতে হবে সুষ্ঠ ও সুমিষ্ট। অস্পষ্ট উচ্চারণে বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এছাড়া 'র'-'ড়', 'শ'-'ষ'-'য'-এর উচ্চারণে ত্রুটি থাকলে শব্দের অর্থই সেখানে বদলে গিয়ে বিজ্ঞাপনটিকে অর্থহীন করে তুলতে পারে।

দুই. স্বরক্ষেপনের ক্ষেত্রে ঘোষকের কিছু কণ্ঠস্বরের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা বিশেষ জরুরি। কারণ, বেতারের বিজ্ঞাপনে কথাই একমাত্র মাধ্যম যা পণ্য এবং সম্ভাব্য গ্রাহকের মধ্যে একটি সংযোগসাধনক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

তিন. বিজ্ঞাপনকে কার্যকরী করে তুলতে বেতারে আনুষাঙ্গক নানা শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, গাড়ি থামার, চলার শব্দ, ট্রেনের হুইশাল, ট্রেন চলার আওয়াজ, জলের শব্দ, বাতাসের আওয়াজ, বিভিন্ন পদশব্দ—তাড়াতাড়ি, ,, দোদুলগতি ইত্যাদি। অনুযাঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন বাস্তব শব্দের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিজ্ঞাপনকে বেতার মাধ্যমে আকর্ষক করে তোলা হয়।

চার. পুনরাবৃত্তিই রেডিওর বিজ্ঞাপনের সাফল্যের মূল সূত্র। তাই বেতারে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে-বিজ্ঞাপনের মূল পণ্য ও মূল বার্তাটিকে যথাসম্ভব বারংবার উপকরণ করা হয়ে থাকে।

পাঁচ. বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ চিত্রটি এখানে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। যদি সবুজ লেভেলের চা হয়, তা হলে 'সবুজ' কথাটা সুষ্ট জানানো দরকার। আবার লাল ব্যাটারি হলে 'লাল' শব্দের উচ্চারণ বাঞ্ছনীয়। পণ্য চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে রঙের উচ্চারণ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

ছয়. বিজ্ঞাপনী বার্তাটি সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রোতাকে সচেতন করার জন্য ও তাদের স্মরণে থাকার জন্যই রেডিওর বিজ্ঞাপন, বিস্তারিত তথ্য-জানানোর অবকাশ সেখানে থাকে না।

সাত. একই পণ্যের বিজ্ঞাপন টেলিভিশন ও রেডিওতে করা হলে, টেলিফোনের বিজ্ঞাপনের সুর-সংগীত শব্দের ব্যবহার এবং বিষয় একইভাবে রেডিওতে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

আট. ছিঙ্গেলের ব্যবহার রেডিওর বিজ্ঞাপনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলির মাধ্যমে কোনো একটি পণ্য সম্পর্কে শ্রোতাকে গানের কালিতে সচেতন করা হয়। যেহেতু সাধারণ কথার তুলনায় গান বা জিঙ্গেলের সুর মানুষকে অধিকতর আকৃষ্ট করে, তাই বহু গায়ক এইধরনের বিজ্ঞাপনী জিঙ্গেলে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অনেকক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পণ্যের প্রচারের জন্য যে-গান বা জিঙ্গেলটি লিখিত হয়, সেই গানের এক-একটি পঙক্তি এক-একজন গায়ক গেয়ে থাকেন।

বেতার বা রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনী যন্ত্রচারের বেশ কিচু সুবিধামূলক দিক হল—এই সম্প্রচার ভৌগোলিক দিক থেকে ব্যাপক অঞ্চলে পৌছতে সক্ষম। AIR All India Radio বিবিধ ভারতী থেকে প্রথম বিজ্ঞাপন সম্প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীকালে F. M বেতারও বিজ্ঞাপন প্রচারের এক কার্যকর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বেতারে বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। মুদ্রণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেও বেতারের মতো শ্রাব্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে সেই বাধা না থাকায় ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চলে বেতারের বিজ্ঞাপনী সম্প্রচার একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

তবে উপরি-উক্তসুবিধার পাশাপাশি বেতার-সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয় 'যেমন, বেতারের বিজ্ঞাপনী বার্তা অতি দ্রুত অল্প সময়ের জন্য সম্প্রচারিত হয়। তাই সামান্য অন্যমনস্ক হলে সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি বা তার বার্তাটি শ্রুতি না-ও হতে পারে। শুধুই শ্রাব্য মাধ্যম হওয়ার কারণে বিজ্ঞাপনী সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতার বা রেডিওর অসম্পূর্ণতা অস্বীকার করা যায় না। বেতারের মাধ্যমে কোনো বিস্তারিত তথ্য সম্প্রচার সম্ভব নয় বলে বিজ্ঞাপনদাতারা এই মাধ্যমের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন না। বিজ্ঞাপনী সম্প্রচারের ক্ষেত্রে পণ্যটি সম্পর্কে গ্রাহককে জ্ঞাত করা গেলেও পণ্যটির-সম্ভাব্য ক্রেতা বা গ্রাহকদের সঙ্গে পণ্যটির মানুষ পরিচয় ঘটানোর সুযোগ থাকে না।

২.৬ দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন

বেতারের তুলনায় দূরদর্শন শক্তিশালী মাধ্যম। বেতার সেখানে শুধুই শ্রাব্য (audio) মাধ্যম, দূরদর্শন

সেখানে দৃশ্য ও শ্রাব্য। (audio and visual) মাধ্যমের সমন্বয়। তাই-টেলিভিশন বা দূরদর্শন, বেতারের মতো সুর-সংগীত শব্দ-যথা ইত্যাদি জানানোর পাশাপাশি ছবি, চলমান ছবি-ও দর্শকের সামনে হাজির করে। টেলিভিশনে তাই বিজ্ঞাপন জ্ঞাপন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এর আবেদন তাই বেতারে সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি। দূরদর্শনের সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি মান্যতা পায়। যেমন—

এক. দূরদর্শনে পণ্যের কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ পণ্যের কর্মক্ষমতা সেখানে প্রদর্শন করে গ্রাহকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা হয়। তাই কোনো মিক্সার গ্রাইণ্ডারের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়। কত তাড়াতাড়ি ও মসৃণভাবে মশলা বা অন্য কিছু গুঁড়োনো সম্ভব। গুঁড়ো দুধ ব্যবহারকারীরা জানেন, সেটি ব্যবহারের মূল সমস্যা হল, জলে গুলবার সময় ডেলা পাকিয়ে যাওয়া। তাই পাউডার মিশেকর বিজ্ঞাপনী ভাষায় থাকে, এবার আর জলে গোলার অসুবিধে নেই। অর্থাৎ গ্রাহক স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ দেখবেন। সর্ষে বাটার ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে বাজারে এসেছে সর্ষে পাউডার। রান্নার আগে সেটিকে জলে গুলে কখনোই সর্ষের পেষ্ট হয়ে যাবে। এই পণ্যের বিজ্ঞাপনী ভাষায় ছিল, 'নো বাটাবাটি, ঝাঁঝ ফাটাফাটি এবং বাটাবাটির খাটাখাটির ঝামেলাকে টাটা'।

দুই. সংক্ষিপ্ত কাহিনির সাহায্যে নাটকীয় উপস্থাপনায় বিজ্ঞাপনী বার্তা জানানো হয়। দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কার্যক্ষমতাকেই নাটকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় দূরদর্শনে। যেমন, একটি বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরছে। জামায় কাদার বড় বড় ছোপ। মা কপাল চাপড়াচ্ছেন। তারপরই একটি ডিটারজেন্ট পাউডার বিশেযে কাদার দাগ উধাও করে দিল। এটাই একটি নাটকীয় উপস্থাপন, যে-নাটকীয় উপস্থাপনের বিজ্ঞাপনীভাষা জানিয়ে দেয় 'দাগ লাগা ভালো'।

তিন. দূরদর্শনে বিজ্ঞাপনী সম্প্রচারের ক্ষেত্রে পণ্য এবং পণ্যের বার্তার একটি চাযুষ রূপ প্রদান করা হয়। ব্রাণ্ডের নাম চিনিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে পণ্যের মোড়কটি কেমন দেখতে, সেটি হাতে আসে প্রদর্শনের সুযোগ থাকে। প্রতিযোগী সংস্থার তুলনায় যে বিশেষ কোম্পানির পণ্যটিই শ্রেষ্ঠ, তা প্রমাণের জন্য দুটি পণ্যের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা প্রদর্শিত হয়। বলা হয়, 'অমুক কোম্পানির পণ্য যদি আশি শতাংশ জীবনু নাশ করে, তাহলে আমাদের এই পণ্য নিরানব্বই দশমিক নয় নয় শতাং জীবণু নাশে সক্ষম।' ফলে বিজ্ঞাপনী ভাষায় তুলনামূলক বার্তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চার. নোটিশ বা নির্দেশাত্মক কোনো জাতীয় সচেতনতার ক্ষেত্রে সরাসরি বিজ্ঞাপনটি সম্প্রচারিত হয়। ইংরাজিতে এই ধরনের বিজ্ঞাপনই হল 'Doled' বিজ্ঞাপন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎপটে থাকে কোনো কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর পর্দায় প্রদর্শিত নির্দেশাবলী পাঠ করে। দশটি শোনার পাশাপাশি বিজ্ঞাপনটি পাঠের সুযোগ পান।

পাঁচ. অনেকসময় কোনো একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন, অনুষ্ঠানের সেই গতিকে বাধাপ্রাপ্ত না করে দূরদর্শনে মনিটারের নিচে ইঞ্চিখানেক জায়গা হতে আনুভূমিকভাবে নানা বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয়। স্বাভাবিকভাবে এই বিজ্ঞাপনে থাকে শুধুই তথ্য এবং জরুরি বা যোগাযোগ নম্বর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো জ্যোতিষী কোন্ দিন কখন ভক্তদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং সেই দেখা করার জন্য কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সেটি এইভাবে সম্প্রচারিত হয়। এটি বলে Derolling বিজ্ঞাপন।

ছয়. ‘এক শ্রেণির বিজ্ঞাপন রয়েছে, সেগুলি সাইলেন্ট। অর্থাৎ সংলাপহীন এই বিজ্ঞাপনগুলি সাধারণত খুব আবেগঘন হয়ে থাকে। আবেগঘন মুহূর্ত তৈরির ভার একজন ভাষ্যকার আড়ালে থেকে পণ্যের গুণমান সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

যেমন-ICICI Bank-এর একটি বিজ্ঞাপন। এ বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে স্কুল দুটির পর একটি বাচ্চা মেয়ে কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে একটি দোকানে আসছে। দোকানদার তখন খবরের কাগজ পড়ায় মগ্ন। প্লেব্যাকে বাজছে একটি গান। দোকানদার কাচের জায়ের ঢাকনা খুলে মেয়েটিকে চকলেট দিচ্ছেন এবং পয়সা নিচ্ছেন। পরের দিন আবার স্কুলে ঘণ্টা বাজে, স্কুল ছুটি হয়। মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে আবার দোকানে আসে। দোকানদার তখন ও খবরের কাগজ পড়ায় মগ্ন। তিনি তাদেরকে দেখে ইশারা করে জায়ের ঢাকনা খুলে চকলেট নিতে বলেন। তারপর টেবিলে কয়েকটা টোপ মেরে পয়সা দেওয়ার কথা বলেন এবং নিজে হাতে পয়সা সংগ্রহ করেন। তৃতীয় দৃশ্য অর্থাৎ তৃতীয় দিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। স্কুলে ছুটির পর বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে নিয়ে আসে তার ভাইকে। দোকানের সামনে এসে দেখে দোকানদার খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত। বাচ্চা মেয়েটি হাত দিয়ে তার জামার পকেট ফুটো হয়ে পয়সা পড়ে গেছে। করুণ মুখ করে মেয়েটি ভাইকে নিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। এই দৃশ্য দোকানদারের চোখে পড়ে। তিনি এগিয়ে আসেন। দুজনকে দুহাত দিয়ে দুটো চকলেট দেন। এরপর ভয়েস ওভারে ঘোষিত হয় এই ব্যাঙ্কটির মহিমা। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন দিনে সামার্থ্য না থাকলেও এই ব্যাঙ্ক যে মানুষের পাশে আছে এটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই ভয়েস ওভারে। ব্যঞ্জনাময় এই বিজ্ঞাপনটি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে পুরস্কৃত হয়েছিল। ভাষাহীনভাবে শুধুমাত্র ছবির সাহায্যে কত কী বুঝিয়ে দেওয়া হয় সেটিও টেলিভিশান বিজ্ঞাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।” (তথ্যসূত্র : ‘বিজ্ঞাপন নিয়ে/ডঃ চন্দন বাঙ্গাল)

দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন মন্ত্রচারের কিছু সুবিধাজনক বিষয় হল—দূরদর্শন মাধ্যম অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় এই মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদান করলে প্রায় প্রতি ঘরেই প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে। ফলে পণ্যের ব্যাপক প্রচারের সম্ভাবনা থাকে। নিরক্ষরতা এই মাধ্যমে ভাষাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ এটি দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম। নিরক্ষর হলেও সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যটিকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। দৃশ্য-শব্দ-গতি-রং সব মিলিয়ে এই মাধ্যমে সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপন দর্শকমনে তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। পণ্য প্রদর্শনের সুযোগের কাজে লাগিয়ে এই মাধ্যম সম্ভাব্য উপভোক্তাকে পণ্যটি কিনতে প্রলোভিত করে। বিজ্ঞাপনী সম্প্রচারের পূনরাবৃত্তির কারণে পণ্যের ব্রাণ্ড পরিচিতিয় বিস্তৃতি ঘটে।

উপরি উক্ত সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধাও এই মাধ্যমের অঙ্গ। যেমন, সংবাদপত্র তথা সুত্রিত মাধ্যম এবং বেতার মাধ্যমের তুলনায় দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনী মন্ত্রচারের ব্যয় অনেক বেশি। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম পণ্য পরিচিতি ঘটানোর ক্ষেত্রে সময় ও লাগে তুলনামূলক অনেক বেশি। যেমনও অনুষ্ঠান জনপ্রিয়, সেই অনুষ্ঠানচলাকালীন বিরতিতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলে। ফলে সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে দূরদর্শনে একাধিক চ্যানেল। ফলে কোন্ চ্যানেলে কোন্ অনুষ্ঠানের বিরতিতে পণ্যের বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করা লাভজনক, সেই নির্বাচন কঠিন হয়ে পড়ে।

২.৭ ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপন

দূরদূর্শনের পরে বিজ্ঞাপনের আধুনিকতম মাধ্যম হল ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোটি কোটি ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন রকমের সংবাদ সরবরাহ করা হয়। নতুন এই মাধ্যম বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করতে গেলে আগে এই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বেতার, দূরদর্শনে যে বিজ্ঞাপন দেখা বা শোনা যায়, ইন্টারনেটে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের আকার ও চরিত্র তার তুলনায় পৃথক। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় যেমন বেতারে-সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের চরিত্র আলাদা, বেতারে-সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় আলাদা দূরদর্শনে-সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপন; ঠিক তেমনই ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপন ও মাধ্যম অনুযায়ী আকার ও চরিত্রে পরিবর্তিত। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনের ভিত্তি কী? ওয়েবপেজ। এই ওয়েবপেজ চালু বা সচল রাখার জন্য মাসিক বা বার্ষিক হিসেবে টাকা দিতে হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনে বিষয় বা পণ্যই মূল আকর্ষনী শক্তি। কারণ, ব্যবহারকারীর যদি বিষয়টি পছন্দ না হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য ওয়েবপেজে চলে যাবেন। তাই বিজ্ঞাপনে মূল বিষয়টি লেখার পাশাপাশি রূপকল্পের সাহায্যে বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। ওয়েবপেজের ভূমিকা অনেকটা পত্রিকা প্রকাশের মতো। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনটি ওয়েবপেজে রাখেন। সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা এক অর্থে নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন সেই তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। অনলাইন কেনাকাটাও ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করায় ইন্টারনেট বিজ্ঞাপনের গুরুত্বও ক্রমবর্ধমান।

ওয়েব (web) বিজ্ঞাপনের একটি **বৈশিষ্ট**—বিজ্ঞাপনদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে অতিদ্রুত সংযোগস্থাপন। অন্যান্য মাধ্যমও বিজ্ঞাপনদাতকে গ্রাহক বা উপভোক্তার সহেগ যোগযোগস্থাপনে সাহায্য করে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপিত পণ্যটির কিছু সফল নির্বাচিত বার্তা গ্রাহকদের কাছে পেশ করেন। বিজ্ঞাপনদাতার বিশেষভাবে তৈরি বিজ্ঞাপন—যে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার, টেলিভিশন—যে মাধ্যমেই প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হোক না কেন, উদ্দিষ্ট গ্রাহক সেটি দেখতেও পারেন, অগ্রাহ্যও করতে পারেন। ইন্টারনেট ক্ষমতার এই কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে গ্রাহকমুখী করে তুলেছে। সম্ভাব্য গ্রাহক নানা চিন্তাভাবনার শেষে নিজেরা স্থির করেন, তাঁরার কী দেখতে চান। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতার মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রাহকেরা সেই বিজ্ঞাপন কেন দেখছেন।

অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে—সংবাদ, সামায়িকপত্র, বেতার, দূরদর্শন—বিজ্ঞাপনের জন্য সময় অত্যন্ত সীমিত। পণ্য বা পরিষেবার বিস্তৃতি হল, বিজ্ঞাপনদাতা গ্রাহকের কতটা সময় নিতে পারবেন। গ্রাহকরা

আশা করেন, ওয়েব-এ তাঁরা প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাবেন। তাই, বিজ্ঞাপনদাতার লক্ষ্য থাকে, সম্ভাব্য সব তথ্য এমন আকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা—যাতে তা গ্রাহককে সেই নির্দিষ্ট ওয়েবপেজ বারবার খুলতে উৎসাহিত করে তোলে।

ওয়েবহ বিজ্ঞাপনের সূচনায় বিশেষ ও অনন্য উপহারের প্রস্তাবই ওয়েব বিজ্ঞাপনকে আকর্ষক করে তুলেছিল। ইন্টারনেট সমাজ সাধারণ সংবাদপত্রের পাঠক বা দূরদর্শনের দর্শক সমাজের তুলনায় ভিন্ন। তাঁরা এখনও 'উপহার' এবং 'বিশেষ সুযোগ'-এর মায়া থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। তাই, বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখার সময় ওয়েব বিজ্ঞাপনকারীকে মাথায় রাখতে হয়, গ্রাহককে কীভাবে 'বিশেষ সুযোগ' বা 'উপহার'-এর জন্য প্রলোভিত করা যায়। ইন্টারনেট সমাজ এমনই যে, ওয়েববিজ্ঞাপন বিরদ্ধি, উৎপাদন করলে ব্যবহারকারী অন্য ওয়েব পেজে চলে যাওয়ার পাশাপাশি পূর্বের বিজ্ঞাপন ও পণ্য সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন।

ওয়েবপনে বিজ্ঞাপনের তিনটি অংশ আছে—শিশুগত বিষয়, বিপণন সংক্রান্ত ও কারিগরী। শিশুগত বিষয় হল, পণ্য বা পরিষেবার কীরকম ভাবমূর্তি প্রচারিত হবে—সেটি বিজ্ঞাপনদাতাকে ভাবতে হয়। এর পাশাপাশি তাঁর চিন্তার বিষয়। বিজ্ঞাপনী বার্তাটি কতটা কার্যকারী রূপে প্রযুক্ত হবে, বিজ্ঞাপনে কোন্ কোন্ রং ব্যবহৃত হবে ইত্যাদি। বিপণন সংক্রান্ত বিষয়টি হল, বিজ্ঞাপনদাতা বিপণনের কোন্ কৌশলটি অবলম্বন করবেন। সবশেষে থাকে কারিগরী বিষয়, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতার ওয়েবেপেজ কীভাবে অনলাইনে যাবে।

ওয়েবকে বলা যেতে পারে ইন্টারনেটের র্মাল্টিমিডিয়ার শাখা। শব্দ, অ্যানিমেশন এবং দৃশ্য ??? ইন্টারনেটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। মুদ্রণ মাধ্যম যদি একটি চিত্রের হাজার-শব্দ-সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে ইন্টারনেটতা কোটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম।

ইন্টারনেট বিজ্ঞাপনদানের **কৌশলটি** ঠিক কী? ওয়েব বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথম 'পেজ' এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য আকর্ষকভাবে উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়। সেখানে আরো জানানো দরকার, প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তী পেজ'গুলিতে ঠিক কী আছে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম ওয়েবপেজ কত আকর্ষকভঙ্গিতে উপস্থাপিত হবে, তার ওপরেই নির্ভর করবে, গ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতার ওয়েব বিজ্ঞাপনের পরবর্তী কোনো ওয়েবপেজ ডাইনলোড করবেন কিনা। মনে রাখা দরকার। গ্রাহক ওয়েববিজ্ঞাপনের যেকোনো পেজেই সরাসরি যেতে পারেন—প্রথম ওয়েবপেজ মারফতই যেতে হবে। এমনটা নয়। কাজেই বিজ্ঞাপনপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়েবপেজেই 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' রূপে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

ইন্টারনেটে **ব্যানার বিজ্ঞাপন** কী? ওয়েবপেজে যেসমস্ত বিজ্ঞাপন আসে, সেগুলিকেই বলা হয় ব্যানার বিজ্ঞাপন। এই ব্যানার বা চিত্ররূপ বিভিন্ন আকারের হতে পারে। তবে আকার বা মান যাই হোক না কেন, তা যাতে বিজ্ঞাপনীবার্তাকে কার্যকরীভাবে জানাতে সক্ষম হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় বিজ্ঞাপনদাতাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব বিজ্ঞাপনে কোনো প্রশ্ন থাকে, সেগুলির উত্তর জানার জন্য গ্রাহকরা উৎসুক হয়ে পড়েন ও উত্তর জানার পর স্বস্তিবোধ করেন। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপনবার্তা বিশ্বাসযোগ্যরূপে (convincing) গ্রাহককে জানানো সম্ভব।

যাঁরা ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য অন্বেষণ করেন, তাঁরা প্রথমে ‘বিষয়’ বিভাগ দেখেন। কাজেই ‘বিষয়’ বিভাগে এক-দু লাইনে সংক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা জানাতে হয়। গ্রাহক উৎসাহিত বোধ করলে তবেই তিনি সেই নির্দিষ্ট ওয়েবপেজটি খুলবেন। অনলাইন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে গ্রাহকরা পড়েন না—শুধু চোখ বুলিয়ে দেখেন। কোনো বার্তা বা message খুলে কয়েক লাইন মাত্র পড়েই অন্যত্র চলে যান।

যে-ওয়েবপেজ বেশি সংখ্যক গ্রাহককে আকর্ষণ করতে সমর্থ, সেইরকম কোনো পেজে ব্যানার বিজ্ঞাপন দিলে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সংখ্যক উপভোক্তার কাছে বিজ্ঞাপনী বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। প্রথম পেজে ব্যানার বিজ্ঞাপনের rate বেশি, পরবর্তী পজেগুলিতে তুলনায় কম। তাসত্ত্বেও বিজ্ঞাপনদাতারা প্রথম পেজেই ব্যানার বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইন্টারনেটে ওয়েব বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে **বিষয়লিপি** কী ধরনের হয়? বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপির দুটি অংশ—শিরোনাম ও বিশদ বিষয়লিপি। শিরোনাম সাধারণত সংক্ষিপ্ত—কয়েকটি মাত্র শব্দে গঠিত। বিশদ বিষয়লিপি বিজ্ঞাপনটিকে বিস্তৃতি প্রদান করে। মুদ্রণমাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভালো শিরোনাম বিজ্ঞাপনের সাফল্যের মূল করাণ—শিরোনাম আকর্ষক না হলে খুব ভালো বিষয়লিপিও সফল হয় না। ব্যানার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শিরোনামই প্রধান। ব্যানার যদি গ্রাহকের উৎসাহ বা আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, তবেই গ্রাহক পেজ-এ বিস্তৃতি তথ্য দেখবেন। ওয়েব বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বিষয়লিপিতে নানা চিত্রের ব্যবহারে পণ্য বা পরিষেবাকে আকর্ষন ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়। সীমিতসংখ্যক ও বিপরীতধর্মী রঙের ব্যবহার করলে তা দর্শককে আকৃষ্ট করে।

ব্যানার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথমে বক্তব্য জানিয়ে পরে চিত্ররূপ দেখানো হয়। সমস্ত ব্যানারই যেহেতু গ্রাহককে পরবর্তী পেজ দেখার জন্য প্রলোভিত করে, তাই সেক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘আরো আছে, এখানে ক্লিক করুন’ (More, click here), ‘আপনি বা আপনার’, ‘টাকা বাঁচান’, ‘নতুন’, ‘কেমন করে’ইত্যাদি। পুনরাবৃতচত ব্যানার বিজ্ঞাপনে গ্রাহক স্বাভাবিককভাবেই বিরক্তবোধ করে। তাই কিছুদিন অন্তর ব্যানার বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপনের একটি বৃহৎ অংশ হল **ডিজিটাল বিজ্ঞাপন**। কী এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপন? মূলত বিজ্ঞাপনের ভিডিও। এই ভিডিওর পরিবেশে মানুষ কতক্ষণ থাকে, কীভাবে সময় কাটায়—এর ওপরই নির্ভর করে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নির্মাণ। ১৯৯৪-এ ওয়েবে প্রথম প্রকাশিত হয় ডিজিটাল বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা ‘এটিঅ্যান্ডটি’-র বিজ্ঞাপন ছিল সেটি। তারপর থেকে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের আমূল পরিবর্তন ঘটে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন রংগস চক্রবর্তী। তিনি সেখানে বিশদে বিশ্লেষণ করেছেন পে পার ক্লিক। কী এই পে পার ক্লিক? ‘ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নানান রকমের হয়। এর মধ্যে একটা হল পে পার ক্লিক বা পিপিসি। তার মানে হল ধরুন আপনি গুগলে গিয়েছেন কিছু খুঁজতে, হয়তো ভারতে পর্তুগিজ শাসনের ইতিহাস। এমনিই জানার জন্য। কিন্তু আপনার খোঁজের পাতার ডান

পাশে গোয়াতে ছুটির বিজ্ঞাপন আসতে থাকছে। কারণ পর্তুগিজদের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে আপনি গোয়ার বেড়াতে যেতে পারেন, ওখানে পর্তুগিজ শাসন ছিল। কিছুক্ষণ পর আপনার মন টানল আপনি বিজ্ঞাপনটায় ক্লিক করলেন, বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে ওয়েবেসাইট পয়সা পেল। পুরোনো মিডিয়ার সঙ্গে ডিজিটালের তফাৎ হল যে স্টেটসম্যানে আপনি বিজ্ঞাপনটা দেখেলেন কি না সেটা জানবার উপায় ছিল না, পরে রিসার্চ করে জানতে হত, কিন্তু ডিজিটালে জানা গেল যে আপনি উৎসাহ নিলেন। এর আরেকটা দিক হল আপনি ভারতে পর্তুগিজ শাসনের ইতিহাস দেখছিলেন বলে গোয়ার অ্যাড পেলেন, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর খেলা দেখলে হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপ টিকিট সহ রাশিয়া ভ্রমণের বিজ্ঞাপন পেতেন। এরকম কিছুটা আগেও করা যেত যেমন খেলার পাতায় নাইকির বিজ্ঞাপন বা ছোটদের পাতায় ক্যাডবেরি, কিন্তু এত বেশি করে, এত পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করে প্রতিবার, বারবার করা যেত না। আর উৎসাহ মাপা বা সরাসরি বিক্রির দিকে এগোনোর প্রশ্ন ছিল না।

ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের আরেকটি উল্লেখয্যেগা দিক হল কী ওয়ার্ডস ??? বা চাবি শব্দ। সেটী কী? রংগম চক্রবর্তীর ভাষায়, 'ডিজিটাল বিজ্ঞাপন তৈরি করার একটা জরুরি দিক হল 'কী ওয়ার্ডস' মাথায় রাখা। ক্রেতারা যখন কিছু সার্চ করেন তখন তাঁরা কিছু শব্দ মাথায় নিয়ে সার্চ করেন যেমন আপনি নতুন বাড়ি রং করবেন, তাহলে আপনি 'পেস্ট', 'পেস্টার', 'হাউস', 'অ্যাক্রিলিক ইমালশন' এরকম কিছু কথা ধরে গুগল বা কোথাও খুলবেন। এবার ধরুন 'এশিয়ান পেন্টস' বা 'আবরান ক্ল্যাপ' বা 'সুলেকা' যারা এই রকম সার্ভিসের বাজারে কাজ করে তারা এমনভাবে তাদের বিজ্ঞাপনগুলোর শব্দ সাজাবে যাতে এই খোঁজ তৈরি হলেই তাদের বিজ্ঞাপন ফুটে ওঠে। যিনি জুতো বিক্রি করছেন 'স্নিকার্স', 'লোফার', 'মেয়েছো জুতো' এই রকম শব্দ তাঁর বিজ্ঞাপনকে রাখবেন যাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খোঁজে তার নাম ওঠে। কোটি কোটি সার্চ ঘেঁটে এই শব্দগুলো নিয়ে নিয়মিত রিসার্চ করা হয়, তালিকা তৈরি হয় এবং বিক্রি করা হয়। কোন কী ওয়ার্ডের দাম কত সেটা তার ইতিহাস ঘেঁটে ঠিক হয়। যেমন ধরুন 'লেদার' কথাটা যদি ক্রেতাদের জুতো খোঁজায় সবচেয়ে বেশি বার ব্যবহার হয়ে থাকে তবে গুগল সার্চে এই কথাটা ব্যবহার করতে জুতো চিনে তাকে সবচেয় বেশি খরচ করতে হয়। কাজেই এখানে আবার কায়দাটা হল কী ওয়ার্ড রিসার্চ করে এমন কথা খুঁজে বের করা যেটা অতটা দামি নয় কিন্তু অনেকটাই কার্যকরী। যেমন হয়তো 'বুটস' কথাটা ব্যবহার করলেও অপনি কয়েক লক্ষ সাটে নাম তুলতে পারবেন কিন্তু খরচ হবে অনেক কম। এইধরনের কী ওয়ার্ডসের বলা হয় 'লঙ টেল কী ওয়র্ড' বা লম্বা লেজের কী ওয়র্ড। পেশাদারিভাবে কী ওয়র্ড নিয়ে সাহায্য করবারও অনেক সংস্থা তৈরি হয়েছে। কোন কোন কী ওয়র্ড বিজ্ঞাপনদাতাকে সাহায্য করবে তার তালিকা যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার কোন কোন কী ওয়র্ড সাহায্য করবে না, সেটাও জানা যায়, তাকে বলে 'নেগেটিভ কী ওয়র্ডস'। যেমন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'সেল্ফি-স্টিক' বিক্রি করতে চান তাহলে তিনি মিটকের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এমন মানে 'লিপ', 'ওয়কিং', 'ডিপ', 'ইনসেন্স', 'হকি' এই সব শব্দগুলোকে নেগেটিভ তালিকায় ফেলে আটকে দেবেন। যাতে মার্চ লিপিস্টিক, ওয়াকিং স্টিক এরকম ভুল দিকে চলে না যায়।'

ডিজিটাল বিজ্ঞাপন কেন এত শক্তিশালী? কারণ, 'এর কোনো শক্তি নেই। ...বহু ক্ষেত্রেই এর কাছে কোনো মানুষ জড়িত নয় যে যঁশকি মারবে বা ঘুমিয়ে।। পড়বে। বিজ্ঞাপনদাতারা জানেন যে সবসময়

ক্রেতা একবারেই একটা ব্র্যাণ্ড কেনে না। তার পেছেনে লেগে থাকতে হয়, তাকে লালন পালন করে যেতে হয়। পুরোনো বিজ্ঞাপন মিডিয়াতে এই লালনপালনের গন্ধ এতটা ছিল না, কারণ মিডিয়ার আপনার পেছনে পেছনে এতটা ঘুরতে পারত না। বড় জোর আপনাকে রোজ বা প্রতি সপ্তাহে একট ব্র্যাণ্ডের গল্প বলে যেতে পারত। এখন প্রোগ্র্যামাটিক মার্কেটিং, রিটাগেটিং এই রকম সব পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রেতার পেছনে পড়ে থাকা, তাকে নতুন নতুন ভাবে বার্তা পাঠানো সহজ হয়ে উঠেছে। নানান চ্যানেল জুড়ে, নানান ওয়েবসাইট করে এই কাজটা করে চলা যায়। মাঝে মাঝে কোনো একটা সাইটে কোনো কিছুর খোঁজ করলে মাসের পর মাস সেই অনুষ্ঠিত নানান বিজ্ঞাপন নানান সাইটে আসতেই থাকে। যেমন হয়তো হালকা চামড়ার জুতো খোঁজ করে ভুলেও গিয়েছেন, কিন্তু তারপর গুগলে কিছু সার্চ করতে যান, কী হোটেল বুক করতে যান, পাতার ওপর নানান জুতো এসে হাজির হতে থাকবে...।'

২.৮ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানা পরিভাষা

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানা পরিভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটি নির্বাচন করে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল—

১. **Publicity (প্রচার)** ঃ কোনো পণ্য, পরিষেবা বা ব্যবসায়ী সংস্থার চাহিদা বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যিক স্বার্থে, সংবাদের আকারে কোনো কিছু প্রকাশের ব্যবস্থা।

২. **Sales Promotion (বিক্রি বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রকল্প)** ঃ কোনো পণ্য বা পরিষেবার বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। এটি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রিয়াশীল থাকে।

৩. **Personal Selling (বিক্রির জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ)** ঃ সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে কথোপকথনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির চেষ্টা। স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থ্য়, সীমিত এলাকায় এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। পদ্ধতিটি ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ।

৪. **Accout** ঃ বিজ্ঞাপনদাতা মক্কেল বা খরিদ্দারকে বিজ্ঞাপনী পরিভাষায় ??? বলা হয়।

৫. **Steady Schedule (স্থিরীকৃত সময়সূচি)** ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পুনরাবৃত্তিতে উদ্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে বিজ্ঞাপন পরিবেশন বা উপস্থাপন।

৬. **Step-up Schedule (ক্রমবর্ধমান সময়সূচি)** ঃ কোনো নতুন পণ্য বাজারে উপস্থাপনের সময়পণ্যটির প্রস্তুতকারক বিজ্ঞাপনদাতা কয়েকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞাপনী প্রচার শুরু করেন। বলা হয় 'আসছে আসছে'। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে পণ্যটি কী ধরনের, সেই ইঙ্গিত দেওয়া হলেও বিশদ বিবরণ অমুল্লিখিত থাকে। কয়েকদিন ধরে এভাবেই গ্রাহকের কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা হয়। এরপর হঠাৎ একদিন পড়ে আকারের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়, পণ্যটি 'এসে গেছে'। ঘোষণামূল এই সর্বশেষে বিজ্ঞাপনটিতে পণ্যটির বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়। পণ্যটিকে কেন্দ্র করে গ্রাহকের আগ্রহ ধীরে ধীরে বর্ধিত হয় বলেই, একে ক্রমবর্ধমান সময়সূচি বা Step-up schedule বলা হয়।

৭. **Creative (সৃজনশীল)** ঃ সৃজনশীল বিভাগ বা Creative team-এর কাজ হল বিজ্ঞাপনদাতা বা মক্কেলের জন্য সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটি তৈরি হয়। এই দলে থাকেন ডিজাইনার, পরিচালক, মিডিয়া ম্যানেজার প্রমুখ।

৮. **Activation (সক্রিয়করণ)** ঃ সক্রিয়করণ বা Activation হল একটি বিপণন কৌশল যা গ্রাহকদের মধ্যে ব্র্যাণ্ড সচেতনতা বা এ্যান্ডের প্রতি আনুগত্য গড়াতে সাহায্য করে।

৯. **Asset (সম্পদ)** ঃ সৃজনশীল বা creative দল সাধারণত ছবি, গ্রাফিক্স বা ভিডিওৰ মতো ক্যাপচার (capture) করা বিষয়বস্তু বোঝাতে 'asset' শব্দটি ব্যবহার করে। এটি একধরনের ডিজিটাল আইটেম—যা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়।

১০. **Bleed** ঃ বিজ্ঞাপনের একটি নক্শাকে বা ডিজাইনকে পাতার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যখন প্রসারিত করা হয়, তখন তাকে Bleed বলে। এই bleed থাকবার জন্যই বিজ্ঞাপনী পাতাটি যখন নির্দিষ্ট আকারে কাটা হয়, তখন সেখানে সাদা সীমা প্রদর্শিত হওয়ার কোনো আশংকা থাকে না।

১১. **Brand Equity** ঃ পণ্য যখন তার নিজের গুণের তুলনায় ভাবমূর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন সেটিকে বলে Brand Equity। সেক্ষেত্রে ব্যাণ্ডটি তার গুণের তুলনায় নিজস্ব খ্যাতিকে ব্যবহার করে। যে ব্র্যাণ্ডের 'ইকুইটি' যত বেশি, সেই ব্র্যাণ্ড তত বেশি জনপ্রিয়।

১২. **Creative Brief** ঃ সৃজনশীল দল যখন সংক্ষিপ্ত একটি নথিতে পণ্যটির লক্ষ, চ্যালেঞ্জ, ভোক্তা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করে, তখন সেটিই হল Creative brief।

১৩. **CTA (Call to Action)** ঃ বিজ্ঞাপনদাতা তাদের বিজ্ঞাপনটি দেখার পর উপভোক্তাকে যা করতে বলেন বা যেভাবে সক্রিয় হতে বলেন, সেটিই হল Call to Action। যেমন, 'আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে চান? এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।' বা, 'আমাদের দক্ষ কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে চান? এই চলভাষা বা মোবইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। ইত্যাদি।

১৪. **Pre-prouduction** ঃ প্রোডাকশন শুরুর আগে যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেই সবকিছুই pre production-এর অন্তর্ভুক্ত। Pre production-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ফটোশুটের জন্য মডেল নির্বাচন, মডেলের পোশাক, আলোর ব্যবস্থা পশ্চাৎপট নির্মাণ ইত্যাদি।

১৫. **Production** ঃ বিজ্ঞাপনী পরিভাষায় production বা উৎপাদন বলতে বার্ণিজ্যিক বা কর্মাশিয়াল বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বোঝানো হয় যখন বিজ্ঞাপনটি ভিডিও ফুটেজ এবং ফটোগ্রাফির আকার ধারণ করে। অর্থা?, 'Production ot the physical creation of a project. For a commercail or ad campaign, production would be shoot day where video footage and photography are captured.'

১৬. **UGC (User-Generated Content) ঃ** UGC বা User-generated content হল যখন একজন ব্যবহারকারী বা user কোনো একটি ব্র্যাণ্ডেড পণ্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। সোশাল মিডিয়ায় দেখা যায়, লোকেরা প্রায়শই পোস্টগুলিতে কোনো ব্র্যাণ্ডকে ট্যাগ করছে বা হ্যাশট্যাগ যুক্ত করছে। ব্র্যাণ্ডগুলি এই ধরনের পোস্টের সঙ্গে interact করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্র্যাণ্ডের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেটি পুনরায় পোস্ট করে।

১৭. **USP (Unique Selling Proposition) ঃ** কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ডের একটি পণ্যকে বাজারে প্রতিযোগিতার ভিড়ে গ্রাহক যাতে সহজেই খুঁজে নিতে পারেন। সেজন্য পণ্যটিকে অনন্য বা 'unique' করে তুলতে হয়। বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মী, শিল্পীর কাজই হল পণ্যটি বিপণনের অনন্য বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করা—যা পণ্যটিকে বাজার জাত পণ্যর তুলনায় পৃথক করে তুলবে।

১৮. **VI (Visual Identity) ঃ** একটি ব্র্যাণ্ডের ভিজুয়াল আইডেন্টিটি বা দৃশ্যগ্রাহ্য শনাক্তকরণের বিষয়টি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের ওপরে নির্ভরশীল। যেমন, ব্র্যাণ্ডের রং, লোগো, যমট, হরফ, ওয়েবসাইট, সোশালমিডিয়া চ্যানেল ইত্যাদি। এই সবগুলিই ব্র্যাণ্ডটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে, যাতে ব্র্যাণ্ডটি দেখামাত্র গ্রাহক বা উপভোক্তা সেই ব্র্যাণ্ডসংলগ্ন বৈশিষ্টগুলি চাক্ষুষ করতে পারেন।

১৯. **VO (Voice Over) ঃ** Voice Over হল যখন কোনো বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত পণ্য বা পরিষেবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চাৎপটে কোনো কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হয়। Voice Over বিজ্ঞাপনে একটি স্ক্রিপ্টের মতোই লিখিত হয়—বিজ্ঞাপনের চরিত্র অনুযায়ী তারপর নির্বাচন করা হয় কে কীভাবে সেই voice over-এর কাজটি করবেন। তাঁর কণ্ঠ শোনা গেলেও তিনি অদৃশ্য থাকেন।

২০. **White Space ঃ** হোয়াইট স্পেস অর্থে বোঝানো হয় শূন্যস্থান। বিজ্ঞাপনে বিষয়লিপির কোনো অংশকে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের জন্য যখন একটি নির্দিষ্ট অংশ ফাঁকা বা শূন্য রাখা হয়—যেস্থানে কোনো শব্দ বা ছবি ব্যবহৃত হয় না, সেটিই হল হোয়াইট স্পেস। এই শূন্যতা বিজ্ঞাপনে স্বল্পলিখিত বিষয়লিপিকে অধিকতর দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে।

২১. **Reach ঃ** এটির আক্ষরিক অর্থ পৌঁছনো। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি ঠিক কতজন গ্রাহকের কাছে পৌঁছচ্ছে—কতজন গ্রাহক সেই বিজ্ঞাপনটি দেখছেন। যদি কোনো বিজ্ঞাপন হাজার জন উপভোক্তার কাছে পৌঁছয়, তাহলে সেই বিজ্ঞাপনের ??? হাজার।

২২. **Agency (সংস্থা) ঃ** বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা Advertising Agency (সংক্ষেপে Ad Agency) হল সেই প্রতিষ্ঠান যারা কোনো মক্কেল বা খরিদ্দারের হয়ে কোনো পণ্য বা পরিষেবার ব্যবসায়িক প্রচার স্বার্থে বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেন।

২৩. **Copy ঃ** বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি বা লিখিত অংশকে বিজ্ঞাপনী পরিভাষা 'কপি' বলা হয়।

২৪. **OTO (One Time Only) ঃ** যে বিজ্ঞাপন মাত্র একবার বাণিজ্যিক ঘোষণা করে, সেটি OTO হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫. **Budget** ঃ একটি বিজ্ঞাপন নির্মাণে যত খরচ হয়, সেটির পাশাপাশি সেই বিজ্ঞাপন মন্ত্রচারের মিলিত ব্যয়ই হল একটি বিজ্ঞাপনের বাজেট।

২৬. **Key Word (চাবিশব্দ)** ঃ বিজ্ঞাপনী পরিভাষার ক্ষেত্রে চাবি শব্দ বা Key Words হল এমন শব্দ বা বাক্যাংশ যা একটি নির্দিষ্ট পর্ণ্য খুঁজে পেতে গ্রাহককে সহায়তা করে। অর্থাৎ পণ্যটি যদি হয় চকোলেট, তাহলে তার চাবি শব্দ হবে ‘চকোলেট’, ‘মিলক’, ‘ডার্ক’, ‘ড্রাইফ্রুট’ ইত্যাদি।

২৭. **নেতিবাচক চাবিশব্দ (Negative Keyword)** ঃ কোনো পণ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলি বা বাক্যাংশগুলি বাধা প্রদান করতে পারে বলে বিবেচ্য হয়, সেগুলি নেতিবাচক চাবিশব্দ বা নেগেটিভ কী-ওয়ার্ডস। যেমন, পণ্যটি যদি হয় মিনারেল ওয়াটার, সেক্ষেতে নেতিবাচক চাবি শব্দ হতে পারে ‘প্রুফ’, ‘মেলন’ ইত্যাদি যাতে ‘ওয়াটারপ্রুফ’, ‘ওয়াটারমেলন’ ইত্যাদি শব্দগুলি অনুসন্ধানের বাধা সৃষ্টি না করে।

২৮. **Impresssion** ঃ কোনো একটি বিজ্ঞাপন কতবার প্রদর্শিত হচ্ছে, সেই সংখ্যাটিকে বিজ্ঞাপনী পরিভাষায় বলা হয় imprssion।

২৯. **Click** ঃ কোনো একটি বিজ্ঞাপনে উপভোক্তা বা গ্রাহক কতবার ক্লিক করলেন সেই সংখ্যাটিই হল ক্লিকের পরিমাণ।

৩০. **CTR (Click Through Rate)** ঃ CTR হল এমন একটি পরিমাপক যা অনলাইন বিজ্ঞাপনের সাফল্য হার পরিমাপ করে। ক্লিকের সংখ্যাকে ইম্প্রেশানের সংখ্যা দিয়ে বিভক্ত করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, সেটিই হল CTC।

২.৯ সারাংশ

বিজ্ঞাপনের ভাষা নানাবিধ উপাদারে সমন্বয়ে গঠিত। যেখানে থাকে মূল শিরোনাম, বিষয়লিপি, ছবি, ট্রেডমার্ট, লোগো ইত্যাদি। মাধ্যম অনুযায়ী বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনের ভাষা পৃথক। মুদ্রিত মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের তুলনায় বেতারে সম্প্রসারিত বিজ্ঞাপন আলাদা। বেতার-সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় আবার দূরদর্শন ও বর্তমানে সমাজমাধ্যমে মন্ত্রচারিত বিজ্ঞাপন চারিত্রিকভাবে পৃথক। নানাবধি পার্থক্য সত্ত্বেও মূল যে-সূত্রে এই সমস্তমাধ্যমের বিজ্ঞাপনগুলি একসূত্রে গ্রথিত, সেটি হল বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ ক্ষমতা—গ্রাহককে কোনো একটি পণ্য ব্যবহার করতে প্রলোভিত করা। বিজ্ঞাপনের নানা পরিভাষার মধ্যে নির্বাচিত তিরিশটি এই এককে পাঠ্য।

২.১০ অনুশীলনী

(ক) বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. মুদ্রিত মাধ্যমে সাম্প্রতিক-প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের ভাষাক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন, হরফ কীভাবে বিজ্ঞাপনের ভাষার অঙ্গীভূত?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. কীভাবে কোনো একটি পণ্যের কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়, সাম্প্রতিক একটি বিজ্ঞাপনের মতে তা আলোচনা করুন।

২. USP বলতে কী বোঝেন? কোনো একটি পণ্যের উল্লেখে সেই পণ্যের USP কী হতে পারে, তা বুঝিয়ে দিন।

৩. চাবিশব্দ ও নেতিবাচক চাবি শব্দ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করুন।

(গ) অতিসংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. অ্যাকাউন্ট কী?

২. OTO বলতে কী বোঝানো হয়?

৩. কোনো একটি বিজ্ঞাপনের চিত্তাকর্ষক tagline টি উল্লেখ করুন।

৪. বিজ্ঞাপনী প্রকারে জনপ্রিয় তারকাকে ব্যবহারের কারণ কী?

৫. ওয়েব বিজ্ঞাপন কী?

৬. বিজ্ঞাপনে 'টেলিগ্রাফিক ল্যাংগয়েজ'-এর একটি উদাহরণ দিন।

৭. লোগো কী?

২.১১ সহায়ক গ্রন্থ

১. ''বিজ্ঞাপন রচনা', জয় সরকার, পি. জি. ডি. জে. এম. সি. ষষ্ঠ পত্র (খ)-এর পাঠ-উপকরণ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪।

২. 'বিজ্ঞাপন ও বিপণন', ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, লিপিকা, প্রথম প্রকাশ-২০১৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০২৩)

৩. 'বিজ্ঞাপন নিয়ে', ডঃ চন্দন বাঙ্গাল, অক্ষরবৃত্ত, ডিসেম্বর ২০২১।

৪. 'বিষয় বিজ্ঞাপন', রংগন চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

একক ৩ ❑ বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য

৩.৪ বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ড বা ভারমূর্তির গুরুত্ব

৩.৫ পোজিশানিং এবং রিপোছিশানিং

৩.৬ বিজ্ঞাপন কীভাবে তৈরি হয়?

৩.৭ বিজ্ঞাপন ও মোড়ক ঃ বিপনন কৌশল

৩.৮ বিজ্ঞাপনের রাজনীতি

৩.৯ বিজ্ঞাপন ঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত

৩.১০ সারাংশ

৩.১১ অনুশীলনী

৩.১২ সহায়ক আকরপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞাপন কীভাবে তেরি হয়, তার নির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। বিজ্ঞাপনের চরিত্র অনুযায়ী সেই প্রস্তুতি নির্ভর করে। তবে বিজ্ঞাপন সৃষ্টির যে নির্দিষ্ট কয়েকটি স্তর আছে, সেগুলি মাধ্যম অনুযায়ী মোটামুটি নির্দিষ্ট। পণ্য তৈরি হওয়ার পর সেটি কীভাবে বাজারজাত হয় এবং বাজার হাত হওয়ার পর কীভাবেল সেই পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন ক্রিয়াশীল হয়, সেটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদানই এই এককের উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য, বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ডবা ভাবমূর্তি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, পোজিশানিং কাকে বলে, রিপোজশানিং-ই বা কী, বিজ্ঞাপনে সৃজনশীলতা বা ,,-র প্রয়োজন কতখানি, মোড়ক কীভাবে বিপনন কৌশলের অঙ্গীভূত হয়ে বিজ্ঞাপনকে চমক্প্রদ করে তোলে। পাশাপাশিই বিজ্ঞাপনী প্রচারে ঠিক কতখানি ‘সত্য’ পরিবেশিত হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের রাজনীতি সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

৩.৩ বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য

বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্যই হল বিপনন বা বাজারজাতকরণ। 'বাজারজাতকরণ' মনে কী? কোনো একটি পণ্য উৎপাদন করা হল। এখন সেই উৎপাদিত পণ্য যদি বাজারে ঠিকমতো বিক্রি যা হয়, তাহলে সেই পণ্যের উৎপাদনটিই বিফলে যায়। তাই উৎসাহিত পণ্যকে যথাসাধ্য আকর্ষক করে বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করে বিজ্ঞাপন। বিপনন বা মার্কেটিং-এর ক্ষেত্রে তাই বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিপনন বিশেষজ্ঞরা বিপননের ক্ষেত্রে মূলত চারটি প্রাথমিক উপাদান চিহ্নিত করেছেন—একত্রে সেগুলিকে বলা হয় 4Ps (চারটি P)। কী কী? Product, Price, Placement এবং Promotion। বাংলায় এগুলিকে বলা যেতে পারে চারটি 'প'-এর সমাহার—পণ্য প্রণামী, পৌঁছাশে এবং প্রচার। বলাই বাহুল্য এই চার-এর মিশ্রণে প্রতিটি উপাদানের আনুপাতিক হার সবক্ষেত্রে সমান নয়। ব্যবসার চরিত্র প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি নানা মাত্রার ওপর বিপননের চূড়ান্ত কাঠামো প্রস্তুত হয়। প্রথমে এই চারটি উপাদান সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলা যাক। রংগন চক্রবর্তী তাঁর 'বিষয় বিজ্ঞাপন' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—

পণ্য বা product হল কোনো একটি বস্তু বা বিষয়, সেটিকে তৈরি করতে হবে। বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনো একটি কোম্পানি নিজেরা পণ্য তৈরি করে না। অন্য কোথাও সেই পণ্য তৈরির বরাত দেয়। পণ্য তৈরি হয়ে গেলে কোম্পানি শুধু নিজেদের ছাপ লাগিয়ে তা বাজারে জালান করে দেয়। যেমন, ছুতোর কোম্পানি গুলি বহু ক্ষেত্রেই নিজেরা সুতো বানায় না। আগ্রা বা কানপুরের কারিগররা জুতো বানানোর পর নির্দিষ্ট কোম্পানি নিয়মিত অর্ডারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে জুতো নিয়ে নিজেদের ছাপ লাগিয়ে বিক্রি করে। এই ছাপটাও আগে থেকেই কারিগরদের কাছে রাখা থাকে। তারাই জুতো তৈরির পর ছাপটা ছুতোয় লাগিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে, কারিগররা বিশেষ একটি কোম্পানির ছাপই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন কোম্পানি তাঁদের অর্ডার দেন। ফলে, একই কারিগরের তৈরি জুতো কখনো 'A' কোম্পানির ছাপে চলে, কখনো 'B' কখনো 'C'। কিন্তু বাজারে প্রতিটি কোম্পানি দাবি করে যে, তাদের জুতো অন্য কোম্পানির নির্মিত ছুতোর তুলনায় সেরা। অর্থাৎ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপই হল পণ্য বা Product প্রস্তুত করা।

'পণ্য' বা Product-এর সংজ্ঞা কী? যাতে বলা 'পণ্য'? এবিষয়ে নানাবিধ সংজ্ঞা থাকলে ও William J. Stanton তাঁর 'Fandamentals of Marketing' গ্রন্থে যে-সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, সেটিই তুলনামূলকভাবে মান্যতা পেয়েছে। স্ট্যানটন বলছেন, 'A product is a tangible and intangible attribute, including packaging and manufacturer's prastige, retailer's prestige and manufacturer's and retailer's serivices which buyer may accept as affering satisfaction of wants and needs.' অর্থাৎ, 'পণ্য' মানে কোনো ভৌত বা পার্থিব বস্তুই নয়। সেইসঙ্গে পরিষেবা বা 'Service' ও পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। খেয়াল

করলে দেখা যায়, বিভিন্নক্ষেত্রে (পরিবহন ব্যবস্থা, বিনোদন, হোটেল, বিমান, ব্যাঙ্ক, বিমা) আমরা যেসব পরিষেবা গ্রহণ করে থাকি, পণ্যের দায়ের সঙ্গে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা থাকে।

পণ্য মূলত দুই প্রকার—ভোগ্যপণ্য এবং শিল্পপণ্য। অনেকক্ষেত্রে একই পণ্য ব্যবহারের নিরিখে উভয়ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়। রান্নার গ্যাস যখন বাড়িতে ব্যবহৃত হয়, তখন তা গৃহস্থালির গ্যাস। কিন্তু এই গ্যাস যখন বড়ো হোটেল বা রেষ্টুরেণ্টের-এ ব্যবহৃত হয়, ওয়েল্ডিং-এর কাজে লাগানো হয়, তখনই সেটা শিল্পপণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভোগপণ্য ও শিল্পপণ্যের বাজার স্বাভাবিকভাবেই আলাদা। তাই উভয়ক্ষেত্রের বিজ্ঞাপনও পৃথক। খাবার; জামা-কাপড়, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, মুদিখানার পণ্য ইত্যাদি সাধারণ ভাবে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়। প্রতিটি পরিবারকেই নিয়মিত সশয় অজ্ঞার এই জিনিসগুলি কিনতে হয়। অন্যদিকে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্র, কলকজা, মূল উপাদান যেমন লোহা, সিমেন্ট, পলি, ইঁট, সোনা, রূপো ইত্যাদি হল শিল্পপণ্য। শিল্পপণ্যের মধ্যে-ইলেকট্রনিক্স বস্তুও আছে-যেমন কম্পিউটার, মোবইল, ফোন ইত্যাদি।

বিপন বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, একই পণ্য ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। ফলে পণ্য শ্রেণীবদ্ধকরণের সময় তাঁরা বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা মূত্র অবলম্বন করেছেন। যেমন, 'Journal of Political Economy' 'Advertising for Information' নিবন্ধে ব্যবহারের ধারা অনুযায়ী পণ্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—Experience goods (অভিজ্ঞতামূলক পণ্য) এবং Search Goods (তল্লাশী বা ,, পণ্য)। যেমন, কোনো খাবার—সেটি আস্বাদ করার পরই বোঝা যায় খেতে কেমন। ফলে এটি অভিজ্ঞতামূলক পণ্য—খেয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। পাশাপাশি Search Goods বা সন্ধানী পণ্য হল সেই ধরনের পণ্য, যে-পণ্য কেনার আগে পণ্যটি সম্পর্কে সাধারণত মানুষ খোঁজ নেন বা সন্ধান চালান। নানা পরিসংখ্যান যাচাই করে তারপর ক্রেতা সেই পণ্যটি কিনতে আগ্রহী হন। মোবাইল ফোন, দামি হেডফোন, দূরদর্শন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, গাড়ি ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা অসুবিধা, বিদ্যুৎ বা পেট্রোল বা ডিজেল খরচ, maintainance cost, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রা যাচাই করেন ক্রেতা। তাই এগুলিই হল Search Goods।

এই শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশিই বিপনন বিশেজ্ঞরা উপযোগিতা, প্রক্রিয়া, সরবরাহ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা (convenience) বিশেষত্ব ইত্যাদি মাত্রার ভিত্তিতে পণ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সুবিধামূলক পণ্য এবং দোকানের পণ্য। তুলনামূলক কম-দামে প্রাপ্ত এবং বেশিরভাগক্ষেত্রে খুচরো বিক্রির দোকানে দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিত্যপ্রাপ্ত পণ্যগুলিকে বলা হয়েছে সুবিধামূলক পণ্য (Convenient Goods)। মুদিখানার পণ্যগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে দৈনন্দিন ব্যবহার হলেও নিয়মিত যেমন পণ্য কেনা হয় না, যেমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা গাড়ি ইত্যাদি, সেগুলিকে বলা হয় দোকানের পণ্য বা Shopping Goods।

পণ্যের ক্ষেত্রে আরও একধরনের বিভাজনের কথা বলা হয়। কিছু পণ্য থাকে, যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার মতো পণ্য-ও রয়েছে। পাশ্চাত্যের পাশাপাশি বর্তমানে প্রাচ্যেও এই use and throw পণ্যের কাটতি বেড়েছে। যেমন, কলম বা পেনের কথা সর্বাগ্রে

মনে পড়ে। রিফিলিং পেন এখন বাজারে সুলভ নয়, এমনটা নয়। কিন্তু use and throw পেনের প্রচলন বেড়েছে। একবার ব্যবহারের পরেই ছুঁড়ে ফেলল এই মানসিকতা আজ বিভিন্ন পণ্যেই গ্রস্ত। কিন্তু তুলনামূলকভাবে দামি পণ্যের ক্ষেত্রে use and throw নীতি ব্যবহৃত না হলেও কিছুদিন ব্যবহারের পর আর্থিক সংগতিসম্পন্ন মানুষ সেই পণ্যটি বিক্রি করে পণ্যটির আরও উন্নত সংস্করণ ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠছো। একটি গাড়ি কিনে তিন বা চার বছর ব্যবহারের পর সেটি বিক্রি করছেন এবং আরও উন্নত বৈশিষ্টসম্পন্ন কোনো গাড়ি কিনছেন। ক্রেতার এই মানসিকতাকেই কাছে লাগাচ্ছে বিজ্ঞাপন। প্রতিনিয়তই নিত্যনতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্যের সম্ভার হাজির করছেন ভোক্তার সামনে। (তথ্যসূত্রঃ 'বিজ্ঞাপন ও বিপনন ঃ ৫ঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য)

পণ্য প্রস্তুতির ঠিক পরবর্তী ধাপে আসে পণ্যটির প্রণামী বা price ঠিক করা। শুনতে সহজ হলেও বিষয়টি কঠিন। অনেকগুলি মাত্রার ওপর সেটি নির্ভর করে। কেন? একটা জুতো তৈরি করতে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেটি পৌঁছতে, কারিগরদের প্রাপ্য মজুরি দিতে, বিজ্ঞাপন তৈরি করতে প্রচুর খরচ হয়। এই খরচ পুষিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি লাভের অঙ্ক বজায় রেখে দাম ঠিক করতে হয়। কিন্তুত এক্ষেত্রেও মাথায় রাখতে হয়, কোনো একটি সাধারণ পণ্যের যদি আকাশছোঁয়া দাম হয়, তাহলে সমাজের এক বৃহত্তম গোষ্ঠী সেই পণ্যটি কিনবে না। ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পণ্যের দাম স্থির করা হয়। কীভাবে? একই-কারিগরের-বানানো একই নানের দু ছোড়া ছুতোর সেটি ফুটপাতের ধারের সাধারণ দোকানে বিক্রি হয়, সেটির দাম হয় স্বাভাবিকভাবেই কম। আর, অন্য ছোড়া জুতো যদি বড় কোনো কোম্পানির ছাপসহ পীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোনো ঝাঁ-চকচকে দোকানে শোভা পায়, তাহলে সেই জুতোছোড়ার দাম হবে অনেক বেশি। দু'জায়গায় দু'ধরনের ক্রেতারা যান। ফলে জায়গা বা স্থানভেদে পণ্যের প্রণামী নির্ধারিত হয়। যাঁরা ফুটপাতের দোকান থেকে পণ্য কিনবেন, তাঁরা অনেক বেশি দামি একই পণ্য আধুনিক বিপনন থেকে কিনতে নারাজ। উল্টোদিকে, আধুনিক-বিপনন থেকে-কেনাকাটিতে অভ্যস্ত ক্রেতা মনে করেন, পণ্যের দাম কম হলে সেই পণ্য 'ভালো' হবে না। তাই তাঁরা একই পণ্য অনেক বেশি টাকা খরচ করে কিনতে কুণ্ঠিত হন না। এখন, পণ্যটি যে-দামি, সেটা তো ক্রেতা পণ্যটি কেনার সময় টাকা খরচ করে বুঝতে পারলো। কিন্তু বর্তমানে এই দেখনদারির যুগে শুধু নিজে জানলেই চলে না। অন্যকেও জানাতে হয়। তাই, পণ্যটির দাম সম্পর্কে যাতে অন্যদের ও একটা আন্দাজ থাকে, সেই কারণেই পণ্যটির ব্র্যাণ্ড বা ট্রেডমার্কটি সেই পণ্যের উপরে জ্বলজ্বল করতে থাকে। ঠিক এই কারণেই ছিন্‌ম নির্মাতারা ছিনম্‌-এর লেবেলকে ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসে, যাতে ক্রেতারা গর্বের সঙ্গে নিজের-কেনা পণ্য সম্পর্কে অন্যকে সচেতন করে তুলতে পারে।

এরপর বিবেচ্য হয় পণ্য কীভাবে পৌঁছানো হবে, অর্থাৎ Place অথবা distribution channel উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রেতা বা ভোক্তাদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া বা সরবরাহকরা বিপননেয় এক অন্যতম অঙ্গ। এখানে মনে রাখতে হবে, উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য কখনোই সরাসরি উপভোক্তার কাছে পৌঁছেয় না। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকে পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা। তাই ক্রেতার পাশাপাশি

পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতাকেও সংশ্লিষ্ট পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে আগ্রহী হলে পাইকারি বা খুচরো বিক্রেতারা একটি পণ্য উৎপাদনের পর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকতে রাজি হন। এই মধ্যস্থতাকারীদেরও নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, পণ্যটি উৎপাদনের পর সেই উৎপাদনস্থল থেকে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় পণ্যটি পৌঁছে দেয় একজন মানুষ। তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন যানবাহনে স্থানীয় দোকানে পণ্যটি সরবরাহ করে আবেকদল লোক। পণ্য সরবরাহের নয়, যে-কোম্পানির পণ্য, সেই কোম্পানীর কর্মীরা সার্ভে করে দেখেন, পণ্যটি ঠিক কীভাবে বিক্রি হচ্ছে, ঠিকঠাক বিক্রি হচ্ছে কিনা, বিক্রি, না হলে কেন হচ্ছে না, একই পণ্যের জন্য অন্য কোনো কোম্পানী বাজারে প্রতিযোগী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে কিনা, উপভোক্তারা সেই-পণ্যটি সম্পর্কে টী বলছেন ইত্যাদি।

একেবারে শেষ ধাপে থাকে প্রচার বা promotion। উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে গ্রাহক যাতে আগ্রহী হন এবং বিজ্ঞাপন যাতে সেই আগ্রহকে উত্তুঙ্গী করে ভোক্তাকে পণ্যটি কিনতে বাধ্য করেন, সেজন্য বিভিন্ন কোম্পানী নিয়ত সজাগ। তবে promotion বা কোনো পণ্য promote করার অর্থ শুধুই বিজ্ঞাপন নয়। বিজ্ঞাপন অবশ্যই তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। কিন্তু তার পাশাপাশি ডিলার বা রিটেইলারদের জন্য নানা স্কিম, ইভেন্ট, আগর ইত্যাদিও প্রোমোশমের অঙ্গীভূত। ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য লিখছেন, 'কোনো একটি কেনায় ক্রেতাকে প্রলোভিত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে আছে নানা রকম পুরস্কার, ছাড়া পারিতোষিক ইত্যাদি দেওয়ার কর্মসূচি। খুচরো কেনাকাটার ক্ষেত্রে 'লর্ড' দেওয়ার যে রেওয়াজ ছিল প্রায় তারই অনুকরণে বর্তমানে পণ্য বিক্রয় বুদ্ধির জন্য 'দুটি কিনলে একটি ফ্রি জাতীয় ঘোষণা করার কৌশলটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এইসব কর্মসূচির কথা ক্রেতাদের কাছ পৌঁছে দেওয়ার কাজেও বিজ্ঞাপনই বড় ভরসা। এবং বিজ্ঞাপনই সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের জানিয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি কেনায় ব্যাপারে প্রলোভিত করে। এইসব ঘোষণা তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতাদের পণ্য কেনার জন্য প্রলোভিত বা প্রযোজিত করে। 'বুধবার সবচেয়ে সস্তা'—বিগ বাহারের এই বিজ্ঞাপন যে ওইদিন সেখানকার বিক্রিকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয় তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।'

৩.৪ বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ড বা ভাবমূর্তির গুরুত্ব

ব্র্যাণ্ড কাকে বলব? সোজাকথায় একে বলা যেতে পারে, বিশেষ একধরনের ছাপ যা সেটিকে অন্যান্যদের তুলনায় অনন্য করে তোলে। বর্তমানে আমরা যেমন পণ্য দৈনন্দিন ব্যবহারে অভ্যস্ত তার অধিকাংশই এই বিশেষ ছাপযুক্ত বা ব্র্যাণ্ডের—যেমন, শ্যামসংয়ের মোবইল, সোনি টিভি, টাটা গাড়ি, রেমণ্ড জামাকাপড়, বাটার জুতো ইত্যাদি। এই কোম্পানির নামগুলো এবং সেই নামের-সঙ্গে-জড়িয়ে-থাকা কোম্পানির নিজস্ব ভাবমূর্তিই হল ব্র্যাণ্ড।

'ব্র্যাণ্ড' শব্দটা এল কোথা থেকে? 'ব্র্যাণ্ড কথাটা এসেছে ছাপ্পা মারায় এক নির্মম প্রথা থেকে। আমেরিকার গো-খানারের মাইলের পর মাইল চারণভূমিতে অনেক আলাদা আলাদা খামারের গরা এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। ফলে মালিকদের পক্ষে অনেক সময় তাদের নিজেদের গরু আলাদা করে চিনে

নেওয়া মুশকিল হত। তাই একেক খামারের একেকটা চিহ্ন লোহা দিয়ে তৈরি করে, সেই লোহা আগুন তাতিয়ে লাল টকটকে করে গরুদের চামড়া পুড়িয়ে দাগিয়ে দেওয়া হত। এই লোহার ইস্ত্রি ধরনের জিনিসটাকে বলা হত 'ব্র্যাণ্ডং আয়রন'। আর এই কাজটাকে বলা হত 'ব্র্যাণ্ড' করে দেওয়া। এই থেকেই 'ব্র্যাণ্ডং' কথাটা এসেছে। তাই বাংলায় এক কথায় অনুবাদ করতে হলে ব্র্যাণ্ডকে বলতে হয় ছাপ। ...ব্রাণ্ড বোঝাতে আবার অনেক সময় 'মার্ট' কথাটাও ব্যবহার করা হয়। চলিত বাংলায় আমরা গল 'মার্টা'। এইভাবে গণেশ মার্কা' তেল....বলে থাকি।' (তথ্যসূত্র! 'বিষয় বিজ্ঞাপন' রংগন চক্রবর্তী)

এখন, ব্র্যাণ্ডের দরকার পড়ল কেন? এর প্রেক্ষাপটে আসলে আছে বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য, যা কিনা বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবার একটি নির্দিষ্ট ও পৃথক পরিচিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ব্যবস্থারকারী যাতে বিজ্ঞাপিত পণ্য বা পরিষেবাটিকে বাজারচলতি অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় আলাদাভাবে চিনে নিতে পারেন। এইভাবেই বিজ্ঞাপন তৈরি করে কোনো একটি পণ্যের Unique Sales Proposition বা USP। কী এই USP?

অনন্য (Unique) ঃ পণ্যটি বা পণ্যটির বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অনন্য বা Unique হতে হবে। প্রতিযোগী কোনো পণ্য যাতে সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার না হতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়।

বিক্রি (Sales) ঃ পণ্যটির প্রস্তাব এমন হতে হবে যাতে পণ্যটি কিনতে গ্রাহক বা উপভোক্তা আগ্রহী হন।

প্রস্তাব (Proposition) ঃ প্রতিটি বিজ্ঞাপনই ব্যবহারকারীর কাছে একটি বিশেষ প্রস্তাবের রূপ গ্রহণ করে। বিজ্ঞাপন সেক্ষেত্রে কতকগুলি শব্দের সমাহারমাত্র নয়। বিজ্ঞাপন তখন গ্রাহকের মনে এই বিশ্বাস জন্মতে শুরু করে যে, 'পণ্যটি কিনলে আপনি এই এই বিশেষ সুবিধা পাবেন।'

কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এই অনন্য বিক্রির প্রস্তাব বা USP উদ্ভাবন বা নির্ধারণ সহজ নয়। সেক্ষেত্রে প্রথমেই বিবেচ্য, ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যটির অনন্য বাস্তব পার্থক্য কী হতে পারে। প্রয়োজনীয়, সুলভ সুবিধাজনক এবং আকর্ষক—এই মাত্রাগুলিকেই অনন্য বলে পাবগণিত করা হয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখককে এই বিশেষদিকটি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। ব্যবহারকারী তবেই বুঝতে পারে, পণ্যটি ব্যবহার করলে সে কী বা কোন্ কোন্ সুবিধা লাভ করতে পারে। একটি টুথপেস্ট যেমন দাবি করে, সেই টুথপেস্টটি লবঙ্গ তেলযুক্ত। এখন, যে-ব্যবহারকারী এই টুথপেস্ট কিনে ব্যবহার করেন, তিনি লবঙ্গ তেলযুক্ত বলে টুথপেস্টটি ব্যবহার করেন না। লবঙ্গ তেল দাঁতের সুরক্ষার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী ও মাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক—এইকারণেই বা এই সুবিধা পাবেন বলেই লবঙ্গতেলযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করেন।

এই ব্র্যাণ্ডের তত্ত্ব প্রবক্তা ডেভিড ওগিলতি (David Ogiliv) বলেছেন ''আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনার বিশেষ নামযুক্ত পণ্যটির জন্য কীরকম ভাবমূর্তি সৃষ্টি করবেন।'' ভাবমূর্তি অনেকটা ব্যক্তিত্বের

সমার্থক। যেকোনো মানুষের মতো পণ্যেরও একটি 'ব্যক্তিত্ব' আছে। পণ্যের এই ব্যক্তিত্ব নানা মাত্রার সমাহরা—পণ্যটির নাম, মোড়ক, মূল্য, বিজ্ঞাপনের বিশেষ ধারা (style), পণ্যটির প্রকৃতি ইত্যাদি। তাই প্রতিটি বিজ্ঞাপনকেই এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে তা নাম-ভাবমূর্তির সহায়ক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনটি বছরের পর বছর সমাঞ্জস্য বজায় রেখে একই ভাবমূর্তি প্রকাশ করবে। এই নীতি, বলাই বাহুল্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সবসময়ই বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করার নানা প্রস্তাব আসে। কখনো নতুন বিজ্ঞাপন সংস্থা, কখনো নতুন মার্কেটিং ডিরেক্টর এই বদলের প্রস্তাব আনেন।

ব্র্যাণ্ড বা ভাবমূর্তি কীভাবে গ্রাহককে প্রভাবিত করে? ডেভিড অগিলভি যেমন মার্লবরো সিগারেটের উদাহরণ দিয়েছেন। ভারতে উইলম ফিল্টার সিগারেটের সাফল্য ছিল 'Mad for Each Other.-এর জন্য। ব্র্যাণ্ডের ক্ষেত্রে তাই গ্রাহকের মনে পণ্যটির অস্থানকে জাগরুক করে রাখা বিজ্ঞাপনের কাজ। কী এই অবস্থান? প্রতিযোগী পণ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ব্যবহারকারীর মনে যে-স্থান অধিকার করে, সেটাই পণ্যের অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন, 'মারুতি ৮০০ গাড়ি' শুনলেই মন বলে ছোট পরিবারের জন্য হালকা গাড়ি, পেট্রল খরচ কম'। পাশাপাশি 'মারুতি এস্টিম' শুনলেই মানুষ ভাবে 'বড় ও বিলাসবহুল গাড়ি' ইত্যাদি। অর্থাৎ একই কোম্পানির দুটি গাড়ি মানুষের মনে দুই ভিন্ন অবস্থানে আছে। তার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য, অন্যটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা উচ্চারিত পরিবারের জন্য।

সাধারণত যেসব পণ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি, সেইসব পণ্যের ক্ষেত্রে পণের উপর ভিত্তিকরেই পণ্যটির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। আবার যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা ফ্যাশন বা ব্র্যাণ্ডকে গুরুত্ব দেন, সেই ক্ষেত্রে ব্যবহারকরীরা দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারিত হয় পণ্যের অবস্থান। কয়েকটি চিহ্নিত পণ্যের ভাবমূর্তি (ব্র্যাণ্ডিং) এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টির বোধগম্যতায় সুবিধা হবে।

ধরা যাক, সিরিল সমানের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাবানটির একটি পরিকল্পিত ভাবমূর্তি এবং অবস্থান ক্রমাগত ভোক্তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীদের মনে একটি ঝরঝরে তাজা অনুভূতি সৃষ্টি করে বোঝানো হয়, লিরিল সাবান সারাদিন ঝরঝরে তাজা রাখে। আবার পণ্ডম পাদ্রডারের বিজ্ঞাপনে একটি স্নিগ্ধ অনুভূতির যুগ্ম আবেদন সৃষ্টি করা হয়। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত তরুনাটি বিভিন্ন পরিবেশে স্নিগ্ধঅনুভূতি আবেগ ও উচ্ছলতা প্রকাশের মাধ্যমে গ্রাহকের মনে একটি ভাবমূর্তি তৈরি করে যাতে ভোদ্বগর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে পণ্ডম পাউডারের স্নিগ্ধ অনুভূতি সারাদিন মানুষকে ফুরফুরে রাখে। হরলিক্স বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা-তা শক্তিশালী করে তোলে। কমপ্ল্যান জানায়, সেটা খেলে বাচ্চারা উচ্চতায় বাড়বে। বছরের পর বছর ধরে উপভোক্তার মনে এভাবেই বিভিন্ন পণ্য তাদের নিজস্ব কেটি নির্দিষ্ট ভাবমূর্তি স্থাপন করে এবং তা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট থাকে।

পণ্যের এই ভাবমূর্তি বা ব্র্যাণ্ডের এই উত্থান-পতন নির্ভর করে ব্র্যাণ্ডের বিজ্ঞাপনের ওপর। তাই বলা হয়, পৃথিবীর বড় কোম্পানীগুলি বর্তমানে আর পণ্যের বিজ্ঞাপন করে না—করে ভাবমূর্তির বিজ্ঞাপন। একটি পণ্য একটি শ্রেণীমাত্র—যাবান, টুথপেস্ট, গাড়ি কিংবা মোবাইল। একটি শ্রেণীতে সব পণ্যই সমান—নাম ছাড়া তাদের পৃথক কোনো চরিত্র নেই। কিন্তু একই কোম্পানী বেশ কয়েকটি সাবান প্রস্তুত ও বিপনন

করতে পারে। যেমন, লিবিল-লাক্স-লাইফবয়—তিনটি সাবানই একই কোম্পানীর তৈরি। কিন্তু এই তিনটি সাবানের পৃথক তিনটি বিজ্ঞাপন তিনটি ভিন্ন চারিত্রিক ভাবমূর্তি গঠন করেছে। লিরিল বারবারে তাজা রাখে, লাস্ক সাবান হল চিত্রতারকাদের সৌন্দর্যকর্ষক সাবান এবং লাইফবয় মানুষকে জীবানু থেকে রক্ষা করে। ব্র্যাণ্ডের ভাবমূর্তি মানুষকে পণ্য চিনতে ও নির্বাচনে সাহায্য করে। পণ্যটির সঙ্গে জড়িত পণ্যটির নাম, কার্যকারিতা, প্রণামী, মোড়কের রং, আস্বাদ, গন্ধ, আকার সহ বিজ্ঞাপনের সংমিশ্রণ—সবটি মিশিয়ে তৈরি হয় ব্র্যাণ্ডের ভাবমূর্তি যা গ্রাহকের মনে স্থায়ী আকার লাভ করে তাকে পণ্যটি সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলে ও ক্ষেত্রবিশেষে পণ্যটিকিনতে বাধ্য করে।

ভাবমূর্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মান্য করা হয়ে থাকে—

১. একাগ্রচিত্ত ঃ

বিজ্ঞাপিত পণ্যটির অনেকগুলি কার্যকারীতা থাকতে পারে। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী গুণটিকেই বিজ্ঞাপনের নজরটান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাকি চুর্ণগুলি সেখানে অনুল্লিখিত থাক। ফলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহক একটি বিশেষ ভাবমূর্তি স্মরণে রেখে ব্র্যাণ্ডটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

২. ঐক্য ঃ

পণ্যটির নাম-মোড়ক-দাম-বিজ্ঞাপন সবকিছু যেন এক ঘুরে বাঁধা হয়।

৩. নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঃ

ভাবমূর্তির লক্ষ্য নির্দিষ্ট ও যুক্তিযুক্ত হওয়া দরকার। গ্রাহক সাধারণত তাঁর বহু দিনের অভ্যাস বা আকাঙ্খা পরিবর্তন করতে নারাজ। তাই কোনো গ্রাহক যদি স্নানের সাবান থেকে ঝরঝরে তাজা থাকার অনুভূতি পেতে চান, তাহলে পণ্যস্চিল 'ঝরঝরে তাজা থাকার' ভাবমূর্তিই বজায় রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে গ্রাহককে এটা বোঝানো যাবে না যে, ঝরঝরে থাকার চেয়ে সৌন্দর্যধর্ষক বা জীবানুনাশক সাবান ব্যবহারই শ্রেয়।

৪. সংক্ষিপ্ততা ঃ

ভাবমূর্তি গঠনের কৌশল সংক্ষিপ্ত ও একমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. ক্রেতা নির্বাচন ঃ

কোন্ কোন্ গ্রাহক পণ্যটি কিনবেন, সেই তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। পণ্যটি কোনো নতুন ক্রেতা ব্যবহার করবেন, নাকি ক্রেতারা প্রতিযোগী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট—এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ব্র্যাণ্ডের সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৬. প্রাসঙ্গিক প্রতিশ্রুতি ঃ

পণ্যটির প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়। পণ্যের বিভিন্ন গুণের সংক্ষিপ্ত সমাহার হল বিজ্ঞাপনের গঠনে প্রতিশ্রুতি আশ্বাসবানী। এই প্রতিশ্রুতিই বিজ্ঞাপনের প্রাণ ভোমরা। প্রতিশ্রুতি হতে পারে বস্তু গত, কল্পিত বা ভাবাবেগনির্ভর।

৭. গুরুত্ব ঃ

পণ্যটির গুরুত্ব যেমন এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। সকল পণ্যের ব্যবহারের সঙ্গে গ্রাহকের অহংবোধ জড়িয়ে থাকে। ধরা যাক, বাড়িতে কোন্ চালের ভাত রান্না হবে, সেইবিষয়ে গ্রাহকের অহংবোধ কম। কারণ, কোন্ চালের ভাত রান্না হচ্ছে, তা তাঁর আত্মীয়স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশী দেখতে আসছেন না, জানছেন না। কিন্তু তিনি কোন্ গাড়ি চড়ছেন, কোন্ জামাকাপড় পরছেন, কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করছেন—এসবই জামান দিচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ড। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের অহং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮. পরিবর্তনশীলতা ঃ

গ্রাহকের মনোভাব, আকাঙ্খা ও বাজারের চরিত্র ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল। তাই বিপনকারী ও বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞকে সেই পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। ব্র্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই বিজ্ঞাপনে পণ্যের পরিচিতিতে রদবদল ঘটানো হয়ে থাকে।

৩.৫ পোজিশানিং এবং রিপোজিশানিং

বিজ্ঞাপন তৈরির ক্ষেত্রে, আমরা আগেই দেখেছি, নানা বিষয় নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন কোনো পণ্য ক্রয় করার জন্য গ্রাহককে প্রলুব্ধ করে, উদ্‌যোজিত করে আর সেই প্রক্রিয়া তখনই সফল হয় যখন গ্রাহক বাস্তবে সেই পণ্যটি কেনেন। কাজেই বিজ্ঞাপন তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হয়, কীভাবে তার বিষয়লিপিকে আকর্ষক করে তোলা যায়। এই-যে কোনো একটি পণ্যকে গ্রাহক বা উপভোক্তার সঙ্গে গেঁথে দেওয়া বা বিশেষ অবস্থানে প্রোথিত করা, সেটিই হল পোজিশানিং। কোনো পণ্যের ব্র্যাণ্ডের ক্ষেত্রে পোজিশানিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি গ্রাহকের কথা ভেবেই-পোজিশানিংকে কাজে লাগাব। পাশাপাশি উপভোক্তার মনেও এক-একটি পণ্য সম্পর্কে এক-একরকম পোজিশানিং কাজ করে। কাজ করে বলেই গৃহস্থালির বাজারে কেউ গণেশ মার্কা সর্ষের তেল ব্যবহার করেন, কেউ ইঞ্জিন, কেউ ফরচুন ইত্যাদি। বিগননের যে চারটি 'প' (পণ্য, প্রণামী, পৌঁছনো, প্রচার) আছে, সেই চারটি 'প' পেদজিশনিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

অর্থাৎ মার্কেট পোজিশানিং বলতে কী বোঝায়? প্রতিযোগীদের সাপেক্ষে একটি ব্র্যাণ্ড বা পণ্য সম্পর্কে উপভোক্তাদের ধারণাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। বাজারে অবস্থান বা পোজিশানিংয়ের উদ্দেশ্যই হল একটি ব্র্যাণ্ড বা পণ্যের ইমেজ অর্থাৎ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা যাতে গ্রাহক বা উপভোক্তা সেটিকে নির্দিষ্ট উপায়ে হস্তগত ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, একটি হাতব্যাগ প্রস্তুতকারক সংস্থা মানুষের মনে একটি বিলাসবহুল status symbol হিসেবে অবস্থান করতে পারেন। আবার একটি টিভি নির্মাতা তার টিভিকে সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও অত্যাধুনিক হিসেবে মানুষের মনে অবস্থান করতে পরেন। আবার কোনো একটি ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁ চেন (chain) সবচেয়ে দ্রুত ও সস্থা খাবার সরবারহকারীরূপে পোজিশানিং-এ থাকতে পারো।

ব্র্যাণ্ড পোজিশানিং এ বিবৃতি (statement) নির্মাণের সময় তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য—

- টার্গেট মার্কেট বা গ্রাহক কে?
- নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবাটি কী?
- সেই পণ্য বা পরিষেবাটির সবচেয়ে বড় সুবিধা ও প্রভাব কী?
- সেই সুবিধা এবং প্রভাবের প্রমাণ কী?

মার্কেট পোজিশানিংয়ের নানা কৌশল আছে যেমন—

১. পূর্ববর্তী অবস্থান ঃ

এই কৌশল অনুসারে, কোনো একটি ব্র্যাণ্ড কোনো নতুন সুবিধা, বৈশিষ্ট্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রথম বলে দাবি করে। স্বাভাবিকভাবেই-সেই পণ্য বা কোম্পানিটি গ্রাহকের মনে কৌতূহল জাগায়। তাই পূববর্তী অবস্থানের তুলনায় পণ্যটির নতুন অবস্থার পোজিশানিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, ১৯৯৮ সালে জাপানি ইলেকট্রনিক জায়ান্ট Seiko চালু করে Seiko Ruputer—যেটিকে প্রথম ঘড়ির কম্পিউটার হিসেবে দাবি করা হয়েছিল। ফলে একঅর্থে সেটিই ছিল বিশ্বের প্রথম smart watch কোম্পানি সেই ঘড়িটিকে 'পরিধানযোগ্য পিসি' বা 'wearable PC' হিসেবে প্রচার করেছিল।

২. সর্বোত্তম অবস্থান ঃ

এই কৌশলে কোম্পানি তার পণ্যকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। তারা তাদের পণ্যের গুণাবলী এমন তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করে, খাতে গ্রাহকের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, সেই ব্র্যাণ্ডটিই সেরা। যেমন জীবাণুনাশক একটি তরল, অন্যান্য জীবাণুনাশক তরলের তুলনায় ৯৯.৯৯ শতাংশ বেশি কার্যকর।

ফলে মার্কেট পোজিশানিংয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার সম্পর্কে অবগত থাকা, প্রতিযোগী সংস্থা বা পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা, গ্রাহকের মানসিকতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পোজিশানিং এর নানা প্রকারভেদ আছে। যেমন—

১. গুণমানভিত্তিক অবস্থান ঃ

পণ্যটি যখন তার নিজস্ব গুণগত কারণেই ভোদ্দার মনে তার অবস্থান নির্মাণে সক্ষম হয়। যেমন, বোরোলীন।

২. সুবিধাভিত্তিক অবস্থান ঃ

পণ্য যখন কোনো নির্দিষ্ট একটি সুবিধা উপভোক্তাকে দেয়। যেমন, সেল্লিস্টিক ব্যবহার করলে সহজে সেল্লি তোলা যায়।

৩. দানাভিত্তিক অবস্থান ঃ

উপবিত্তদের কাছে পণ্য যখন তার উদামের কারণে অবস্থান করে, তখন সেটি দাম ভিত্তিক পোজিশাপিং তখন গ্রাহক ধরে নেন, দামি পণ্য মানেই গুণগতমানে ভালো। যেমন রেমণ্ডের পোশাক মানেই উৎকর্ষে সেরা। আবার, নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের কাছে কোনো একটি পণ্যের সস্তা দাম-ই তার পোজিশানিংয়ের সহায়তা করে থাকে।

৪. সাতভিতিক পোজিশানিং ঃ

অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে, এই সাতসর্বস্ব যুগে, পণ্যটি চিত্ত তাড়াতাড়ি গ্রাহকের হস্তগত হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে সেই পণ্যের পেজিংশানিং। যে-পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগে সেই পণ্যের তুলনায় আধ-ঘণ্টায়-পৌঁছলো সেই একই পণ্যের গতিভিত্তিক পেনজিশানিং বেশি।

৫. জীবননাশকমূলক পোজিশানিং ঃ

মানুষ তার জীবনযাত্রা বা লাইফস্টাইল অনুসারে পণ্যের অবস্থান নির্ণয় করে। এ ক্ষেত্রে তার আর্থিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই উচ্চাত্তিদের কাছে বি.এম.ডব্লুড গাড়ির পোজিশানিং একরকম; নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনে হিরো সাইকেলের পোজিশানিং আরেকরকম।

৬. ব্যবহারের উপন্যাসভিত্তিক পোজিশানিং ঃ

ব্যবহার বা বিশেষ মুহূর্তের ভিত্তিতে কোনো পণ্যের পোজিশানিং হতে পারে। যেমন, অমুকের জন্মদিনে অমুক কোম্পানির বার্থডে কার্ড না হলে চলবে না, তমুক কোম্পানির বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কেক-টিই সেক্ষেত্রে অনিবার্য। আবার কেউ কেউ 'ভালোবাসার দিন' উদযাপনে গোলাপ বা বিশেষদ কোম্পানির ঘড়িকে, কখনও কোনো বিশেষ কোম্পানি-নির্মিত অলংকারকে সঙ্গী করেন।

৭. ব্যক্তিত্বভিত্তিক পোজিশানিং ঃ

অনেকসময়ই দেখা যায় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব (celebrity) কোনো বিশেষ পণ্যের প্রচার করছেন, হয়ে উঠছেন ব্র্যাণ্ডত অ্যাম্বাবাতার। মানুষ ভাবে, অমুকে যখন তমুক পণ্য প্রচার করছেন। তখন সেই পণ্যটি নিশ্চয়ই বাজারবলতি অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সেরা। ফলে পণ্যটি তখন তার নিজস্ব গুণাবলী ছেড়ে সেই ব্যক্তিত্বের সমর্থক হয়ে ওঠে। এটিই হল ব্যক্তিত্বভিত্তিক পোজিশাপিং।

এইভাবে, পোজিশানিং ভোক্তার মলে একটি ব্র্যাণ্ড, পরিষেবা বা পণ্যের জন্য একটি অনন্য পরিচয় তৈরি করে। সেটিই গ্রাহকের মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। সেকারণেই দেখা যায়, কোনো বাড়িতে বিশেষ কোম্পানীর বিশেষ পণ্যই ব্যবহৃত হয়। আবার কোনো একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য একটি বিশেষ কোম্পানির প্রতিই ভরসা রাখেন।

রিপোজিশানিং কী? 'রিপোজিশানিং' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পুনঃস্থাপন বা পুনঃঅবস্থান। বলাই বাহুল্য 'পুনঃ অবস্থান' তখনই সম্ভব, যখন একটি 'অবস্থান' আগে থেকেই চিহ্নিত। অর্থাৎ পোজিশানিং

ব্যতীত রিপোজিশানিং সম্ভব নয়। কী এই রিপোজিশানিং? যখন কোনো একটি কোম্পানি তার মার্কেটপ্লেথে নিজস্বস্থিতি পরিবর্তন করে—পূর্ববর্তী অবস্থান পাল্টায়। কেন পাল্টায়? কারণ, আগের অবস্থানে থেকে হয় যে গ্রাহক হারিয়েছে, তার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নানা কারণে এই রিপোজিশানিং-এর প্রয়োজন ঘটে। যেমন—

১. মূল্য ঃ কোনো পণ্যের উর্ধ্বাঙি মুখী মূল্য পণ্যটির রিপোজিশনিং ঘটাতে বাধ্য করে। অতিরিক্ত মূল্যের কারণে গ্রাহক যখন সেই পণ্যটি আর কিনতে চান না, তখন তার দাম কিঞ্চিৎ কমিয়ে রিপোজিশানিং করে গ্রাহককে আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। তাই বহুক্ষেত্রে কোম্পানি রিপোজিশানিং করে এইভাবে—'অমুক ব্যাকের, দাম এখন কমে গেছে—আপনার হাতের মুঠোয়'।

২. স্থান ঃ পণ্যটি যেস্থানে বিক্রি হচ্ছিল, দেখা গেল, সেখানকার গ্রাহক আর পণ্যটির প্রতি উৎসাহী নন। তখন স্থান বদল করে, কখনও ব্যবসায়িক ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য অন্য স্থানে সেই পণ্যটির প্রাপ্তিসুবিধাকে প্রবর্ধিত করা হয়। তাই দেখা যায়, কোনো বস্ত্র কোম্পানি রিপেসজিশানিংয়ের সময় ঘোষণা করে, 'এখন এখানে ও পাশে আমাদের'।

৩. পণ্য ঃ পণ্যটি নিজেই রিপোজিশানিংয়ের দাবিদার হতে পারে। যেমন, বেতার রেডিও এখন প্রায় কেউই আলাদা ভাবে শোনেন না। তাই-আগে পরা রেডিও বিক্রি করতেন, তাঁদের বাধ্য হয়ে অন্য পণ্যে রিপোজিশানিং করতে হয়েছে।

৪. প্রকার ঃ অনেকক্ষেত্রে পণ্যটি ঠিক থাকলেও প্রচারের ধরনে বদল ঘটাতে হয়। সেটাই হল প্রচারভিত্তিক পোজিশানিং। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, এটি একটি নগণ্য কৌশল কিন্তু এই নগণ্য কৌশলকে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারলেই গ্রাহককে সেই পণ্যের প্রতি আকর্ষণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অনেকসময় নাটকীয়ভাবে পণ্যটির উপস্থাপন করা হয়। যেমন, মানুষের মানসিকতা বদলের কারণেই দেখা যায়, কোনো গায়ক যখন শুধু গান গেয়ে সেই গান সমাজমাধ্যমে পোষ্ট করছেন, তার 'reach' তুলনামূলক অনেক কম। অথচ সেই একই গায়ক কেই গান যখন music video হিসেবে আপলোড করছেন, সেখানে গানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নানা নানাভিরাম দৃশ্যাবলী ও পরিবর্তিত পোশাক; তখন সেই 'music video-র reach পৌঁছচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে মিলিয়নের কাছাকাছি।

রিপোজিশানিংয়ের ক্ষেত্রে উপভোক্তার বা গ্রাহককে মানসিকতা বোঝা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন তাঁরা অমুক পণ্যর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছেন। তাঁরা সেই পণ্য বা পরিষেবা থেকে আর কোন্ কোন্ সুবিধা প্রত্যাশা করেন ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন হয় রিপোজিশানিংয়ে। বর্তমান যুগে মানুষের মানসিকতাই হল, কীভাবে একই পণ্যে একাধিক সুবিধা অর্দুম করা যায়। তাই সমাবিধ সুবিধা না বৈশিষ্ট্য সমষ্টিত পণ্য যা মানুষের আর্থিক সংগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যেগুলিই রিপেজিশানিং-এর মূল ভিত্তিক। ফলে আর্যসামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ভোদ্ধার প্রবণতার পরিবর্তন ইত্যাদি রিপেজিশানিংকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনেকক্ষেত্রে রিপোজিশানিং ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, উপভোক্তার চাহিদা তলে যখন কোনো একটি পণ্যকে খরচ করে রিপোজিশানিং-এর আওতায় আনা হল, তখন দেশ গেল, বিশেষদ কোনো একটি আর্য-সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে গ্রাহকের মানসিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই রিপোজিশানিং অর্থহীন। সেক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করেও ওই রিপোজিশানিং এর প্রচার বন্ধ করতে হবে। ফলে বিবর্তিত বাজার ও ভোক্তার মানসিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রিপোজিশানিং করা বাঞ্ছনীয়।

রিপোজিশানিং কখনো রিব্যাণ্ডিং-এ পরিবর্তিত হতে পারে। ব্র্যাণ্ড যখন তার নাম, আইকিন, রং, ফন্ট টাইপ, ট্যাগলাইন ইত্যাদি সম্পূর্ণটিই পরিবর্তন করে, তখন সেটি হয় রিব্যাণ্ড্রিং। সেটিও এক অর্থে রিপোজিশানিং। কারণ, ব্র্যাণ্ডটি সেক্ষেত্রে তার পুরোনো অবস্থানে আর সফল হতে পারছিল না।

৩.৬ বিজ্ঞাপন কীভাবে তৈরি হয়?

বিজ্ঞাপন কীভাবে তৈরি করা হয়, তার কোনো সার্বজনীন নিয়ম নেই। বিজ্ঞাপনের প্রস্তুতকরণ নির্ণয় হয় পণ্য বা প্রোডাক্টের ধরন ও চাহিদার ভিত্তিতে। তবে, যেকোনো ধরনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যে-উপাদানটি অনস্বীকার্য, সেটি হল সৃজনশীলতা বা creativity—সেই সৃজনশীলতা হতে পারে বিষয়লিপি রচনায়, হরফের ব্যবহারে, রঙের বৈচিত্র্যে, চিত্তাকর্ষক ছবির ব্যবহারে।

কীভাবে একটি বিজ্ঞাপন নির্মিত হয়, সেটি নিচে আলোচনা করা হল—

প্রথম ধাপে ফ্ল্যায়েণ্ট অফিস থেকেই বিজ্ঞাপনের যাত্রা শুরু হয়। ধরা যাক, কোনো একটি কোম্পানি তাদের নতুন চলভাষ (mobile phone) বাজারে আনতে চায়। এক্ষেত্রে তারা প্রথমে পণ্য ও প্রণালী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে, তারপর প্রস্তুত হবে প্রচারের জন্য। এই সময় উক্ত-কোম্পানিটি পণ্যটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী বা brief তৈরি করে। সেখানে কী থাকে? তাদের উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট ক্রেতার নির্দেশকরণ, পণ্যটির বিবরণ ও বিশেষত্ব। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, অধিকাংশ পণ্যেরই নির্দিষ্ট কোনো বিশেষত্ব থাকে না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেই বিশষত্ব খুঁত তার পোজিশানিং করতে হয়। এরপর কোম্পানি তাদের চাহিদা-সমন্বিত সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising agency)-র কাছে প্রেরণ করে।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা এরপর কোম্পানির সেই চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন তৈরি করে। তারা প্রথমে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নিজেদের চিন্তাভাবনা বা idea-র একটি উপস্থাপন করে কোম্পানির সামনে। এই চিন্তাভাবনা বা আইডিয়াগুলিকেই-বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা হয় 'ক্রিয়েটিভ'।

তারপর বিজ্ঞাপন এজেন্সির পরিকল্পক (plannner)-রা একটি পরিকল্পনা (plan) করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে ক্লায়েন্ট সার্ভিসিং টিম বা account। বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে এক একজন ক্লায়েন্টকে এক একটা অ্যাকউন্ট বলা হয়। এবার এই পরিকল্পক একটা ক্রিয়েটিভ ব্রিফ (creative brief) তৈরি করে। সেখানে কী থাকে? বিজ্ঞাপনটি কীরকম হতে পারে, তার দিকনির্দেশ থাকে সেখানে। যেমন, 'টুফ পেস্টের

ক্রিয়েটিভ ব্রিফ বলতে পারে নিঃশ্বাস নির্মল হবে বলে মুখ খুব কাছে এন বলা যাবে—এই থেকে তৈরি হতে পারে প্রেমে আত্মবিশ্বাস আর তার থেকে 'ক্লোজ আপ' এর গল্প।'

এরপর ক্রিয়েটিভ বিভাগে সেই বিফ্র যায়। সেখানকার সদস্যরা তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আগে মূলত খবরের কাগজে-প্রকাশিত বিজ্ঞাপনই ছিল বিজ্ঞাপনের ভরকেন্দ্র। ফলে সেখানে থাকতেন ক্রিয়েটিভ কপিরাইটার, আর্ট ডিরেক্টর। তাঁদের কাজ ছিল বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি লেখা এবং তাকে কলা বা art-এর সজ্জায় বিন্যস্ত করা। বর্তমানে দূরদর্শন এবং তার চেয়েও বেশি ডিজিটাল ভিডিওর যুগে, বিষয়লিপি ও তাঁকে দৃশ্যায়িত করে তোলা (visualisation)-র জন্য ভাবার শিল্পী থাকেন।

তারপরবর্তী স্তরে ক্রিয়েটিভ বিভাগ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কয়েকটি চিন্তাভাবনা ধারণ করে, প্ল্যানিং ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে। প্রয়োজন অনুসারে সেই ভাবনাচিন্তার বদল ঘটে এবং অনেগুলি ভাবনার মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচন করে ক্লায়েনটকে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

এরপর সেই ধারণাগুলিকে কেন্দ্র করে Story board করা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের বিষয়লিপি যা বলছে, সেগুলি ছাড়াও পশ্চাৎ পটের আবহ কী হবে, সংগীতের মূর্চ্ছনা কী হবে, ক্যামেরার শুটিংস্টাইল কীধরণের হবে, বিজ্ঞাপনের মডেল কারা হবেন, মডেলরা কী ধরণের পোশাক পরবেন ইত্যাদিই হল সেই Story board-এর অঙ্গ। ডিজিটাল টেকনোলজির যুগে অনেকেই এখন visually literate। তাই ক্লায়েন্টরাও বিভিন্ন ধরনের reference সহজেই বুঝতে পারেন। একান্ত বুঝতে না পারলে ইন্টারনেট থেকে সেগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়।

ক্লায়েন্টের কাছে যে ভাবনাগুলি প্রদর্শিত হয়, সেগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি ক্লায়েন্ট নির্বাচন করেন। এমনও হতে পারে, প্রদর্শিত ভাবনাগুলির মধ্য থেকে কোনো একটিকে নির্বাচন করে বিছন্ন চাহিদা অনুযায়ী সেটিতে সামান্য পরিবর্তনের কথা বললেন ক্লায়েন্ট। তখন এজেন্সি ডাকে প্রোডিউসার বা প্রযোজককে। তিনি ঠিক করে দেন, বিজ্ঞাপনের চারিত্র অনুযায়ী কোন্ পেতে কোন পারদর্শী শিল্পী কাজ করবেন। যেমন, বিজ্ঞাপন আবেগধর্মী হলে অমুক কাজ করবেন, প্রযুক্তিগত দিকটি দেখবেন অমুক শিল্পী ইত্যাদি। এদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে বাজেট ও তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজটি দেওয়া হয়।

পরবর্তী ধাপে এজেন্সি টিম ও প্রোডিউসার টিমের মধ্যে একাধিক মিটিং হয়। এগুলির মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে স্থির হয় PPM বা Pre Production Meting। যেখানে অত্যন্ত বিশদে বিজ্ঞাপনটির নানা দিন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই ছবি হয় বিজ্ঞাপনী ভিডিওটি।

ভিডিও তৈরির পর ক্লায়েন্ট তা অনুমোদন করলে বিজ্ঞাপনটি বাজারে প্রচারের জন্য তৈরি হয়। কীভাবে তৈরি হয়? 'ছবি ছাড়া কিছু যেমন, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং ইত্যাদি কপিরাইটার আর আর্ট ডিরেক্টর মিলে বানিয়ে ফেলে। আজকাল সব কিছু কম্পিউটারে হয়, যদি কোনো বিশেষ কিছু করতে

হয়, তার জন্য ফোটোশপ স্পোশলিস্টরা থাকেন। ফেসবুক, মোবাইল ফোন ইত্যাদির জন্য যে বিজ্ঞাপন করতে হয়, সেগুলো তৈরির টেকনোলজি প্রিন্টের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরির থেকে আলাদা, সেগুলো ডিজিটাল স্টুডিওতে তৈরি হয়।' (তথ্যসূত্র: 'বিষয় বিজ্ঞাপন', রংগম চক্রবর্তী)

৩.৭ বিজ্ঞাপন ও মোড়ক : বিপণন কৌশল

পণ্যবিক্রির ক্ষেত্রে তার মোড়ক (cover) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেকসময়ই মোড়কটিই হয়ে ওঠে পণ্যটির মূল আকর্ষক। সাধারণ একটি পণ্য সাধারণ প্যাকেজিংয়ে বিক্রি করলে তার কাটাও যত বেশি হয়, তার তুলনায় সুন্দর প্যাকেজিংয়ের অন্তর্ভূক্তপণ্য বিক্রি হয় বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অগে জামাক-কাপড় কেনার পর ক্রেতারা সেটি কীভাবে হাতে পেতে? বিক্রেতেরা সেটি একটি খবরের কাগজে মুড়ে দিতেন গ্রাহককে। এখনও কোনো কোনো জায়াগায় এই প্রথার চল আছে। কালক্রমে খবরের কাগজের জায়গা দখল করল প্লাস্টিক। ক্রমবিবর্তনে সেই প্লাস্টিক সুন্দর বোতাম-দেওয়া ঠিক ওই জামার মাপের মোড়কে বিক্রি হতে থাকল। আবার বিত্তশালী কোনো মানুষ যদি রেমণ্ডের মতো কোনো বড়ো দোকান থেকে জামা-প্যান্স্ট কেনেন, সেখানে দেখা যায়, সেই জামা-প্যান্ট সুন্দর একটি মজবুত বাক্সের মধ্যে উপহার প্রদানের যোগ্য করে বিক্রি হচ্ছে। ফলে, প্যাকেজিং বা মোড়ক পণ্যের বিক্রির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য তাঁর 'বিজ্ঞাপন ও বিপর্ণন' গ্রন্থে লিখছেন, 'শিল্পে মোড়ক বা Packaging-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ Daniel Boorstin... মন্তব্য করেছেন যে অতীতে এবিষয়ে অদৌ নজর দেওয়া হত না। তুলনামূলকভাবে অতি আধানিককালই এটি সকলের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে। তিনি বলেছেন—"In the old world, even after the industrial age had aqrived only expensive items were housed in their own box or eleganthy worapped. A watch or jewel world be proesented in a carefully crafted container, but the notin that a pomd of sugar or a dozen crackers shuld be encased and offered for purchase in specially designed attracitve material seemed out landish. Essential to the high standard of living are the new techiques for dothing objects and to make for them appealing advertisements. Industries spend fortmes to improve the sales grab of imexpensive objects of daily consmption—a pack of cigarettes or a cake of soap."

এই মোড়ক ও পণ্য—উভয়েই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীল। মোড়কই একটি কোম্পানির পণ্যকে অন্য কোম্পানির একই পণ্য থেকে পৃথক করে। ফলে কোনো কোম্পানির পণ্যের মোড়কটি আসলে কীরকম, প্রতিযোগিতার বাজারে উপভোক্তা যাতে ঠিক মোড়কটি চিনে সেই কোম্পানির পণ্যটিই কিনতে উৎসাহিত হন—সেটি বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত হয়। অনেকসময় একই পণ্যের যদি দাম কমে যায়, তাহলে সেটিও মোড়কে প্রতিফলিত হয়। ধরা যাক, কোনো পণ্যের দাম ছিল বারো টাকা। বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়, পণ্যটির দাম দু'টাকা কমে হয়েছে দশ টাকা। এবার, সাধারণ উপভোক্তা, যাঁরা এতদিন ওই

পণ্যটি কিনতেন বা কিনতেন না, তাঁরা সহজে কীকরে মোড়ক দেখেই বুঝবেন যে, পণ্যটির দাম কমেছে? এখানেই মোড়ক ও বিজ্ঞাপন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মোড়কটিতে পূর্বের দাম বারো টাকা লিখে সোট কেটে দিয়ে দশ টাকা লেখা হয়—যাতে গ্রাহক দেখামাত্র বুঝতে পারবেন। এই পণ্যটি কিনলে তাঁর সংসারে দু'টাকা সাশ্রয় হবে। এইকারণে বিভিন্ন সংস্থায় মোড়ক বিভাগ (Packaging Department) একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

মোড়ক কীভাবে বিজ্ঞাপন ও বিপণনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে? ধর নন্দলাল ভটাচার্য জানাচ্ছেন, 'বহু সময়ই মোড়ক শুধু সংশ্লিষ্ট পণ্যটির বাক্স বা আটার নয়, সেটি তার প্রচ্ছদপট। সে কারণে সেই মোড়ক তৈরি বা তার নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে শিল্প ভাবনার মিশ্রণ ঘটানো হয়। বস্তুত, অনেক সময় পণ্যর চেয়েও তার মোড়কটি অনেক বেশি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেটি দেখেই প্রয়োজনম না থাকলেও সংশ্লিষ্ট পণ্যটি কেনার বাসনা তীব্রতর হয়। এবং তখনই মোড়ক-ভাবনা তার চরমসিদ্ধি লাভ করে। আর তাই বিজ্ঞাপন সংস্থার জন্য যেমন কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ শিল্পীর একটি বড়ো ভূমিকা থাকে, মোড়কের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই হয়। ...পণ্যকে মোড়কে মোড়ার দায়িত্বটি থাকে উৎপাদক সংস্থার প্যাকেজিং বিভাগের ওপর। কিন্তু যখন এই মোড়ককেই প্রচার অভিযানের অঙ্গ করে তোলা হয়, তখনই দরকার গড়ে বিজ্ঞাপনের। একই সঙ্গে বিপণন বিভাগ চায়, পণ্যটি সবচেয়ে দর্শনীয় এবং আকর্ষন হিসেবে বাজারজাত হোক। এক্ষেত্রে প্রতিযোগী সংস্থার চেয়ে বেশি সুন্দরভাবে পণ্যটি উপস্থাপনার বেশি আগ্রহী থাকে বিপণন বিভাগ।

'যে কোনো উৎপাদক সংস্থার কাছে মোড়ক যত না ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার বস্তু তার চেয় অনেক বেশি গুরুত্ব তার বিপণনের হাতিয়ার হিসেবে। মোড়কেই লেখা থাকে উৎপাদকের নাম-ধান, ট্রেডমার্ক এবং পণ্যটির ব্র্যাণ্ড নেম। সেদিক থেকে মোড়কেই থাকে পণ্যের প্রকৃত পরিচয়পত্র। পণ্যটির দাম, কোন কোন উপাদান দিয়ে পণ্যটি তৈরি তারও উল্লেখ থাকে মোড়কে। ...ব্যবহারকারীদের সুবিধা হয় এমন করে মোড়কের পরিকল্পনা করা উচিত। যেমন, হরলিকস, কমপ্ল্যান জাতীয় স্বাস্থ্য-পানীয় অথবা কোকাকোলা, পেপসি ইত্যাদি পানীয়গুলি, আগে মোটমুটি একটি আয়তন বা মাপেই পাওয়া যেত। পরবর্তী পর্যায়ে এগুলি ফ্যামিলি সাইজ বা একেবারে বড়ো মাপের আধারে পাওয়া যায়। এতে ক্রেতার যেমন অর্থ সাশ্রয় হয়, বিক্রেতারও তেমন একই লপ্তে বেশি মাল বিক্রি হয়ে যায়। এইভাবেই হরলিকস, কমপ্ল্যান, লাইফবয় বা ডেটল হ্যাণ্ডওয়াশও এখন পাত্রবদ্ধ অবস্থার পাশাপাশি রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। খরচ কম পড়ে বলে ক্রেতাদের এগুলি কেনার ব্যাপারে একধরণের আসক্তি জন্মে। এইভাবে পণ্যের মোড়ক বা পাত্রটি যাতে সহজে খোলা যায় এবং কোনোরকম অসুবিধে ছাড়াই তা অন্যপাত্রে ঢালা যায় সেদিকেও নজর দেওয়ায় হয় প্যাকেজিং-এর সময়। ব্যবহার করতে সুবিধে হয় অথবা পাত্রটিকে পরে অন্য কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় সেদিকেও লক্ষ রাখা হয়। মোড়ক ব্যবহারের সময় যেমন ঘরবাড়ির জন্য বিভিন্ন তেল ও জল রং আগে টিনের পাত্রে বিক্রি হত। এখন পরিবর্তে এমন প্লাস্টিকের পাত্রে বিক্রি করা হচ্ছে যাতে পাত্রগুলিকে বালতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সেই সঙ্গে পাত্রে গায়ের বিভিন্ন বিবরণ

প্রতিদিন চোখের সামনে ভাসতে থাকায় পরবর্তকালে প্রয়োজন পড়লে ওই বিশেষ এ্যাণ্ডটিই সাধারণত কেনা হয়। হরলিকস ইত্যাদির প্লাস্টিকের আসার সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এখন বিভিন্ন রেঁস্তেরা বা হলদিরাম, ভিখারাম প্রভৃতি মিঠাই হালুইকররাও অন্য পাত্রের পরিবর্তে ফিরে ব্যবহার করা যায় এমন প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার করায় সেগুলি ক্রেতার কাছে থাকে এবং ক্রেতারা সেগুলি অন্য কানে ব্যবহহার করার সুযোগ যেমন পাচ্ছেন, তেমন সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিজ্ঞাপনের কাজটিও বলে যথারীতি। এসবের পাশাপাশি উৎপাদক সংস্থাগুলি এবার পরিবেশ পূর্ণ রোধ করার জন্য পলিপ্যাক ইত্যাদির পরিবর্তে পরিবেশবান্ধক বস্তু ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে। সোজা কথায়, পণ্যের মোড়ক শিল্পসম্মতভাবে তৈরির পাশাপাশি সেগুলি যাতে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখেও পণ্যের মোড়ক তৈরি হচ্ছে। এমনটি অনেক সময় পুরস্কার বা উপহার সামগ্রী হিসেবে মোড়কগুলি দেওয়া হয়। যেমন ফলে রস খাওয়ার গ্লাসে ক্রিমচিজ ভরে তা বিক্রি করা হচ্ছে। মদের বোতলের ক্ষেত্রেও এমনটিই দেখা যাচ্ছে। এখই সঙ্গে খুচরো বিক্রেতাদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে মোড়কের ক্ষেত্রে নানা রদবদল করা হচ্ছে। সব মোড়কে বিপণনকে অর্থাবহ করে নানাভাবেই।'

৩.৮ বিজ্ঞাপনের রাজনীতি

বিজ্ঞাপনের প্রধান কাজ বিপণনে সাহায্য করা মানুষকে কোনো পণ্য সম্পর্কে এমনভাবে প্রলোভিত করা, যাতে গ্রাহক সেই পণ্যটি কিনতে উৎসাহিত বোধ করেন এবং তাঁদের উৎসাহই উপভোক্তাকে বিপণিতে হাজির করিয়ে শেষপর্যন্ত পণ্যটি কিনতে বাধ্য করেন। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মভাবে মিশে থাকে রাজনীত বা পলিটিক্স। কীভাবে? বিজ্ঞাপন যা দেখায় সিংহভাগ ক্ষেত্রেই পণ্যটি সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষম। তাহলে মানুষ সেই বিজ্ঞাপন দেখেই বা কেন আর পণ্য কেনেই বা কেন। প্রথম কারণ, অসহায়তা। বর্তমানের এই বিপণনের ও বিজ্ঞাপনের যুগে আমাদের চোখ-কান বিজ্ঞাপন এড়িয়ে চলতে পারবে না। দ্বিতীয় কারণ, তাকে কোনো-না-কোনো কোম্পানির পণ্য কিনতেই হবে—'ক', না হলে 'খ', না হলে 'গ', না হলে 'ঘ'। ফলে সেই পণ্যের বিজ্ঞাপনটি না-চাইলেও তার মস্তিষ্কে সক্রিয় হয়ে থাকে। এই সক্রিয় করণের জাদুটিই হল রাজনীতি। কখনও মানুষ অজান্তে, আবার কখনও জেনেবুঝেই সেই রাজনীতির শিকার হয়। কোনো সাবান বিজ্ঞাপন দেয়, সেই পণ্য ব্যবহার করলে বাহাত্তর ঘণ্টা তরতাজা থাকা যাবে। বাস্তবে সেটি অসম্ভব জেনেও একদল মানুষ সেই পণ্য ব্যবহার করেন। এটাই বিজ্ঞাপনের রাজনীতি।

ডঃ চন্দন বাঙ্গালের সূত্রে জানা যাচ্ছে, '২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিখ্যাত ডিওডোবেণ্ট ব্র্যাণ্ড এই কেসর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন ২৬ বছরের যুবক বৈভব বেদী। বিজ্ঞাপনটিতে দেখানো হয়েছিলো (যৎ), কোনো এক পুরুষ গায়ে এই ব্র্যাণ্ডের বডি সেত্র দেওয়ার পর অর্ধনগ্ন নারীরা ছুটে আসছে। কিন্তু বৈভব বেদীয় বেদীর অভিযোগ ছিল গত সাত বছর ধরে তিনি এই ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু তার কোনো বান্ধবী নেই। বর্ণবাদী বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপক সমলোচনার মুখে পড়েছিল প্রসাধনী পণ্যের আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড ডাভ। এই বিজ্ঞাপনের তিনটি দৃশ্য দেখানো হয়, একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণা তার শরীরের

টি-শার্ট খুলে ফেলছেন। তাঁর চামড়ার নিচে একজন সাদা নারীকে দেখানোর জন্য তিনি টি-শার্ট খুলে ফেলেন। দ্বিতীয় দৃশ্য দেখানো হয় টি-শার্ট খুলে ফেলার পর মুহূর্তের মধ্যেই কৃষ্ণাঙ্গ থেকে একজন শ্বেতাঙ্গ এশীয় নারী বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপনের মূল বিষয় ছিল বর্ণের পরিবর্তন—কৃষ্ণাঙ্গ থেকে শ্বেতাঙ্গ। একইতাকে সমালোতি হয়েছিলেন ফেয়ারনেস ক্রীম ফেয়ার এণ্ড লাভলি। পরে অবশ্য এই কোম্পানিটি তার নাম বদলে গ্লো এণ্ড লাঙলি রাখেন।'

আমরা আগের একক গুলিতে দেখেছি, বিজ্ঞাপন শুধুই নেতিবাচকতার যে দেয় না, ইতিবাচকতার গল্পও বলে। মুখী পরিবারের গল্প শোনায়। কিন্তু তার পাশাপাশিই আছে এমন কিছু বিজ্ঞাপন আছে, যার বার্তা নৈতিকতার মামা অতিক্রামী। যেমন, বিশেষ একটি চকোলেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, একদল বয়স্ক ভদ্রমহিলা ওয়েটিং চেয়ারে বসে আছো। পাশে একটি ছেলে ল্যাম্বপোস্টে হেলান দিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চকলেট খাচ্ছে। হঠাৎ করে ভদ্রমহিলায় হাত থেকে লাঠিটি ছিটকে পড়ে যায়। বৃদ্ধটি তখন পাশের ছেলেটিকে বারবার অনুরোধ করেন-লাঠিটি একটু তুলে দেবে বা? ছেলেটি সে কথায় কর্ণপাত না করে একই ভঙ্গিতে চকলেট খাওয়ায় ব্যস্ত। এই বিজ্ঞাপন থেকে আমরা কি (যৎ) শিখবো? বয়স্কদের কম্বাকে পাত্তা না দেওয়া? বয়স্কদের কাছে ঔদ্ধত্য দেখানো?'

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্য জনপ্রিয় কোনো বিনোদন বা ক্রীড়াজগতের তারকাকে কোম্পানির ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, লাক্স সাবান। বিভিন্ন যুগে সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসেবে লাক্স সাবান ব্যবহৃত হওয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। আবার অমিতাভ বয়সের মতো ব্যক্তিত্ব বেমণ্ডো কাপড়ের প্রচারমুখ হয়েছেন। তাঁরা মানুষকে বলেছেন, অমুক ব্র্যাণ্ডের জিনিস তিনি ব্যবহার করেন। তিনি উপকৃত হয়েছেন; অতএব সাধারণ মানুষও যেন সেই ব্র্যাণ্ডেভ পণ্য ব্যবহার করেন। বাস্তবে দেখা যায়, এই সমস্ত ব্যাণ্ড অ্যাম্বাযাওয়রা যে সব পণ্যের হয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাঁরা নিজেদের জীবনে আদৌ সেই পণ্যে ব্যবহার করেন না—অন্য নানা নানাদামী ব্র্যাণ্ডের পণ্য ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত। অর্থাৎ, নিজে যা ব্যবহার করেন না, তা অন্যদের ব্যবহার করতে উৎসাহ দিচ্ছেন তিনি/তাঁরা—এ রাজনীতি ছাড়া আর কী?

অনলাইনে নানা খেলার বিজ্ঞাপনে প্রচারের মুখ হয়েছেন অনেক ব্যক্তিত্ব—কপিল শর্মা থেকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তাঁরা প্রচার করেন, অনলাইনে সেইসব খেলার অংশীভূত হলে তাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। ঠিক তার পরমুহূর্তেই বিজ্ঞাপনী যন্ত্রচার করা হয় যে অনলাইনে এই ধরনের খেলায় লগ্নীকরণ ঝুঁকিসাপেক্ষ মানুষ যেন জেনেবুঝে সেখানে লগ্নী করেন। নৈতিকতায় প্রশ্ন হল এই যে, এইসব ব্যক্তিত্ব যদি বোঝে নই, তাঁদের প্র,, পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহারে সাধারণ মানুষের আর্থিক সর্বনাশ ঘটতে পারে, তাহলে তাঁরা মানুষকে সেই পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহারে উৎসাহ দেন কেন? তাদের প্রচারমুখ দেখেই তো মানুষের মনে ধারণা জন্মায় যে অমুক যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই পণ্যটি খারাপ নয়। এই 'অনৈতিক' কাদের বিনিময়ে এবার সুখ ব্যক্তি কী পান? অর্থ। কাজেই এই বিজ্ঞাপন টী কোথায়? অর্থের জন্য বা অর্থ বিনিময়ে মানুষকে সর্বসান্ত করার শিক্ষা?

বিজ্ঞাপনের এই রাজনীতি বিষয়ে পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু তাঁর 'বিচিন্তা' গ্রন্থের 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'গত এক শ দেড় শ বৎসরের মধ্যে এক নতুন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে—বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোকে মনে করে, যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তুর মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক সুষ্ট মিথ্যা বলে না; আইন বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম রক্ষা করে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অম্ববা যা অপদার্থ তাও লোকে অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক, স্নো মাখলে রং ফরসা হয়, অমুক তেলে ব্রেন ঠাণ্ডা হয়, অমুক সুধায় লাঙ চাঙ্গা হয়, অমুক ফাউন্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের শার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত বিলাতী ব্যবসায়ী ঘোষণা করছেন—Bewareof night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডে পিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়—এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

'বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কি হচ্ছে?' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতেলে মারকউরি আর লেড আছে কিনা দেখছি।' প্রশ্ন 'কেশতেলে ও সব থাকবে কেন?' উত্তর—'এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতেল পারদ সীমক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা করে দেখছি কথাটা সত্য কিনা।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাকদণ্ডগবেষণ, অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

'যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সাথে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে কি সর্বনাশ, তবে তো অন্য তেলে এই সব থাকে! দরকার কি, এই গ্যারাণ্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।'

৩.৯ বিজ্ঞাপন ঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত

আগের এককগুলির দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি, কোনও বিজ্ঞাপনই কোনো পণ্য বিক্রি করতে

পারে না। তাহলে বিজ্ঞাপন কী করে? সেই পণ্যটিকে গ্রাহকের মনে মুদ্রিত করে দেওয়াই-বিজ্ঞাপনের কাজ। এরপর গ্রাহক যদি সেই পণ্যটি কিনতে বিপনিতে যান, তবেই সেই পণ্যের বিজ্ঞাপন সফল। বিজ্ঞাপন আসলে ভোক্তার জীবনে কোনও একটি অভাবকে চিহ্নিত করে। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্যই অমুক পণ্য বা তমুক পরিষেবাগ্রহণের কথা শোনায় বিজ্ঞাপন। তাই-অধিকাংশক্ষেত্রেই পণ্য বা পরিষেবাকে আমরা বিশেষ কোনও মূল্যবোধ বা emotion- এ চিহ্নিত করে থাকি। কীভাবে কোনো একটি বিজ্ঞাপন সাফল্যের শিখরে স্থিত হয়, তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এই উপ এককে আমরা কয়েকটি বিজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখে নিই। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। শ্রী অরিন্দম নন্দীর 'কিছু বিজ্ঞাপন কিছু আপন' গ্রন্থের 'চোখ খুলে যায় বিজ্ঞাপনে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য—

গৃহনির্মাণ সংস্থার বিজ্ঞাপন ঃ

একটি গৃহনির্মাণ সংস্থার বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনে লেখা হয়েছিল, সুস্থ সমাজের কথা ভেবে কীভাবে জমে-থাকা অতিরিক্ত জল ফেলে দেওয়া উচিত। এই বিজ্ঞাপন দেখার পর মানুষের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সংস্থাটি যখন এই ভাবে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করছে, তখন তারা নিশ্চয়ই গ্রাহককে নিয়ে অত্যন্ত সচেতন।

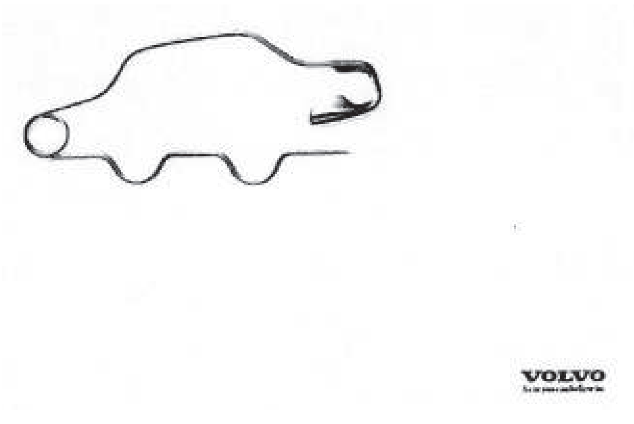

গাড়ির বিজ্ঞাপন ঃ

ভোলভো গাড়ির বিজ্ঞাপনটি নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের পরিবর্তে গ্রাহকের সুরক্ষাপ্রদানের প্রতিশ্রুতিকে বিজ্ঞাপিত করেছিল।

মোবাইল পরিষেবার বিজ্ঞাপন ঃ

একটি মোবাইল পরিষেবা তাদের বিজ্ঞাপনে গ্রাহক ও সেই মোবাইল পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য ও বিশ্বস্ত সম্পর্কটি উপমিত করেছিল একটি বাচ্চাকে তার পোষা কুকুরের অনুসরণের মাধ্যমে।

অডিও বকুম-এর বিজ্ঞাপন ঃ

পেঙ্গুইনের অডিও বুকথ-এর বিজ্ঞাপনটিতে হেডফোনের দুই প্রান্তে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে শেক্সপীয়রের মুখমণ্ডল ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধূমপানবিরোধী বিজ্ঞাপন ঃ

ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ধূমপানের ফলে গর্ভবতী মহিলাদের নিজেদের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি গর্ভস্থ শিশুটির ও ক্ষতি হয়, সেজন্য ভারমোণ্ট এজেন্সি অফ হিউম্যান সার্ভিসেসের অন্তর্গত ভারমোণ্ট ডিপার্টমেণ্ট অফ হেলথের বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ—

চিনিহীন লজেন্সের বিজ্ঞাপন ঃ

লজেন্সে চিনি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা বা শর্করা-সচেতন মানুষরা চিনিহীন লজেন্স অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে চুপা চুপস তাদের বিজ্ঞাপনে দেখায় যে, তাদের লজেন্স এমনই চিনিহীন যে, পিঁপড়েরাও সেটিকে এড়িয়ে চলে।

হেডফোনের বিজ্ঞাপন ঃ

বিলাসবহুল হেডফোন বোস তাদের বিজ্ঞাপনে দেখিয়েছিল, কীভাবে তাদের হেডফোন ব্যবহার করলে অতল সমুদ্রে নৌকায় বিবরণকারী এক মানুষ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন হয়ে মুহূর্তেই খাদে তলিয়ে যাওয়ার মতো দুঃসাহস প্রদশন করতে পারেন।

WWF-এর বিজ্ঞাপন ঃ

WWF World Wild-Life Fund-এর একটি বিজ্ঞাপনে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুটি চিত্রের তুলনা প্রদর্শিত হয়েছিল। একটিতে ছিল অসীম সমুদ্রের মাঝে একটি হাঙর—লেখা ছিল 'Horryfying' অর্থাৎ বিপজনক। ডানদিকের ছবিটিতে ছিল হাঙরবিহীন শুধুই এক আদিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র। লেখা ছিল 'More Horryfying' অর্থাৎ সেটি অধিকতর বিপজনক। কেন? আমরা যেভাবে নির্বিচারে পরিবেশের প্রতি অত্যাচার করছি, বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করছি, তাতে ভবিষ্যতে জলের প্রাণী হাঙর বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, হাঙর এখানে রূপকমাত্র। বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে আসলে মানুষকে পরিবেশসচেতন করে তোলার প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়।

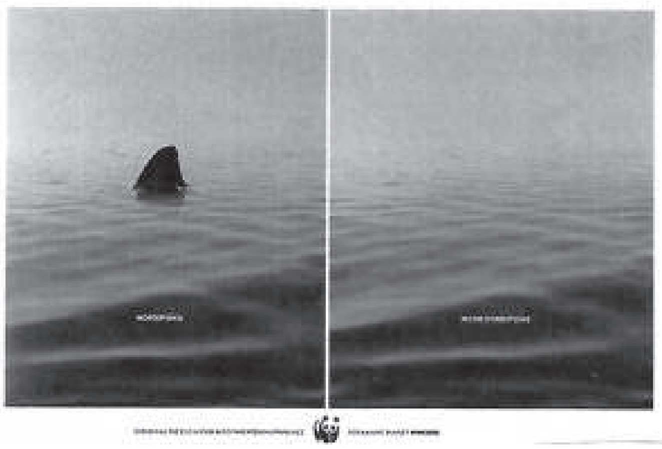

শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে এখানে আরও কয়েকটি বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হল—

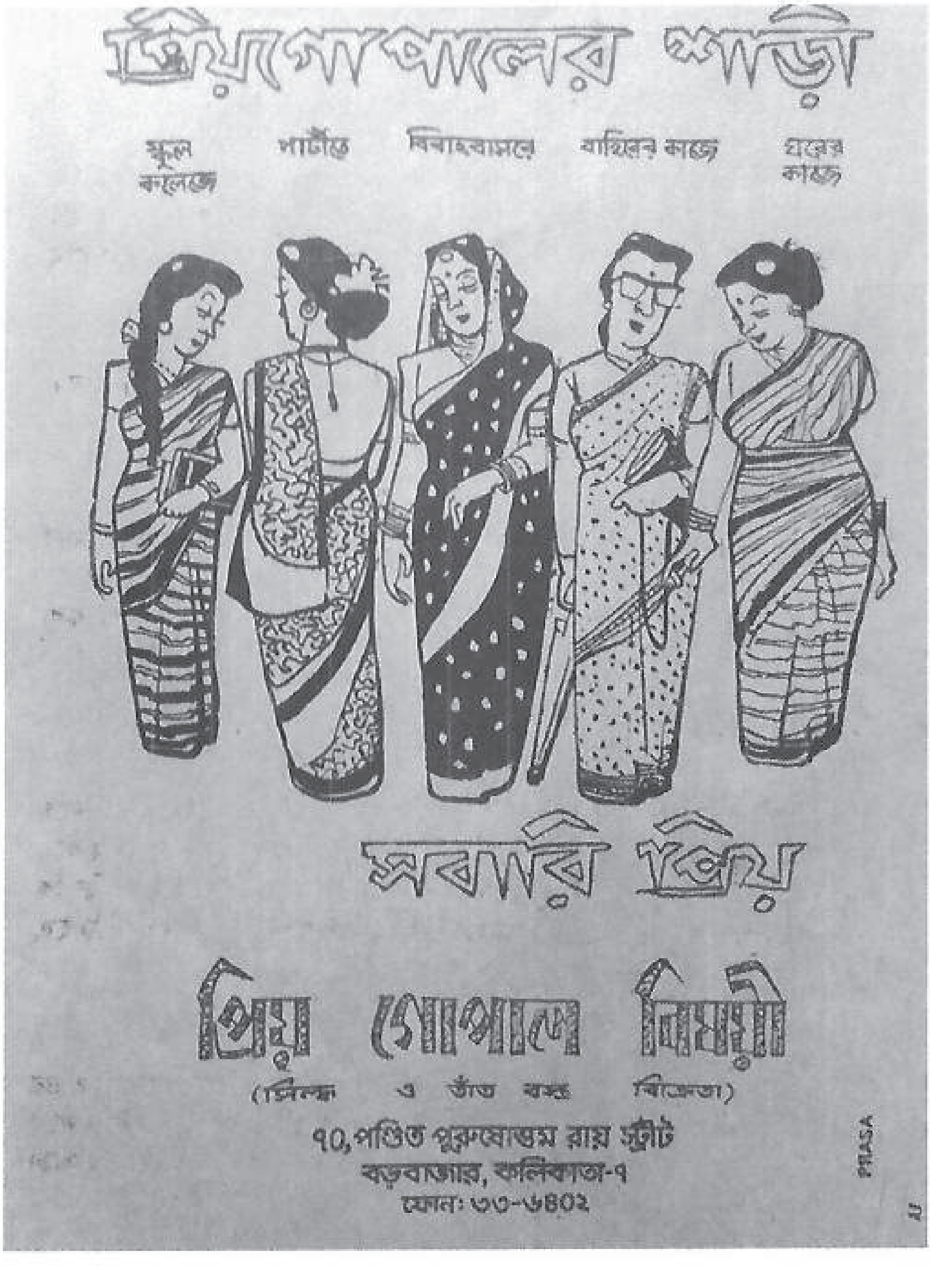

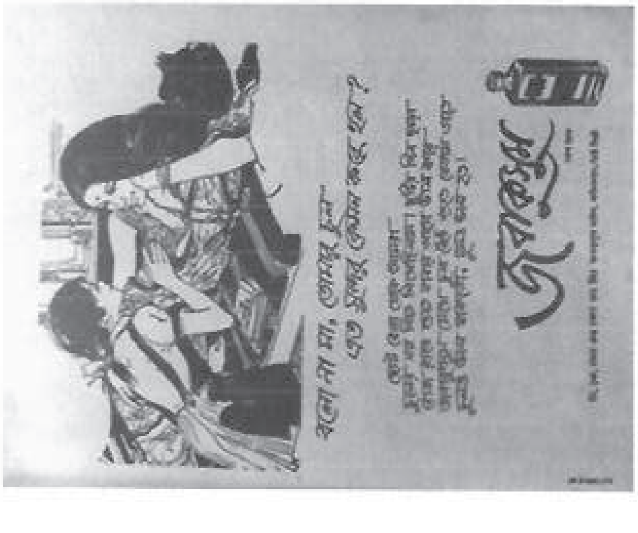

Kwality

কপালে চুল ছাঁটা
জামার হাতা কাটা।
পুকুর পায়ে ঝাঁটা
জুতোর রাজা বাটা।
Bata

যাঁরা পাশ করেছেন
আর যাঁরা করেননি
তাঁদের সবাইকে সন্তুষ্ট করবে—
গাঙ্গুরামের ৪টী শ্রেষ্ঠ অবদান
দই
রাবড়ি
সন্দেশ
চমচম
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
৮৪-এ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
১৩০-বি, রসা রোড, কলিকাতা

অনুগ্রহ করে উপহার আনবেন না...
তবে স্টেট ব্যাঙ্ক গিফট চেকের কথা আলাদা
কারণ এই চেক যে কোনও অনুষ্ঠানের জন্যই চমৎকার কাজে আসে। এইগুলো আপনি ১১ টাকা, ২৫ টাকা, ৫১ টাকা ও ১০১ টাকার নির্দিষ্ট মূল্যে পাবেন ···গিফ্‌ট চেক ইস্যু বা নগদ করার জন্য আপনার এক পয়সাও বাড়তি খরচা লাগবে না। তাছাড়া, এইগুলো আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করার সুবিধেও পাচ্ছেন।
স্টেট ব্যাঙ্ক
ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক

আউট!
জীবন যুদ্ধের সর্বক্ষেত্রে সৌভাগ্যকে সুনিশ্চিত করুন।
আমাদের গ্রহরত্ন জিওলোজি-ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিসের পরীক্ষায় অখাঁটি প্রমাণিত হইলে দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।
ভাল জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রহরত্ন ধারণ করুন
এম পি জুয়েলার্স এণ্ড কোঃ
১ বিবেকানন্দ রোড, কলি ৭ ফোন ৩৩-১৭৭১/৩৩-৫৭৬৫
শাখা : গড়িয়াহাট জংশন জি-১০, গড়িয়াহাট মার্কেট (দ্বিতল) কলি ১৯, ফোন ৪৬-৮১৩৯

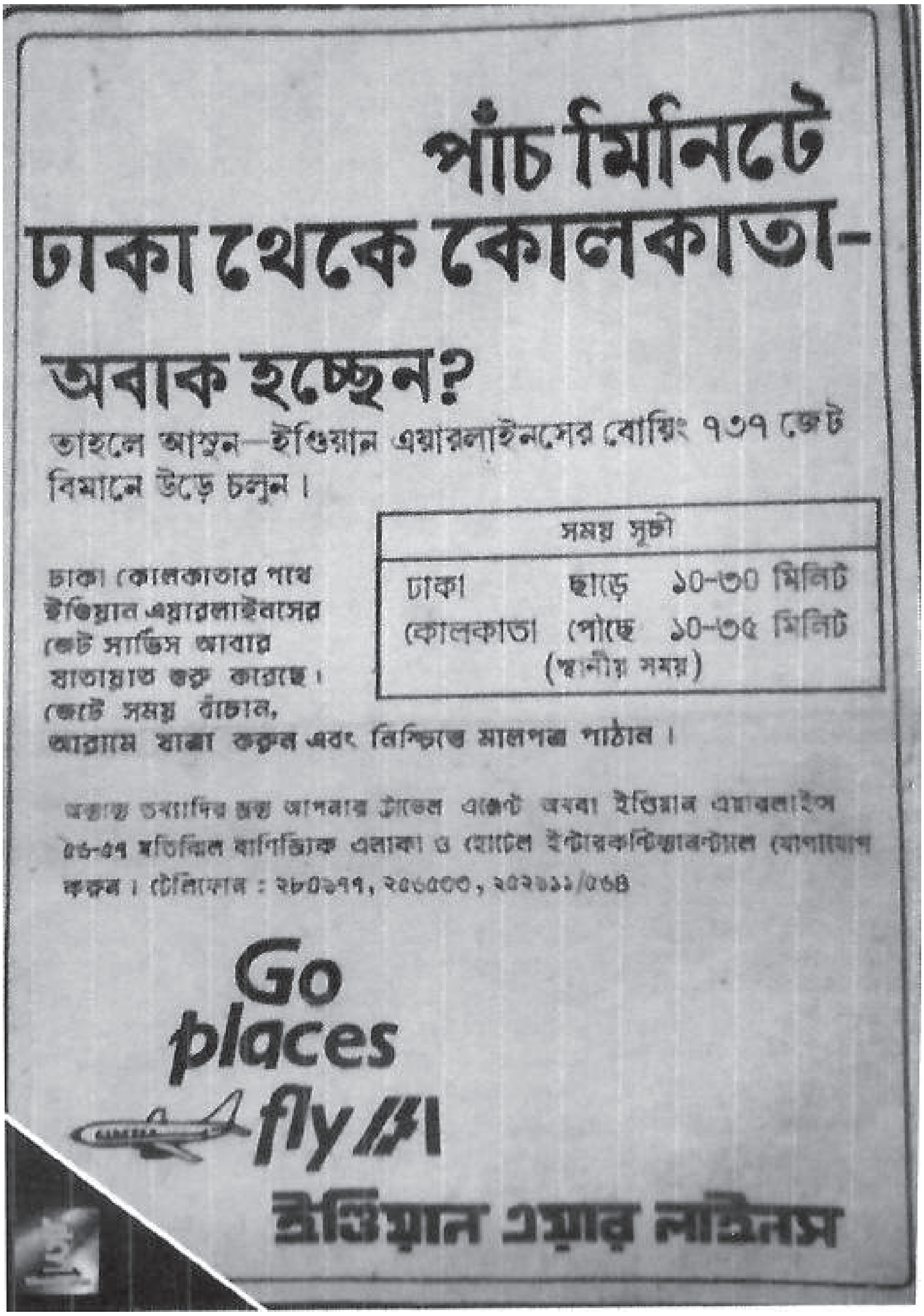
পাঁচ মিনিটে
ঢাকা থেকে কোলকাতা-
অবাক হচ্ছেন?
তাহলে আসুন—ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বোয়িং ৭৩৭ জেট বিমানে উড়ে চলুন।
সময় সূচী
ঢাকা ছাড়ে ১০-৩০ মিনিট
কোলকাতা পৌছে ১০-৩৫ মিনিট
(স্থানীয় সময়)
ঢাকা কোলকাতার পথে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের জেট সার্ভিস আবার যাতায়াত শুরু করেছে।
জেটে সময় বাঁচান,
আরামে যাত্রা করুন এবং নিশ্চিন্তে মালপত্র পাঠান।
অন্যান্য তথ্যাদির জন্য আপনার ট্রাভেল এজেন্ট অথবা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ৩৬-৫৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যোগাযোগ করুন। টেলিফোন : ২৮০৯৭৭, ২৩৬৫৩৩, ২৫২৯১১/৩৬৪
Go
places
fly
ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস

১৩৭১] কথাসাহিত্য [ভাদ্র
সবার আগে সুলেখা
দেশে-বিদেশে সমাদৃত
সুলেখা
ফাউন্টেন পেনের
কালি
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

আমরা ব্যর্থ হয়েছি...
আপনাদের চন্দ্রাভিযানের খাদ্য
তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে ॥
তবে, এ গৌরব অর্জনে আমাদের খুব দেরী নেই
—বোধ হয় ॥
নাবিস্কো বিস্কুট পরিপূর্ণতার প্রতীক
নাবিস্কো বিস্কুট এ্যাণ্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী
ঢাকা—পূর্ব পাকিস্তান

৩.১০ সারাংশ

বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য বিপনন। বিপননের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী পরিভাষায় চারটি 'প' বা 4Ps অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল পণ্য, প্রণামী পৌঁছনো এবং প্রচার। ভোগ্যপণ্য ও শিল্পপণ্যের বাজার পৃথক। বিজ্ঞাপনে ব্র্যাণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিশেষ ছাপ শোনো একটি পণ্যকে অনন্য করে তোলে এবং সেক্ষেত্রে সেই পণ্যের জন্য তৈরি হয় এসব বিজ্ঞাপন যা সেই পণ্যের USP বা Unique Sales Proposition হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাপনে ভাবমূর্তির সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী মান্য করা হয়। কোনো একটি পণ্য যখন বিজ্ঞাপনের সূত্রে-গ্রাহকের মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে থাকে, তখন তাকে বলে পোজিশানিং। আর, বিজ্ঞাপন যখন পুরোনো হয়ে যায়, সেটি যখন গ্রাহকের মস্তিষ্ক আর ধারণ করতে যায় না, তখন নতুনভাবে পণ্যটির জন্য পোজিশানিং করতে হয়—সেটিই হল রিপোজিশানিং। বিজ্ঞাপন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সংস্থার একাধিক দল একত্রে কাজ করেন। বিজ্ঞাপনী প্রচারের ক্ষেত্রে পণ্যের মোড়ক হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি বিজ্ঞাপন লক্ষ করলেই বোঝা যায়, আমরা কোনো ন-না-কোনো মুহূর্তে বিজ্ঞাপনী রাজনীতির শিকার।

৩.১১ অনুশীলনী

(ক) বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বিপননের মূল উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. আপনার দেখা সাম্প্রতিক কোনো বিজ্ঞাপন ব্যাখ্যা করে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি প্রদর্শন করুন।

৩. বিজ্ঞাপন কীভাবে ইতিবাচক ও জনপ্রিয় ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সক্ষম উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৪. টি উদাহরণ বুঝিয়ে দিন, কীভাবে সেখানে পোজিশানিং ও রিপোজিশানিং প্রযোজ্য হয়েছে।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. প্রচারভিত্তিক পোজিশানিং বলতে কী বোঝেন?

২. যেকোনো একটি পণ্যের আকর্ষক মোড়কের বর্ণনা দিন।

৩. পণ্যের প্রকারভেদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) অতি সংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. একটি অভিজ্ঞামূলক পণ্যের উদাহরণ দিন।

২. USP-র সম্পূর্ণ নামগঠনটি লিখুন।

৩. বিজ্ঞাপন সংস্থায় মোড়ক বিভাগের কাজ কী?

৩.১২ সহায়ক আকরপঞ্জি

১. ‘বিষয় বিজ্ঞাপন’, রংগন চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং ফেব্রুয়ারী ২০২২।

২. ‘বিজ্ঞাপন ও বিপনন’, ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, লিপিকা, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০২৩); প্রথম প্রকাশ-২০১৫ দ্বিতীয় প্রকাশ

৩. ‘বিজ্ঞাপন ব্র্যাণ্ড বা ভাবমূর্তির গুরুত্ব’, পি.জি.ডি.দে.এম.সি ষষ্ঠ পত্র (খ)-এর পাঠ উপকরণ, (জয় সরকার) নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪।

৪. ‘বিজ্ঞাপন নিয়ে’, ডঃ বাঙ্গাল, অক্ষরবৃত্ত, ডিসেম্বর ২০২১।

৫. ‘বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি’ ‘বিবিন্তা’, রাজশেখর বসু

৬. ‘কিছু বিজ্ঞাপন কিছু আপন ঃ বিজ্ঞাপন বিষয়ক ও অন্যান্য লেখা,’ অরিন্দম নন্দী, রাবণ, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০২৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২৪।

মডিউল ২ : সাংবাদিকতার ভাষা

একক -৪ ❑ সংবাদের খুঁটিনাটি

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ খবরের ধারণা ও সংজ্ঞা

৪.৪ সংবাদ মূল্য

৪.৫ সংবাদে আদর্শ, নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা

৪.৬ সংবাদের উপাদান

৪.৭ খবরের প্রকারভেদ

৪.৮ সংবাদ উৎস বা সূত্র

৪.৯ সংবাদ লেখার কৌশল

৪.১০ সম্পাদনা

৪.১১ শিরোনাম

৪.১২ পৃষ্ঠাসজ্জা

৪.১৩ সারাংশ

৪.১৪ অনুশীলনী

৪.১৫ সহায়ক গ্রন্থ

৪.০ উদ্দেশ্য

সুস্থভাবে বাঁচার জন্য মানব সমাজের যে সব সামগ্রী অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে খবর বা নিউজ তার অন্যতম। খবর থেকে আমরা নানা তথ্য, পরিসংখ্যান জানতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ, সরল করে তোলার জন্য যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খবর বা তথ্য ছাড়া জীবন অচল---এই বক্তব্যের সমর্থনে একটা পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক। ধরা যাক, পৃথিবীর সব মানুষের বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা গেছে, কেউ অনাহারে নেই, সকলের পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথবা এমন কোনও দেশ, যেখানে কোনও মানুষকেই কায়িক শ্রম করার প্রয়োজন হয় না, উপেন্দ্রকিশোরের ভূতের

রাজার বরের সুবাদে যত্রতত্র বেড়ানো, ভালমন্দ খাওয়া, সবই নিমেষে সম্ভব। কিন্তু দেশবাসী ইন্টারনেট, মোবাইল দূরে থাক, ফোন, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন কী জিনিস জানে না। তাহলে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রাটি ঠিক কেমন হতে পারে?

সহজ করে বললে বলতে হয়, বাজারের সেরা মাংস, দোকানের সবচেয়ে সুস্বাদু মশলা দিতে তৈরি পদ নুন, কিংবা মিষ্টি ছাড়া পায়েস রান্না করে পরিবেশন করলে অতিথির যে অনুভূতি হয় তেমন, খবরবিহীন জীবনও ঠিক তাই। অর্থাৎ লবন ছাড়া মাংস, মিষ্টি ছাড়া পায়েসের মতো বিস্বাদময়।

খবর ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ শুধু নয়, তার বিনিময় ছাড়া সভ্যতা আজ এই জায়গায় পৌঁছত না। বলা চলে খবরের ধারণা অর্থাৎ তথ্যের বিনিময় না হলে সভ্যতার যাবতীয় সাফল্য, অগ্রগতি হয়তো পৃথিবীর এক প্রান্তে আটকে থাকত। আমরা জানতেও পারতাম না পৃথিবীর কোথায় বিদ্যুৎ, কোন দেশে রেলের ইঞ্জিন, কোন মুলুকে রেডিও, কোন অঞ্চলে বিমান, কোন প্রান্তে টেলিফোন আবিষ্কার হয়েছে। উন্নত দুনিয়া থেকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি বিনিময় বা হস্তান্তরের গোড়ায় আছে খবর তথা তথ্যের আদানপ্রদান।

৪.২ প্রস্তাবনা

এই একক থেকে খবর বা সংবাদ সম্পর্কে বিশদ ধারণা পাওয়া যাবে। কীভাবে খবরের মূল্য, উপাদান নির্ধারণ করা হয়, খবর কত ধরনের, কোন জাতীয় খবরের কী বৈশিষ্ট্য, খবরের উৎস এই সব বিষয়ে জানা সম্ভব হবে।

৪.৩ খবরের ধারণা ও সংজ্ঞা

'খাবারের খবর'-এই শব্দযুগল ইদানীং বাংলা সংবাদমাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। এই শিরোনাম বা বিভাগে খাবারদাবার সংক্রান্ত খবরাখবর পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আজকাল বাইরে অর্থাৎ হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। সংবাদমাধ্যম তাই পাঠক-দর্শক-শ্রোতার চাহিদা মেনে খাবারদাবার সংক্রান্ত খবরাখবর পরিবেশনে জোর দিয়েছে।

আমরা যদি উচ্চারণ ও বানানে কাছাকাছি এই দুই শব্দ 'খবর' ও 'খাবার'-কে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, আমাদের জীবনে এই দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে আসা যাক খাবারের প্রসঙ্গে। আমরা খাবার কেন খাই? একথায়, গাড়ি, মেশিন চালানোর জন্য যেমন জ্বালানি তেল অর্থাৎ পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি লাগে তেমনই মানব দেহের জ্বালানির প্রয়োজন হয়, যাকে বলা হয় ক্যালরি, যা শক্তির একক। মানুষ-সহ সমগ্র জীব-জগতের বেঁচে থাকার জন্য ক্যালরি প্রয়োজন হয়।

ক্যালরির জৈবিক চাহিদাটি মানুষ বা অন্যান্য জীব অনুভব করে খিদের মাধ্যমে। পাকস্থলী জানান দেয়, কখন খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কারণ, খাবারের মাধ্যমেই শরীরে ক্যালরি প্রবেশ করে। বেঁচে থাকার জন্য খাবার অর্থাৎ ক্যালরির কোনও বিকল্প নেই।

মানুষের, এমনকী পশুপাখিরও আর এক ধরনের খাবারের প্রয়োজন হয়, যা মস্তিষ্কের ক্যালরি বলা চলে। পশু-পাখিরা যে নিজেদের মধ্যে খবরের আদানপ্রদান করে তা বোঝা যায় তারা খাবারের সন্ধান বা বিপদের আঁচ পেলে। মানুষও অনবরত খবর পেতে এবং তা বিনিময়ে আগ্রহী। আমাদের মস্তিষ্কের খিদে পাকস্থলির চাইতে বেশি। ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা অবিরত নানা খবর পেতে যাই। সারাক্ষণ আমাদের মন-মস্তিষ্ক খবর পেতে আগ্রহী।

এখন আসা যাক, খবর বা সংবাদ বলতে আমরা কী বুঝব। খবর বা সংবাদের ধারণাটি আরও স্পষ্ট করার জন্য আমাদের সর্বদা 'উদ্দেশ্য' বিভাগে উল্লেখিত কথাগুলিকে স্মরণে রাখতে হবে। খবরের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা গেলে এর ধারণা ও সংজ্ঞা সহজেই নিরুপণ করা সম্ভব। ওই বিভাগে উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট করেই বলা যায়, খবরের ধারণাটি অতি প্রাকৃতিক বা জৈবিক অর্থাৎ জীব থেকে উৎপন্ন, যাকে আমরা ইংরিজিতে Organic বলে থাকি। অর্থাৎ সভ্যতার সরণিতে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছিল নিজেদের মধ্যে খবরের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে। সংবাদ বিনিময়ের আদিম সেই মাধ্যমটি ছিল শব্দ। ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ নানা ধরনের প্রতীকি শব্দ দিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদান করত। এমনকী পশুপাখিকে আকৃষ্ট করার জন্যও মানুষ শব্দ ব্যবহার করে, যার চল এখনও আছে। গ্রামাঞ্চলে কিছু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে মানুষ হাঁস-মুরগি-কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগলকে খেতে ডাকে, ঘরে ফেরায়।

তারমানে, 'খবর'-এর ধারণার উৎপত্তি সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যম আবিষ্কারের বহু আগের অধ্যায়। খবরকে বহুজনের কাছে পৌঁছে দিতে মানুষ নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কার করেছে। দু'জন পরিচিত মানুষের রাস্তায় দেখা হলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে তার প্রতিটি বাক্যই বলা চলে খবর বা সংবাদ। যেমন, একজন আর একজনের উদ্দেশ্যে জানতে চাইলেন, 'কোথায় চললেন।' জবাবে অপরজন বললেন, 'একটু বাজারে যাচ্ছি। তখন অপরজন বললেন, সে কী! বাজার তো খোলা নেই। জানেন না আজ বনধ।'

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পরিচিত দুই ব্যক্তি পার্কে বসে কথা বলছেন। একজন আর একজনকে বললেন, 'কেমন আছেন?' অপরজন জবাব দিলেন, 'ভাল আছি।' সেই সঙ্গে প্রশ্নকর্তাকে বললেন, 'আপনি কেমন আছেন? বাড়ির সব খবরাখবর ভাল?' তিনি জবাবে বললেন, 'না, ভালো নেই। বাড়িতে রোগব্যাধি লেগেই আছে। তার উপর আমার কারখানাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে, ছেলেটা বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েটার বয়স হচ্ছে, বিয়ে দিতে পারলাম না এখনও। কী যে হবে ঈশ্বরই জানে।'

সাধারণত এই ধরনের আলাপচারিতাকে আমরা বলি সুখ-দুঃখের গল্প করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এরমধ্যেও অনেকগুলি জরুরি কথা লুকিয়ে আছে যা ওই দুই ব্যক্তি বাদে আরও অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ খবর মনে হতে পারে। আজকের দিনে কেউ যদি ভদ্রলোকের দুঃখকষ্টের কথা পরিচিতদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করেন তাহলে মুহূর্তে সেটি অনেকের জন্য সংবাদ হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে যে সংবাদমাধ্যমটি ব্যবহৃত হল, সেটিকে বলে সামাজিক মাধ্যম, যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ আগে থেকে যুক্ত সংযুক্ত আছেন।

এখন এই বন্ধ কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীর কথার সূত্র ধরে কোনও সাংবাদিক যদি প্রতিষ্ঠানটিতে কত মানুষ কাজ করতেন, কেন সেটি বন্ধ হয়ে গেল, মালিকপক্ষ কী বলছে, কী বলছেন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিকদের সংসার কীভাবে চলছে, এলাকার অর্থনীতিতে এর কী প্রভাব পড়েছে, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে খবরের কাগজ, রেডিও কিংবা টেলিভিশনের জন্য খবর লেখেন তখন গোটা বিষয়টি গণজ্ঞাপনে উত্তীর্ণ হল। অর্থাৎ প্রচলিত সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। তার মানে ব্যক্তি বিশেষের সমস্যার মধ্যে খবরের সার্বিক চিত্রের সূত্র ধরা থাকে। তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে কৌতূহল, আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আজকাল ট্রেন বা বিমান সময়ে, নির্ধারিত সময়ের আগে কিংবা বিলম্বে ছাড়ার তথ্য যাত্রীদের মোবাইলে মেসেজ করে জানানো হয়। দেখা যায়, সেই একই বিষয়ে টিভি, কিংবা রেডিও অথবা ডিজিটাল কোনও সংবাদ পোর্টালেও প্রচার করা হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে আমরা দুটি শব্দ ব্যবহার করি। ব্যক্তি বিশেষের মোবাইলে আসা বার্তাকে আমরা সাধারণত তথ্য বা ইনফরমেশন বলে থাকি। সেই তথ্যই যখন রেডিও, টিভির মতো মাস মিডিয়ায় প্রচারিত হয় তখন আমরা বলি খবর। আবার আমরা একথাও বলে থাকি, কই রেল তো আমায় খবর দেয়নি যে ট্রেন বাতিল হয়েছে।

খবরের ক্ষেত্রে তথ্য এবং পরিসংখ্যান শব্দ দুটি ঘুরে ফিরে আসে। বলা চলে এগুলি হল, খবরের কাঁচামাল। অনেকগুলি তথ্য এবং পরিসংখ্যান একটা খবরের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে। কখনও একটি তথ্যও একটা সংবাদ হতে পারে। আজকাল টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মাধ্যমে আমরা প্রায়ই 'ব্রেকিং নিউজ' কথাটি শুনে থাকি। কখনও শুধু কোনও বিশিষ্টজনের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হল। যেমন 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত', 'চলে গেলেন সৌমিত্র', 'না ফেরার দেশে ফেলুদা' ইত্যাদি। টিভির পর্দা জুড়ে বারে বারে ওই একটি লাইনই দেখানো হল এবং সঞ্চালক বা সঞ্চালিকাও পর্দায় ভেসে ওঠা বাক্যই পাঠ করলেন। এখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় আমরা যেহেতু জানি এবং তাঁর অসুস্থতাও পাঠক-দর্শক-শ্রোতার অজানা নয়, তাই ওই একটি লাইন শোনার পর আমরা মস্তিষ্কের স্মৃতি আধারে অভিনেতাকে নিয়ে গচ্ছিত তথ্য/সংবাদগুলি পর পর জুড়ে নিই। যেমন, আমরা ব্রেকিং নিউজ পেয়েছিলাম, ওড়িশার বালেশ্বরে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে, বহু হতাহত। এরপর নতুন নতুন তথ্য যুক্ত হয়ে খবর এগতে থাকে। আমরা যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, ব্রেকিং নিউজের মধ্যেই একাধিক তথ্য/খবর থাকে। প্রধান খবরটি হল রেল দুর্ঘটনা। দ্বিতীয় হল, হতাহত বহু। তৃতীয়, ট্রেনটির নাম করমণ্ডল এক্সপ্রেস। চতুর্থ, সেটি ছিল চেন্নাইগামী। পঞ্চম বিষয়, দুর্ঘটনাস্থল ওডিশার বালেশ্বর। ষষ্ঠ. দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছেড়ে গিয়েছিল। এই তথ্যগুলি থেকে পাঠক নিজের মতো করে খবরের একটি মালা গাঁথতে পারেন। যেমন, হাওড়া থেকে ছেড়ে গিয়েছে মানে ট্রেনটিতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সংখ্যায় বেশি থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, চেন্নাইগামী হওয়ায় ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর মানুষের থাকার সম্ভাবনাও বেশি। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা যেহেতু দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে গিয়ে থাকেন, তাই গ্রাম-মফস্বলের বাসিন্দাদেরও থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

তৃতীয় বিষয় হল; চিকিৎসা। চেন্নাই, ভেলোর-সহ দক্ষিণ ভারতের বহু শহরে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারতের মানুষ চিকিৎসা করাতে যান। আমরা যদি করমণ্ডলের দুর্ঘটনার বিস্তারিত খবরে ঢুকি তাহলে দেখব, পাঠক-দর্শক-শ্রোতার অনুমান কতটা সত্য। অনুমান করতে পারা একজন সাংবাদিকের অত্যন্ত জরুরি একটি গুণ।

আমরা যদি এই পর্যন্ত আলোচনাকে আর একবার পাঠ করি, তাহলে দেখব, সব মানুষই একজন সংবাদদাতা বা সাংবাদিক। অর্থাৎ প্রত্যেকেই খবর সংগ্রাহক, বাহক এবং বিনিময়কারী। সাংবাদিক হলেন তাঁরাই যাঁরা কাজটি পেশাদারিত্বের সঙ্গে করে থাকেন। সাংবাদিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ফারাক এইটুকুই।

আশা করা যায়, উপরের আলোচনা থেকে খবর সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া গেছে। এবার আমরা সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারি। খবর বা সংবাদকে ইংরিজিতে নিউজ (NEWS) বলা হয়ে থাকে। এটি NORTH– EAST– WEST– SOUTH-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই কথাটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমটি হল, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ থেকে যে তথ্য আমরা প্রতিনিয়ত পাচ্ছি তাই-ই খবর। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির জন্য আমরা NEWS থেকে ছ কে প্রথমে বাদ দেব। তাহলে হল; NEW অর্থাৎ নতুন। এবার যদি NEW-এর সঙ্গে S জুড়ে দিই তাহলে হবে NEWS, মানে অনেকগুলি নতুনের সমাহার। অনেকে তাই নিউজের সজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন যা কিছু নতুন অর্থাৎ অজানা ছিল এবং জানা হল, তাই-ই নিউজ বা সংবাদ।

একটা সময় বলা হত, কুকুর মানুষকে কামড়ালে খবর নয়, কারণ সেটা স্বাভাবিক। বরং খবর হল, উল্টোটা হলে অর্থাৎ মানুষ কুকুরকে কামড়ালে তবেই তার সংবাদমূল্য আছে। এটা হয়তো একটা সময় পর্যন্ত সঠিক বিশ্লেষণ ছিল। কিন্তু আজকের দিনে কুকুর মানুষকে কামড়ালেও খবর। কারণ, পাড়ায় পাড়ায় কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষকে কামড়ানোর ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। এছাড়া মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। তাই কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা নিয়ে ঘটনার বিবরণ, পুরসভার দায়িত্ব এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম চোখে পড়ে, 'কুকুর নিয়ে অতীষ্ঠ পাড়া, জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন বাড়ন্ত হাসপাতালে।' আর কুকুর যদি কোনও বিশিষ্ট মানুষকে কামড়ে দেয় তাহলে কি সেটা খবর হবে না? এমন তো হতেই পারে যে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানদের তাঁদের অতি আদরের পোষা কুকুরটিই কোনও দিন কামড়ে দিল। তা যদি হয়, তো দিনভর সেই খবর টিভির পর্দায়, রেডিও-র বুলেটিনে প্রচার হতে থাকবে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একটা সময় ছিল যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়লে তবেই খবর হত। কমে গেলে খুব একটা লেখালেখি বা খবর করার চল ছিল না। এখন কিন্তু দুটিই খবর। জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়া ক্রেতার জন্য জরুরি তথ্য।

আজকাল 'হাইপার লোকাল নিউজ' কথাটি প্রায়ই কানে আসে। অর্থাৎ একেবারে পাড়ার গলির খবর। এত স্থানীয় খবর একটা সময় সংবাদমাধ্যমে নানা কারণেই গুরুত্ব পেত না। আমরা যদি শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবরগুলি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে, এর অনেকগুলিই একটা সময় সংবাদমাধ্যমে নিষিদ্ধের তালিকায় ছিল। আজকাল কিন্তু যৌনতা নিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ সব ধরনের মিডিয়াতেই প্রকাশিত হচ্ছে।

অতএব বলতে হয়, খবর সম্পর্কে ধারণা ও সংজ্ঞা সময় এবং মানুষের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে। আগামী দিনেও যাবে। প্রয়াত সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার বরেণ্য শিক্ষক সৌরিণ ব্যানার্জীর কথায়, 'সংবাদ-সংজ্ঞার সর্বজনীন রূপ নেই, সরলীকৃত রূপও নেই। সংবাদ ও সংজ্ঞা নেহাতই আপেক্ষিক। প্রেক্ষিত নির্ভর।' (সুত্র-সংবাদ সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)।

তবে সংবাদ মানুষের যে মৌলিক চাহিদা পূরণ করে সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে যে কেউ খবরের একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নিতে পারবেন। সংবাদের সূত্রে মানুষের তিনটি মৌলিক অর্জন হল--- এক. জ্ঞান (KNOWLEDGE) দুই. সচেতনতা (AWARNESS) তিন. ক্ষমতায়ন (EMPOWERMENT)।

জানার অধিকার বা সুযোগের থেকে বড় অধিকার কমই হয়। যাকে এককথায় বলা হয়, তথ্যের অধিকার। এই অধিকার ছাড়া বাকস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারও অসম্পূর্ণ। নাগরিক জানতে না পারলে বলবে কীভাবে, কেমন করেই বা সমালোচনা করবে?

এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে আমরা বলতে পারি, সংবাদ হল কোনও ঘটনা, দুর্ঘটনা, বক্তব্য, মতামত যা সময়োপযোগী, যেটি একটি সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে বোধগম্য, জরুরি মনে হয় এবং তা তাদের প্রভাবিত করে। প্রখ্যাত সাংবাদিক এমভি কামাথের মতে, 'কোনও খবরই সব মানুষের কাছে জরুরি মনে নাও হতে পারে। মানুষ সেই বিষয়েই আগ্রহী যা তার কাছে খবর বলে মনে হয়।' (সূত্র: প্রফেশন্যাল জার্নালিজম)।

৪.৪ সংবাদ মূল্য

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আজকাল সবই খবর। অতি-স্থানীয় খবর প্রকাশের প্রবণতা এর একটি কারণ। যদিও খবরের কাগজ, রেডিও টেলিভিশনে জায়গা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে, ডিজিটাল পোর্টালে তা নেই। ফলে সেখানে সবই খবর। 'স্বামী-স্ত্রী'র নিত্য ঝগড়া, কাউন্সিলরকে নালিশ অতীষ্ট প্রতিবেশীর' জাতীয় খবর নিউজ পোর্টাল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। একটা সময় এই জাতীয় পাড়া কেন্দ্রীক, ব্যক্তি বিশেষের খবর ছাপা হত না। তারমানে সব খবর প্রকাশযোগ্য নয়। স্বভাবতই, খবর বাছাইয়ে একটা মানদণ্ড আছে। সেটির মূল উদ্দেশ্য, কোনও ঘটনা-দুর্ঘটনার সংবাদ মূল্য যাচাই করা।

এই বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক একটা মানদণ্ড থাকলেও মনে রাখতে হবে কোনটা খবর আর কোনটা খবর নয়, সে বিষয়ে বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের বিচার-বিশ্লেষণ অনেকাংশে কাজ করে। যে কারণে, দেখা যায়,

কোনও একটি খবর যা কোনও কাগজ বা টিভি প্রকাশ করেনি, বা গুরুত্বহীনভাবে উল্লেখ করেছে, দেখা গেছে সেই একই বিষয় একটি খবরের কাগজ প্রথম পাতায় আট কলম জুড়ে ছেপেছে। একবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় এক রবিবার দুপুরে খুব ধীরে চলা একটি লোকাল ট্রেনের প্রথম বগিটি আচমকাই লাইনচ্যুত হয়। তাতে হতাহত দূরের কথা কারও আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

পরদিন দেখা গেল একটি বাদে কোনও কাগজ খবরটি প্রকাশ করেনি। কারণ, সাধারণভাবে ছোটখাটো দুর্ঘটনা, বিশেষ করে হতাহত, বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলে সেগুলি খবরে গুরুত্ব পায় না। যে কাগজটি আট কলম খবর ছাপল তারা প্রশ্ন তুলল যে রেলের লাইন এবং বগি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এতটাই অবহেলিত যে ধীর গতির একটি ট্রেনের বগি পর্যন্ত লাইনচ্যুত হয়ে গেল। তারা আরও প্রশ্ন তুলল

উপরের এই দৃষ্টান্তটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ টেলিভিশন ও রেডিও সাংবাদিক ওয়েন স্পেন্সার-থমাসের সংবাদ মূল্য বিষয়ে বক্তব্যে তা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, সংবাদের মানদণ্ড হল একটি সাধারণ নির্দেশিকা যা নির্ধারণ করে যে একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান কোনও একটি খবরকে কতটা প্রাধান্য দেবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সাংবাদিকেরা পর্যালোচনা করেন যে একটি খবর, যা নিউজ রুমের ভাষায় 'স্টোরি' (এর অর্থ প্রচলিত গল্প নয়) তা দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের কতটা আগ্রহী করতে পারে।

বলা ভাল, পর্যালোচনার বিচার্য বিষয়ের কোনও সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব নয়। প্রাথমিকভাবে চারটি মূল বিষয় আছে। এক. নৈকট্য (Proximity). দুই. সময়পোযুক্ত বা যথাকালীনতা (Timeliness). তিন. স্থান ও নাম-পরিচিতি (Prominence). চার. মানবিক আবেদনমুখী (Human Interest). পাঁচ. পরিণতি (Consequence)।

বিষয়গুলিকে নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক :

নৈকট্য :

খবরের ব্যাপারে আমরা নিজের জেলা, রাজ্য, দেশ এবং বিদেশওই ক্রম অনুসারে সাধারণত খবর পেতে পছন্দ করি। অর্থাৎ চারপাশের খবর। যদিও খবরের কোনও সীমানা হয় না, এটাই গোড়ার কথা। আমেরিকার একটা খবর কেউ সবচেয়ে আগে পড়তে আগ্রহী হবেন যদি তাতে যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহলের উপাদান থাকে। যেমন, নিউইয়কের টুইন টাওয়ারে বিমান হানা। একই দিনে যদি শিয়ালদহ বা হাওড়ার কোথাও, এমনকী ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে আত্মঘাতী জঙ্গি হানার ঘটনা ঘটে তাও যথেষ্ট গুরুত্ব পাবে এখানকার সংবাদমাধ্যমে। মানুষ আসলে এলাকার খবর পেতে আগ্রহী। এই আকাঙ্খার পিছনে যেমন তথ্য পাওয়ার বাসনা কাজ করে তেমনই কাজ করে কৌতূহল। যেমন, এক দুটি ব্যতিক্রম বাদে ভারতের সব প্রদেশের মানুষই কম-বেশি রাজনীতি এবং খেলার খবর বেশি পছন্দ করে।

নৈকট্যকে তাই বলে সব সময় কিলোমিটারের দূরত্বে মাপলে চলবে না। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সস্ত্রীক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের প্রথম পাতার খবর হয়েছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'বিনায়কের সিদ্ধিলাভ, নোবেলে ফের সেরা বাঙালিই' (১৫ অক্টোবর, ২০১৯)। তিনি কলকাতার বাঙালি। এখন মার্কিন প্রবাসী। তাঁর এত বড় সম্মান প্রাপ্তির খবর কোনও সীমা দিয়ে মাপা হবে না। আনন্দবাজারেই অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাপ্তির খবরের শিরোনাম ছিল, **'মর্তের সেরা সম্মান বাংলার অমর্ত্যের'** (১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮)। দুটি শিরোনামেই বাঙালির জয়গান গাওয়া হয়েছে।

সময়পোযুক্ত বা যথাকালীন :

আবার খবর এবং খাবারের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। দুটিই মানুষ তাজা পেতে চায়। কোনও ঘটনা-দুর্ঘটনা-সিদ্ধান্ত-বক্তব্য ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জৈবিক বাসনা আমাদের মধ্যে কাজ করে। মজার বিষয় হল, ১৬০০ শতাব্দীতে প্রথম প্রকাশিত খবরের কাগজ থেকে আজ পর্যন্ত সংবাদপত্র সর্বদা বাসি খবর দিয়ে থাকে। রেডিও আবিরের আগে পর্যন্ত খবরের কাগজকে সময় নিয়ে তেমন ভাবতে হয়নি। রেডিও-তে খবর প্রচার শুরুর পর থেকে সংবাদপত্র চাপে পড়ে যায়। তা আরও বেড়ে যায় টেলিভিশন আসার পর। এখন তো সবচেয়ে পুরনো ও প্রচলিত সব মাধ্যমের কাছেই চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে ডিজিটাল বা অনলাইন সংবাদ পোর্টাল। এই মাধ্যমেই সবচেয়ে আগে খবর পরিবেশন করা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সবচেয়ে সহজ। অবশ্য রেডিও এবং টেলিভিশনের ধারাবাহিক সম্প্রচার চালুর পর বাসি খবরের সমস্যা খানিক মিটে যায়।

নাম-পরিচিতি :

বিশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা নামজাদা জায়গা সম্পর্কে খবর পেতে মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। সেলিব্রেটিদের জীবন আর পাঁচজনের থেকে খুব ফারাক থাকে না। তবু তাদের সব কিছুই খবর। আমরা সবাই জানি বলিউড তারকারা খুব স্বাস্থ্য সচেতন হন। তাঁরাও নানা ধরনের টোটকা ব্যবহার করেন। এখন কোনও নায়িকা যদি সাক্ষাৎকরে বলেন, আমি রোজ সকালে চিরতার জল খাই। খুব স্বাভাবিক এই খবর মুখে মুখে ছড়াবে। আবার কোনও নায়ক যদি বলেন, আমি তিরিশ বছর হল ভাত-রুটি খাই না, তাহলেও সেই খবর নিয়ে চর্চা হবেই। ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে আমরা কে না চাই। প্রধানমন্ত্রী যদি সিদ্ধান্ত করেন, এক রবিবার তাঁর গুজরাতের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন, তাহলে সেটা হয়ে যাবে জাতীয় খবর। বহু টিভি চ্যানেল লাইভ শো করতে টিম পাঠাবে।

জায়গার নামেরও এমন খবর মাহাত্য আছে। মুম্বই আমাদের বাণিজ্য রাজধানী। সেখানে বড় ধরনের যানজট হলেও কিন্তু তা গোটা দেশের জন্য খবর। কিংবা রাজধানী দিল্লিতে লোডশেডিং। একইভাবে কাশ্মীরকে নিয়ে খবরের প্রতি আগ্রহ আছে।

মানবিক আবেদনমূলক :

আর পাঁচটা খবরের ভিড়ে এই জাতীয় সংবাদ ছড়িয়ে থাকে। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মুর্শিদাবাদের একটি পরিবারের তিনভাই মারা যান। তাঁরা ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক। কাজের সন্ধানে চেন্নাই যাচ্ছিলেন। একটা দুর্ঘটনা এক মায়ের তিন সন্তানকে কেড়ে নিল। আবার এই ধরনের দুর্ঘটনাতেই দেখা যায়, বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা হয় স্থানীয় কোনও মানুষদের তৎপরতায়। বছর বারো আগে দক্ষিণ কলকাতার একটি নামি হাসপাতালে ভোররাতে আগুন লেগে বহু মানুষ মারা যান। বেশিরভাগেরাই ছিলেন সেখানে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালটির পিছনেই ছিল একটি বস্তি। যেখানকার মানুষ ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর কথা ভাবতেও পারতেন না। দুর্ঘটনার দিনে তাঁরা প্রথম হাসপাতালটিতে ছুটে যান মানুষকে বাঁচাতে। তা না হলে হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ত। ঘটনা-দুর্ঘটনার মাঝে এই ধরনের খবরকে মানবিক আবেদনমূলক খবর বলা হয়ে থাকে যা পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মনেও মানবিক আবেদন তৈরি করে।

পরিণতি :

ধর্ষণের অভিযোগের খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যায়। কোনও কোনওটি খবরের প্রথম পাতায় বড় করে ছাপা হয়ে থাকে। একটি ঘটনা নিয়েই হয়তো চার-পাঁচটা খবর প্রকাশ করা হয়। তারমানে বুঝতে হবে ধর্ষণের আর পাঁচটা ঘটনার থেকে বাড়তি গুরুত্ব পাওয়া ঘটনাটি আলাদা এবং তা নিয়ে জল অনেক দূর গড়াবে।

শুধু ঘটনা নয়, কারও কোনও কথার রেশ অনেক দূর গড়াতে পারে। এমনকী তিনি মন্তব্যটি অস্বীকার করলেও তার রেশ থেকে যায় রাজনীতির অঙ্গনে। যেমন বহু বছর আগে কলকাতার পূর্বপ্রান্ত বানতলায় একটি ধর্ষণ-হারাজানির ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'এমন ঘটনা তো কতই হয়' বলে মন্তব্য করেছেন বলে খবর প্রকাশ করে একটি সংবাদপত্র। জ্যোতিবাবু বলেন, 'এটা মিথ্যা সংবাদ। আমি এমন কথা বলিনি।' কিন্তু বহু বছর ওই বলা বা না বলা মন্তব্য নিয়ে রাজনীতি চলতে থাকে, মিডিয়া খবরটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায়। মিডিয়ার বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ, মানুষ এই ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কের খবর জানতে আগ্রহী।

এই পাঁচ ধরনের বিষয় ছাড়া আরও অনেক কিছু সংবাদমূল্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদমূল্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভাবনাচিন্তাতেও বড় পরিবর্তন এসেছে।

৪.৫ সংবাদে আদর্শ, নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা

আদর্শ, নৈতিকতা বজায় রাখা বা নীতিনিষ্ঠ থাকার সঙ্গে আইন বা বিধির তেমন একটা সম্পৃক্ততা নেই। সভ্যতার বিকাশের ধারায় সমাজ কিছু বিষয়কে নীতিনিষ্ঠ এবং কিছু বিষয়কে নীতিভ্রষ্ট হিসাবে

চিহ্নিত করে। নাগরিকবৃন্দ সেগুলি অনুসরণ করবে, এটাই কাম। এভাবেই একটি জাতি নীতিনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সংবাদমাধ্যম যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই তাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়, যা আসলে সমাজ স্বীকৃত আচরণবিধি বলা চলে। সংবাদমাধ্যমকে মনে রাখতে হয়, সংশ্লিষ্ট সমাজে কোনও ধরনের খবর, শব্দ, বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তেমনই খেয়াল রাখতে হয়, কারও বিরুদ্ধে কিছু লেখা বা বলা বা দেখানোর আগে সংশ্লিষ্ট খবর সম্পর্কে একশো শতাংশ নিশ্চিত হলেই শুধু হবে না, অভিযুক্ত ব্যক্তি সমাজের যে অংশেরই মানুষ হোন না কেন, তাঁর বক্তব্য থাকা দরকার। এখানেই আসে পেশাদারিত্বের বিষয়। সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পেশাগতভাবে দায়বদ্ধ রাখতে বিভিন্ন দেশ তাদের মতো করে পদক্ষেপ করেছে। ভারতে আছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। এটি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যেটির চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হলেও বাকি সদস্যদের সিংহভাগ অভিজ্ঞ সাংবাদিকেরা। কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে বিধিমালা প্রকাশ করে থাকে। বিধিমালার মূল উদ্দেশ্যকে যদি একটি শব্দ দিয়ে তুলে ধরতে হয় তবে তা হল বস্তুনিষ্ঠতা।

বস্তুনিষ্ঠতা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। সাধারণভাবে এর অর্থ হল, যে কোনও বিষয়ে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পক্ষপাতহীন থাকা। শুধু সংখ্যা বা পরিসংখ্যানেই নয়, ঘটনা-দুর্ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনাতেও বস্তুনিষ্ঠতা জরুরি। যেমন, কোনও দুর্ঘটনার খবরে যেমন হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা পরিবেশন জরুরি, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হল বর্ণনা, যা থেকে কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের মূলে কী কোনও একটি গাড়ির চালকের ভুল নাকি ভাঙা রাস্তা দায়ী, এই অনুসন্ধান জরুরি। একজন সংবাদিককে এই ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে হবে। তিনি যদি নিশ্চিত হতে না পারেন, তাহলে সেটাই বলা বাঞ্ছনীয়। খবরের মধ্যে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অভিমত প্রকাশ করা অনুচিত। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সীমারেখা রক্ষিত হয় না।

৪.৬ সংবাদের উপাদান

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দু'জন মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তখন তারা কিছু তথ্য বা সংবাদ বিনিময় করেন। অনুভূতি বিনিময়ও এর বাইরে নয়। অনুভূতি, উপলব্ধিও আসলে কিছু খবর বা তথ্যের সমাহার।

আমরা যদি সচেতনভাবে কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা, এমনকি দুই ব্যক্তির আলাপচারিতাকেও বিবেচনায় নিই তাহলে দেখব সেখানে পাঁচটি W এবং একটি H-এর জবাব রয়েছে। পাঁচটি W হল Who? What? Where? When? Why? এবং How?

একটি দুর্ঘটনার কথাই ধরা যাক। এই ধরনের খবর কানে আসা মাত্র আমরা কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই পাঁচটি W এবং একটি H এর জবাব খুঁজে বেড়াই—দুর্ঘটনার কবলে কে পড়লেন, সেটা কোথায় হয়েছে, কখন হয়েছে, কেন হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে।

দুর্ঘটনার পরিবর্তে যদি একটি ঘটনাও হয়, সেই বিষয়েও মানুষ এই ছয়টি মূল বিষয়ের জবাব পেতে চায়। অর্থাৎ এই ছয়টি প্রশ্নের জবাব ছাড়া কোনও সংবাদ পূর্ণতা পায় না। তবে এমন নয়, যে ছয়টি প্রশ্নের জবাব ছাড়া কোনও সংবাদ হবে না। গভীর রাতে নির্জন জায়গায় হওয়া দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অনেক সময় H অর্থাৎ কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সঙ্গে সঙ্গে জানা সম্ভব হয় না।

তবে এটা মনে রাখতে হবে, ছয়টি প্রশ্নের জবাব মূলত 'হার্ড' নিউজের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে ধরা হয়। 'হার্ড' নিউজ বলতে বোঝায় দৈনন্দিন ঘটনাবলী সংক্রান্ত খবরাখবর যেগুলি সাধারণভাবে জানা জরুরি।

৪.৭ খবরের প্রকারভেদ

হার্ড নিউজ সম্পর্কে আগের অনুচ্ছেদে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। হার্ড নিউজ বলতে দৈনন্দিন ঘটনাবলী বোঝায়। তা দুর্ঘটনা, কোনও অনুষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা, হিংসাত্মক ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা বিশিষ্ট কোনও নেতা-নেত্রীর বক্তব্য, সরকারি ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি জারি, খেলা, ব্যবসা, বিনোদনের জগতের ঘটনাবলী, সবই হার্ড নিউজের অংশ।

এছাড়াও ফিচার, মানবিক আবেদন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যামূলক, তদন্তমূলক ইত্যাদি ধরনের খবর আছে। এই জাতীয় খবরগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

ফিচার : ইংরিজি ফিচার শব্দটির বাংলা অর্থ একাধিক। বৈশিষ্ট্য, অবয়ব, মুখের আদল, চেহারা, উপাদান ইত্যাদি নানা বাংলা শব্দের জন্য ইংরিজি Feature কথাটি ব্যবহার করা যায়। খবরের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা ফিচারের কথা বলি তাহলে উপাদান শব্দটি উপযুক্ত। ফিচার জাতীয় খবরে আসলে কোনও একটি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা থাকে।

তবে এটাই ফিচার স্টোরির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। লেখার ধরনেও ফারাক আছে। সাধারণভাবে বলা যায় কোনও জানা বিষয়ে আরও গভীর আলোকপাত করে তাকে নতুনভাবে প্রকাশ করা কিংবা একেবারে নতুন কোনও বিষয়কে অভিনবভাবে পরিবেশন করা হল ফিচারের অন্যতম দিক। ধরা যাক, কেউ মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গিয়ে নবাব পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বললেন। ইতিহাস বই থেকে আমরা মিরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিনতে শিখেছি। মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারের অনেকেই কিন্তু উল্টো কথা বলেন। মিরজাফরকে নিয়ে ভিন্ন মতের কথা একেবারে অজানা নয়। তবু সেটা ফিচার স্টোরির বিষয় হতে পারে, একেবারে হাল আমলের মানুষজন কী বলছেন তা তুলে ধরে।

এবার নতুন বিষয়কে অভিনবভাবে প্রকাশের বিষয়ে আসা যাক। ভারতের চন্দ্রযান অভিযানের কথা এখন সাধারণ দেশবাসী জানেন তাই-ই শুধু নয়, মহাকাশ বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর সাফল্য সম্পর্কে অনেকের ধারণা আছে। কারণ, সংবাদমাধ্যম তা সাধারণ দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের বোধগম্য করে প্রকাশ করেছে।

মানবিক আবেদনমূলক : চারপাশে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এই জাতীয় খবর পড়ে সাধারণত দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষ আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ে। আবার ভাল কিছু করার তাগিদ অনুভব করে। উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে একটি পরিবার ফুটপাথে বাস করে। পরিবারের কিশোরী কন্যা স্থানীয় স্কুলে পড়ে। রাতে সে স্ট্রিট লাইটের আলোয় পড়াশুনো করে। এক পথচারী তাঁকে ব্যাটারি চালিত একটি বাতি উপহার দিতে চাইলেও সে নেয়নি। বলে, আমার অনেক সহপাঠী কুপির আলোয় পড়াশুনো করে। খবরটির মধ্যে দুটি বিষয় আছে। প্রথমটি হল কিশোরীর চেতনা, মূল্যবোধ। দ্বিতীয়টি হল প্রদীপের নিচে অন্ধকারের বাস্তব চিত্র।

বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন : অনেক রহস্যময় ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে যেগুলির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে না দিলে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, বউবাজারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর প্রকল্প পথে ধস নামার ঘটনা। গঙ্গার নিচ দিয়ে আসা সেই রেল নির্মাণের কাজে এমন ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি, ঘটেছে বউবাজারে। এই ধরনের ঘটনা সংক্রান্ত খবরে বিপর্যয়ের কার্যকারণের বিশ্লেষণ জরুরি। সমতল এলাকায় মাটি বসে যাওয়ার একটি কারণ হতে পারে অতীতে সেখানে কোনও জলাশয় ছিল। আবার মাটির নিচ থেকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে জল তুলে নিলেও ধস নামতে পারে। যে কারণে কলকাতা-সহ বহু শহর ক্রমে ভূমিকম্প প্রবণ হয়ে উঠছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বছর তিরিশ আগে গণেশের অবাক দুধপানের ঘটনায় গোটা দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কেউ গণেশের পাথর, মাটির মূর্তি, তো কেউ দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের ছবির মুখে দুধ ভরা চামচ ঠেকিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবান দুধপান করছেন। এখন এই ধরনের খবরে শুধু ঘটনার বর্ণনা দিলেই চলবে না, রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও পেশ করতে হবে সংবাদমাধ্যমকে। গণ মানুষ যখন বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হন তখন এমন উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে মূল ব্যাখ্যা হল, রাজস্থানের কিছু এলাকার পাথর তরল শুষে নেয়। সেই পাথরের তৈরি মূর্তির 'দুধপান' স্বাভাবিক। এছাড়া সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ-টানও এই ক্ষেত্রে কাজ করেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন : যে কোনও বিষয়ে জনমনে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত থাকে। কোনও একটি ঘটনা বা কারও বক্তব্য, কিংবা সরকারের কোনও সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাখ্যাগুলি পরস্পরের থেকে ভিন্ন হলেও সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তটি নিয়েই আলোচনা করা যাক। কেউ বলেছন, হাসিনা ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁর সময়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় উঠেছিল। তাই বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সরকার সঠিক কাজ করছে। কেউ আবার বলেছেন, তিনি গণ অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের মানবাধিকার হরণের অভিযোগ আছে। তাই তাঁকে আশ্রয় দেওয়া সঠিক কাজ হয়নি। কেউ বলেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভারতের রক্তের সম্পর্ক আছে। ভারতের সেনা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কবল মুক্ত করতে মুক্তিবাহিনীকে পাশে নিয়ে লড়াই করেছে।

সেই লড়াইয়ের মুখ শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার সঠিক পদক্ষেপ করেছে। এই পরস্পর বিরোধী মতগুলিকে একটি প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখ করে তৈরি হয় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট। এই ধরনের প্রতিবেদনের মধ্যে আরও দুটি বিষয় থাকতে হয়। এক. প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ বিষয়টির অতীত। দুই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

তদন্তমূলক প্রতিবেদন : সাংবাদিকতা একদিকে যেমন চারপাশে বহমান তথ্যকে তুলে এনে পরিবেশন তেমনই পর্দার আড়ালে থাকা সত্যের অনুসন্ধানও এর অঙ্গ। সাংবাদিকতা এক অর্থে পেশাদারিত্বের সঙ্গে অনুসন্ধান। কম-বেশি প্রায় সব খবরের জন্যই খানিক অনুসন্ধান করতে হয়। তার অর্থ অবশ্য এটা নয় যে এই জাতীয় সব খবরই অনুসন্ধান বা তদন্তমূলক প্রতিবেদন। সংবাদমাধ্যমে বিশেষ ধরনের খবর বা প্রতিবেদনকে তদন্তধর্মী বলা হয়ে থাকে। এর প্রধান মানদণ্ড হল সংশ্লিষ্ট খবরটি হতে হবে জনস্বার্থবাহী এবং সেটির দ্বারা আড়ালে থাকা সত্য সামনে আসবে। দুর্ভাগ্যের হল, এই মানদণ্ড অনুযায়ী ভারতে সাংবাদিকতায় অনুসন্ধান বা তদন্তমূলক সাংবাদিকতার মান অত্যন্ত খারাপ। সাড়ে তিন দশক আগে ভারতীয় সেনা বাহিনীর জন্য বফর্স কামান কেনাতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তিনটি সংবাদপত্র দ্য হিন্দু, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং দ্য স্টেটসম্যানের তদন্তমূলক প্রতিবেদন বহু নেতা-আমলার মুখোস খুলে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই জাতীয় রিপোর্টের নজির তেমন একটা নেই বললেই চলে। এখন ভারতের কোনও বেসরকারি সংস্থার আর্থিক অনিয়ম কিংবা সরকারি সম্পদ কেনাকাটায় বেনিয়মের খবর বিদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক, বফর্স কামান কেনাতে অনিয়মের খবরও প্রথম সুইডিস রেডিও প্রথম প্রচার করেছিল। তারপর তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় আগে উল্লেখিত তিনটি সংবাদপত্র। সেই উদ্যোগ অনেক আগেই থেমে গিয়েছে।

অন্যান্য প্রতিবেদনের সঙ্গে তদন্তমূলক রিপোর্টের মৌলিক ফারাক হল, এতে সংশয়, সন্দেহ, অনুমানের ভিত্তিতে কিছু পেশ করার অবকাশ নেই। অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কীভাবে হয়েছে, কারা যুক্ত, তাতে কীভাবে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, এই বিষয়ে স্পষ্ট, নিঃসংশয় তথ্য থাকতে হবে। 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মধ্যবর্তী অবস্থান নেওয়ার সুযোগ নেই।

৪.৮ সংবাদ উৎস বা সূত্র

নানা উৎস বা সূত্র থেকে সংবাদমাধ্যম খবর পেয়ে থাকে। খবরের উৎসের কোনও তালিকা করা কঠিন। নতুন নতুন উৎস বা সূত্র তাতে যুক্ত হচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে দুই যাত্রীর কথপোকথন থেকেও সংবাদ সূত্র মিলতে পারে। আসলে খবর আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলা হল, যে সাংবাদিকের চোখ-কান খোলা, মস্তিষ্ক সচল তিনি তত বেশি খবরের গন্ধ পান।

তবে সাধারণভাবে খবরের উৎসের মধ্যে অন্যতম হল, দেশি-বিদেশি নিউজ এজেন্সি। সব সংবাদমাধ্যমের যেহেতু দেশের সব রাজ্যে বা অনেক দেশে প্রতিনিধি রাখা সম্ভব হয় না, তাই এজেন্সির

ধারণা তৈরি হয়। এজেন্সি সরাসরি পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে খবর দেয় না। তারা খবর বিক্রি করে সংবাদমাধ্যমের কাছে। সংবাদমাধ্যম সেগুলি প্রচার করে। যেমন ভারতের বড় নিউজ এজেন্সি হল প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, সংক্ষেপে পিটিআই। সংবাদপত্রে একটি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, খবরের শুরুতে বা শেষে পিটিআই লেখা আছে। এর অর্থ খবরটি সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছে পিটিআই। এজেন্সি আবার তাদের নানা সূত্র থেকে খবরটি সংগ্রহ করেছে। একইভাবে হিন্দিতে হিন্দুস্থান সমাচার নামে নিউজ এজেন্সি আছে।

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিসকাছারিতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করা হয়ে থাকে। রাজ্য সরকারের প্রধান সচিবালয় নবান্ন-তে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, সচিবদের প্রায়শই আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি জানাতে শুনি। কলকাতা পুরসভাতেও নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এত বড় একটা শহরে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণের কাজ করে পুরসভা। কোনও দিন জলাধার পরিস্কার, তো কোনও দিন বিকল যন্ত্র সারাতে শহরের কোনও এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়। এই ধরনের খবর পুরসভা আগাম জানিয়ে থাকে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারেও নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা আছে। শহরের অপরাধ, ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর পুলিশ সংসাদ মাধ্যমকে নিয়মিত দেয়।

এর বাইরে সংবাদমাধ্যমকে খবর সরবরাহ করে থাকে তাদের সাংবাদিকেরা। সব সংবাদমাধ্যমেই খবর সংগ্রহের জন্য নানা স্তরের সাংবাদিক আছেন। তাঁরা সংবাদমাধ্যমের চাহিদা বিবেচনায় রেখে খবর সরবরাহ করে থাকেন। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেগুলির খবর সাধারণ মানুষের জরুরি। সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এগুলিকে বলা হয় বিট। এখানে বিট শব্দের অর্থ হল ক্ষেত্র। অসংখ্য বিট আছে। যেমন প্রশাসনিক, অপরাধ, আইন-আদালত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাষআবাদ, শিল্প-বাণিজ্য, বিনোদন ইত্যাদি।

আজকাল খবরের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সোর্স বা উৎস হল সমাজমাধ্যম। নানাজনের পোস্ট থেকে অনেক খবর পাওয়া যায়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ছাড়াও খবরের বড় সূত্র এখন এক্স হ্যান্ডেল। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, নেতা-মন্ত্রী, নানা ক্ষেত্রের সেলিব্রেটিরা নিয়মিত তাঁদের কথা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়ে থাকেন।

৪.৯ সংবাদ লেখার কৌশল

খবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে সেটির লেখার শৈলি। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যস্ততা যত বেড়েছে ততই খবর লেখার শৈলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছে। কারণ, সময় হল প্রকৃতি নির্ধারিত সাম্য। একটি দিন মানে ২৪ ঘণ্টা। তারমধ্যেই ঘুমনো-সহ যাবতীয় কাজ সারতে হবে। ফলে খবর পড়া বা শোনা, কোনটার জন্যই অফুরন্ত সময় নেই। তাই বড় একটা ঘটনা, দুর্ঘটনা কিংবা প্রধানমন্ত্রীর মতো

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দীর্ঘ ভাষণের নির্যাসটুকু জানাই বেশিরভাগ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের প্রাথমিক চাহিদা। অনেক বাড়িতেই একাধিক খবরের কাগজ রাখা হয়। বাস্তব হল, ভারতীয়রা গড়ে কুড়ি মিনিট খবরের কাগজ পড়েন। কারণ, কোনও একটা খবরে আটকে থাকার মতো পর্যাপ্ত সময় অনেকেরই নেই।

তাই খবর লেখার যে জনপ্রিয় উপায় অবলম্বন করা হয় সেটি হল উল্টো পিরামিড মডেল। পিরামিডকে উল্টে নিলে সেটি কী চেহারা নেবে তা চোখ বুজে ভেবে নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিচের দিকটিকে যদি উপরের দিকে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেই অংশটা একটা পাটাতনের চেহারা নেবে। এবার খবরের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে গুরুত্বের মান অনুযায়ী লেখা হলে দেখা যাবে, কম জরুরি তথ্য যা না জানলেও চলে, সেগুলির একেবারে নিচের দিকে স্থান হয়েছে। অনেক পাঠক পুরো খবর পড়েন না। তাতে তাদের বিরাট ক্ষতি কিছু হয় না। কারণ, খবরটি লেখাই হয়েছে খবরের তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে।

মানুষের ব্যস্ততার কথা বিবেচনায় রেখেই খবরের সূচিমুখ-কে খুব বেশি তথ্য ভারাক্রান্ত করা হয় না। এই অংশকে বলা হয়ে থাকে ইন্ট্রো। আমেরিকায় একই অংশকে লিড বলা হয়ে থাকে। যদিও লিডে ইন্টোর তুলনায় একটু বিশদ তথ্য থাকে।

ইতিপূর্বে খবরের পাঁচটি W এবং একটি H-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্ট্রোতে এই ছয়টি প্রশ্নের সাধারণত তিনটির জবাব রাখার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য, ইন্ট্রো যাতে তথ্য-ভারাক্রান্ত না হয়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের ভাষা বিষয়ে দীর্ঘ কাজ করেছেন। তিনি ইন্ট্রো লেখার কৌশল বোঝাতে টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। টেলিগ্রাম ভারতে এখন আর চালু নেই। খুব অল্প কথায় জরুরি খবর পৌঁছে দিতে টেলিগ্রাম করা হত। কাউকে বাবা হওয়ার সংবাদ দিতে লেখা হত, 'গার্ল চাইল্ড বর্ন, কাম আরলি।' নীরেনবাবু 'কী লিখবেন, কেন লিখবেন' বইয়ে ইন্ট্রো লেখার সময় টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত বার্তা লেখার দিকটি বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইন্ট্রোতে সব কথা না বলে খবরে বাকি অংশ পরবর্তী প্যারাগুলিতে পেশ করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে, খবর লিখতে হবে তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে। কাজটা সহজ নয়, কঠিন নয়। কৌশল রপ্ত করার মুন্সিয়ানা এবং আগ্রহ থাকা দরকার। এক প্রবীণ সাংবাদিক একবার বলেছিলেন, তিরিশ বছরের কর্মজীবনে আমার পাঁচ বছর লেগেছিল উপযুক্ত ইন্ট্রো লেখা শিখতে। আর বাকি পঁচিশ বছর ধরে আমি অনুজ সহকর্মীদের ইন্ট্রো লেখা শিখিয়েছি।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতা সংস্করণের (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) ২২ নম্বর পাতায় ছাপা একটি খবরের শিরোনাম ছিল, 'জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু'। এই খবরের প্যারা অর্থাৎ ইন্ট্রোতে লেখা হয়, 'কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হল।

শুক্রবার রাজারহাটের নৈপুকুর এলাকায় ওই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম সুষমা মাহালি (৩২)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকার বাসিন্দা।' পরের প্যারায় ওই তরুণী বধূ এবং ঘটনার বিষয়ে বিশদ তথ্য দেওয়া হয়েছে। ওই পাতাতেই ছাপা আর একটি খবরের শিরোনাম ছিল 'জোকা মেট্রোর জন্য ময়দানের গাছে কোপ নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের'। এই খবরের ইন্ট্রোতে লেখা হয়, 'কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজের জন্য ময়দান এলাকায় আপাতত কোনও গাছ কাটা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড মেট্রো রেলের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু কোনও গাছ কাটা যাবে না, অথবা গাছ তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রোপণের কাজও করা যাবে না।' এই খবরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সংক্ষিপ্তসার খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিদিন প্রতিটি খবরের ক্ষেত্রে ইন্ট্রো সংক্রান্ত এই প্রচলিত বিধি অনুসরণ করা হয় না। অনেক সময়ই খবরের কাগজ বহু খবরকে নাটকীয় করে পরিবেশন করতে গিয়ে দেড়শো শব্দের ইন্ট্রো লেখে।

তাছাড়া ইন্ট্রো লেখার এই প্রচলিত সব ধরনের প্রতিবেদনের জন্য অনুসরণও বাধ্যতামূলক নয়। যেমন ফিচার, মানবিক আবেদনমূলক বা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিক তাঁর নিজস্ব পরিবেশন রীতি অনসরণ করতে পারেন, যদি তাঁর প্রতিষ্ঠান তা অনুমোদন করে।

৪.১০ সম্পাদনা

সংবাদমাধ্যমের খবর সংক্রান্ত বিভাগটিতে মূলত দুটি ভাগ থাকে। একটিকে বলা হয় রিপোর্টিং ডেস্ক, অপরটি এডিটিং ডেস্ক। রিপোর্টিং ডেস্কের কাজ মূলত খবর সংগ্রহ করে এনে লিখে তা এডিটিং ডেস্কের কাছে পেশ করা। রিপোর্টিং ডেস্কের প্রধানকে বলা হয় চিফ রিপোর্টার বা মুখ্য প্রতিবেদক। কোথাও কোথাও এই পদে আসীন ব্যক্তিকে চিফ অফ নিউজ ব্যুরোও বলা হয়ে থাকে। তাঁর কাজ মূলত দুটি। এক হল, রিপোর্টার বা প্রতিবেদকদের কার কী কাজ তা বুঝিয়ে বলা। ঘটনা-দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে রিপোর্টারদের পাঠানোও তাঁর কাজ। রিপোর্টাররা ফিরে এসে যে প্রতিবেদন পেশ করেন সেগুলি প্রাথমিকভাবে দেখে ঠিকঠাক করে দেওয়া তাঁর কাজ।

তবে এখানেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। রিপোর্টটি এরপর এডিটিং ডেস্ক ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে। তাতে বানান, বাক্য গঠনে ভুল আছে কিনা, তারিখ, পরিসংখ্যান নির্ভুল কিনা ইত্যাদি নিরীক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনে রিপোর্টটি নতুন করে লেখাও এডিটিং ডেস্কের কাজ। এছাড়া এডিটিং ডেস্কে কর্মরত সাব এডিটর, সিনিয়র সাব এডিটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব এডিটরদের কাজ হল দেশ-বিদেশ থেকে আসা খবর বাছাই করা, সেগুলির অনুবাদ করা বা করানো। লেখা প্রয়োজনে ছোট বা বড় করাও এডিটিং ডেস্কের কাজ।

৪.১১ শিরোনাম

খবরের কাগজ, অনলাইন পোর্টালের প্রতিটি খবরের একটি শিরোনাম থাকে। রেডিও, টেলিভিশনের

খবরে থাকে বিশেষ বিশেষ খবর। শিরোনামকে বলা চলে খবরের নাম-পরিচয়। কোন খবরটির কী বিষয়, একপলকে তা জেনে নিতে প্রয়োজন শিরোনাম। একটা সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতে খবরের কাগজ মানুষ এখন গড়ে কুড়ি মিনিট পড়ে। অর্থাৎ বেশিরভাগ খবরই মানুষ পুরোটা পড়েন না। তারা বড়জোর দু-চারটি খবর পুরোটা পড়েন। বাকি খবরের ক্ষেত্রে তারা শিরোনাম পড়েন।

শিরোনাম লেখা এক বিশেষ মুন্সিয়ানার কাজ। বিরাট বড় একটা ঘটনা নিয়ে হাজার শব্দের একটি খবরের শিরোনাম করতে হয় চার কী পাঁচটি শব্দে। স্বভাবতই কাজটা মোটেই সহজ নয়। ইতিপূর্ব গণেশের আজব দুধপানের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আজকাল কাগজে শিরোনাম করা হয়েছিল, 'গুজবের দুধ খেল গণেশ, গোটা দেশ'।

অনেক সময় খবরের ভাবার্থ দিয়ে শিরোনাম করা হয়। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি তিনশোর বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতা দখল করে। ফল ঘোষণার পরদিন কোনও কাগজ প্রধান খবরের শিরোনাম করে'ভারত গেরুয়াময়'। কোনও কাগজ লেখে, 'পদ্ম ফুটেছে দেশ জুড়ে'। কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলে লেখা হয়েছিল, 'হাতের (কংগ্রেসের প্রতীক) হাতেই দিল্লি'। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ে লেখা হয়েছে, 'বাংলায় সবুজ ঝড়', 'ঘাস ফুলে ঢাকা পড়েছে রাজ্য' ইত্যাদি। শিরোনাম মূলত এডিটিং ডেস্কের সাংবাদিকেরা করে থাকেন। তবে চাইলে কোনও রিপোর্টারও শিরোনাম করে দিতে পারেন।

৪.১২ পৃষ্ঠাসজ্জা

কথায় বলে, 'পেহলে দর্শনধারী, ফির/পিছে গুণবিচারী'। অর্থাৎ চেহারার ভালমন্দ উপেক্ষা করার নয়। সুন্দরের প্রতি কে না আকৃষ্ট হন। গোড়ায় খবর আর খাবারের তুলনা টেনে আলোচনা করা হয়েছে। খাবার কিন্তু শুধু সুস্বাদু হলেই চলে না। অতিথিকে ঠিক করে পরিবেশন করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। খবরের ক্ষেত্রেও কথাটা একশো ভাগ সত্য। খবর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পরিবেশনের গুণে।

খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলেও এটা স্পষ্ট হয়। এক একটি কাগজের এক এক রকম অঙ্গসজ্জা। প্রথম পাতার খবর পরিবেশনে প্রতিদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। কারণ, খবর পড়াতে চোখের আরাম খুব জরুরি। কোনওরকমে খবরগুলি পাতায় বসিয়ে দিলে চলবে না। পাঠক বিরক্ত হবেন। পাতাগুলি দেখতে সুন্দর হলে মানুষের খবর পড়ার আগ্রহ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়।

রেডিও, টেলিভিশনেও খবর পরিবেশনায় নিজস্বতা আছে। বেশ কয়েক বছর হল রেডিও-র খবরে অডিও বাইট শোনানো হচ্ছে। অর্থাৎ যাঁকে নিয়ে খবর, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনানো হচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই এর ফলে রেডিও-র খবরের আকর্ষণ বেড়েছে। খবর কাগজ এবং টেলিভিশনে এখন ইনফোগ্রাফ এবং গ্রাফিক্সের ব্যবহার বেড়েছে। এরফলে বড় কোনও খবরকে একটা ইনফোগ্রাফ বা গ্রাফিক্স দিয়ে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি ৩০৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। 'এই সময়' কাগজ খবরটিকে অভিনবভাবে পেশ করেছিল। তারা ভারতের ম্যাপের মধ্যে বিজেপির জয়ী হওয়া লোকসভা আসনগুলি গেরুয়া রং করে দিয়ে প্রথম পাতায় প্রকাশ করে। সঙ্গে শিরোনাম ছিল 'ভারত গেরুয়াময়'। এরফলে খবরটি যেমন দৃষ্টি আকর্ষণী হয়, তেমনই তাতে অল্প শব্দে সেটি লেখা সম্ভব হয়। এতে পাঠককেও বড় দীর্ঘ খবর পড়তে হল না। অন্যদিকে, খবরের কাগজের জায়গা বেচে গেল। টেলিভিশনের খবরেও ইনফোগ্রাফ ও গ্রাফিক্সের ব্যবহার বেড়েছে।

৪.১৩ সারাংশ

সংবাদ বা খবর হল একটি জরুরি বিষয় যা সুস্থ-সবল জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সভ্যতার বিকাশে খবর বা সংবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। প্রতিনিয়ত চারপাশ থেকে নানা তথ্য-পরিসংখ্যানের এক প্রবাহমান ধারা অব্যহত। NEWS শব্দটির ভাবনা এবং উৎপত্তি সেখান থেকে। NORTH (উত্তর) EAST (পূর্ব) WEST (পশ্চিম) SOUTH (দক্ষিণ)-দিক থেকে বয়ে আসে খবর। এক অদৃশ্য থালায় এসে সেগুলি জড়ো হয়। চাহিদা বা পছন্দ অনুযায়ী মানুষ প্রয়োজনীয় খবরটি তা থেকে গ্রহণ করেন। সাংবাদিকেরা পেশাদারিত্ব দিয়ে খবরকে নতুন মাত্রা দেন।

৪.১৪ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. খবরের ধারণা ও সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।

২. আমাদের জীবনে খবর কেন জরুরি?

৩. উপাদানগুলি কী কী?

৪. খবরের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা জরুরি কেন?

৫. খবরের উৎস বলতে কী বোঝায়?

৬. শিরোনাম খবরের জন্য কেন জরুরি?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

টীকা লিখুন :

১. খবর

২. NEWS

৩. 5W & 1H

৪. ইন্ট্রো

৫. হার্ড নিউজ

৬. ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

৭. বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

৮. তদন্তমূলক প্রতিবেদন

৯. শিরোনাম

১০. খবরের উৎস

৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. 'প্রফেশন্যাল জার্নালিজম', এম ভি কামাথ, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

২. 'নিউজ রিপোর্টিং অ্যান্ড এডিটিং', কে এম শ্রীবাস্তব, স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

৩. 'সংবাদ সম্পাদনা', সৌরিণ ব্যানার্জি (পরিমার্জন ও পরিবর্ধনসৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

৪. 'সংবাদবিদ্যা', পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১০।

৫. 'সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা', সুজিত রায়, দে পাবলিকেশনস, ২০২৪।

একক -৫ ❑ সংবাদের ভাষা

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ সংবাদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা

৫.৪ সংবাদের ভাষার উপাদান সমূহ

৫.৫ সম্প্রচারের ভাষা

৫.৬ সংবাদ অনুবাদ

৫.৭ সারাংশ

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৯ সহায়ক গ্রন্থ

৫.১ উদ্দেশ্য

সংবাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, খবর এবং খাবার, বানানের সামান্য ভিন্নতা থাকা এই শব্দ দুটি ব্যবহারিক অর্থও সম্পূর্ণ আলাদা হলেও একটি বিষয়ে মিল আছে। তা হল খবর বা সংবাদও একপ্রকার খাবার। এই খাবার আমাদের মন ও মস্তিষ্কের চাহিদা পূরণ করে।

খাবারের সঙ্গে স্বাদের একটা সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপারে বোধহয় হাতের তালুর মতো পৃথিবীর সব মানুষের পছন্দ ভিন্ন। একই পদ নিয়ে নানাজনের নানা চাহিদা পূরণ করতে হয়। কারও খাবারে ঝাল চলবে না, তো কারও আবার ঠিক উল্টোটা।

বাড়িতে বা হোটেল, রেঁস্তরায় পছন্দসই খাবার পেতে সমস্যা হয় না। কিন্তু আমরা যদি কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে বা পুজোআচ্চার পর পংক্তি ভোজনে বসি, সেখানে কিন্তু সকলের পছন্দ মতো নুন, ঝাল দিয়ে খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। সেখানে পাঁচজনের জন্য একত্রে রান্না হয়। সেটাই সকলে খান। বেশিরভাগেরা তৃপ্তি করেই খান।

এর অর্থ একেবারে নিজের পছন্দের স্বাদ-গন্ধ না মিললেও খাবারের একটা ন্যূনতম মান বজায় থাকলে তা সকলের কাছেই গ্রহণযোহ্য হয়। সংবাদের ভাষা অনেকটা সেই রকম। অর্থাৎ ভাষা সেখানে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যা সব পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার কাছে বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়। স্বভাবতই সংবাদের

ভাষা আর পাঁচটা প্রচলিত ভাষারীতির থেকে আলাদা। তা যেমন সাধু ভাষা নয়, আবার পুরোপুরি চলিতও নয়। সংবাদের ভাষা আসলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সংবাদকে বোধগম্য করে তোলার ভাষা।

৫.২ প্রস্তাবনা

এই একটি পাঠের মাধ্যমে সংবাদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সংবাদের ভাষার সঙ্গে কথ্য এবং সাহিত্যের ভাষার ফারাক কোথায় এবং কেন তা জরুরি সেই দিকটিও স্পষ্ট হবে। সংবাদের ভাষা আবার তার এক একটি মাধ্যমের জন্য আলাদা। সেই ফারাক রক্ষা কেন জরুরি, কীভাবে সংবাদের ভাষার ক্রম পরিবর্তন হয়েছে, এই সব বিষয়গুলি এই একক থেকে জানা যাবে, যা সংবাদমাধ্যমের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাঠক-শ্রোতা-দশর্কের সঙ্গে একাত্মতা রক্ষার জন্য তা জরুরি।

৫.৩ সংবাদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা

এই বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে ভাষা নিয়ে খানিক চর্চা জরুরি। সভ্যতার বিকাশে ভাষা একটি প্রবাহমান নদীর মতো; প্রকৃতির বিধানে যার গতিমুখ পরিবর্তন হয়েছে। কখনও মানুষ তার সুবিধার্থে নদীর প্রবাহ ধারা বদলে নিয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে এর পরিণতি দু' প্রকার। বহু ভাষা সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে অকার্যকর অথবা হারিয়ে গিয়েছে। সময়ের সরণিতে বহু ভাষা আবার জাতির পরিচয় বহনকারী হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে ভাষা অত্যন্ত নমনীয় বস্তু। মানুষ তার মতো করে ভাষাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে। আমরা প্রতিদিন এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি যা কোনও লেখক, কবি, সাহিত্যিকের সৃষ্ট নয়। একেবারে সাধারণ কোনও মানুষ তা প্রথম ব্যবহার করেছিল কিছু একটা বোঝাতে। ভাষার সংজ্ঞাতেও বলা হয়েছে, এটি হল মনের কথা বা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রাসঙ্গিক। তিনি তিনটি পত্রিকা ব্রহ্মবাদিন (১৮৯৫), প্রবুদ্ধ ভারত (১৮৯৬) এবং উদ্বোধন (১৮৯৯) পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'ভাষাকে করতে হবেযেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর। আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়, দাঁত পড়ে না।'

মানুষ কিছু বোঝাতে চাইলে অনেক বক্তব্য সে ঈশরায় বা কোনও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকে। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রে সেই ঈশারা বা প্রতীকি কথাকেও আক্ষরিক ভাষায় বোঝাতে হবে। অর্থাৎ উপযুক্ত শব্দ প্রয়োজন।

আমরা সাধু ও চলিত, এই দুই প্রকার ভাষারীতির কথা জানি। আর শব্দের ক্ষেত্রে তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশজ এবং বিদেশি শব্দ আছে। বহু বিদেশি শব্দের বাংলা অর্থ আলাদা। 'খুন' শব্দটি আরবি। এটির আরবি এবং হিন্দি, উর্দুতে অর্থ হল রক্ত। বাংলায় আমরা হত্যা অর্থে 'খুন' শব্দটি ব্যবহার করি। সংবাদে ভাষার এই ব্যবহার বিধি খেয়াল রাখতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা নেই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে; কবি বলেন: কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম যার মাধুর্য্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে। চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।' (বাংলাভাষা পরিচয়-বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা)।

সময়ের দাবি মেনে সাধু ভাষা বিদায় নিয়েছে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছিল ভাষায় সাধু রীতিকে অনুসরণ করে। সেটাই হয়তো সময়ের দাবি ছিল। কিন্তু কথ্য ভাষার সঙ্গে তার আমূল ফারাক সত্ত্বেও বহু বছর সাধু রীতি বজায় রাখার পিছনে সমাজবিদদের মধ্যে এমন ভাবনা কাজ করে থাকবে যে সাহিত্য ও সংবাদপত্র সকলের জন্য নয়। ২০২২ সালে শর্তবর্ষ পূর্ণ করা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রায় অর্ধেক সময় সাধু ভাষায় লেখার চল ছিল। গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে চলিত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। ব্যতিক্রম ছিল সংবাদপত্রটির চার নম্বর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুটি সম্পাদকীয়। সাধু ভাষাকে পুরোপুরি ইতিহাসের প্রকোষ্ঠে না পাঠিয়ে সেটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ দুটিতে চালু রাখার পিছনে একাধিক কারণ ছিল। তারমধ্যে অন্যতম হল, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যোগসূত্রটি ধরে রাখা। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, তিরস্কারকে ধারালো করার জন্য সাধু ভাষার ব্যবহার অনেক বেশি কার্যকর প্রতিভাত হয়েছে। তাছাড়া, সংবাদপত্রের নানা ধরনের লেখাপত্রের মধ্যে পাঠকের জন্য সাধু ভাষা রীতিতে লেখা সম্পাদকীয় দুটি ভিন্ন স্বাদও দিত। তবে শতবর্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় থেকেও সাধু ভাষার প্রয়োগ থামিয়ে দিয়েছে।

এখন আসা যাক চলিত ভাষার প্রসঙ্গে। এটা আসলে কোনও একটি ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক এলাকার মানুষের কথ্য ভাষা। সংবাদপত্রে সাধু ভাষার প্রাবল্য নিয়ে একটা সময় কথা শুরু হল, মানুষ

যে ভাষায় কথা বলে, সংবাদপত্র তথা সংবাদমাধ্যমে যদি তার প্রতিফলন না ঘটে তাহলে খবরের কাগজকে কীভাবে সমাজের দর্পণ বলা চলে। তাছাড়া চলিত বা চালু ভাষায় খবর লেখাতে যখন কোনও বাধা নেই তখন কেন তৎসম শব্দ বহুল সাধু ভাষাকে বয়ে বেড়ানো হবে।

এই বিতর্কের মীমাংসা হয় সংবাদমাধ্যমে চলিত ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। যদিও খেয়াল রাখতে হবে, সংবাদপত্রের ভাষার সবটা চলিত বা কথ্য ভাষা নয়। সেটা সম্ভবও নয়। কারণ একই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের শহর ও গ্রামাঞ্চলের ভাষায় অনেক ফারাক আছে। দু জায়গাতেই স্থানীয় ভাষার প্রাবল্য কথ্য ভাষায় বেশ টের পাওয়া যায়, যা সংবাদপত্র তথা সংবাদমাধ্যমের ব্যবহার করা হলে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। যেমন, সীমান্তের দুই পারেই গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, 'আমি অর ভাত খামু না।' সাধারণভাবে মনে হবে, স্বামীকে উদ্দেশ্য করে স্ত্রী বলছেন, আমি ওর দেওয়া ভাত খাব না। প্রকৃত অর্থ কিন্তু তা নয়। 'আমি অর ভাত খামু না' অর্থ হল, আমি ওর সঙ্গে আর ঘর বা সংসার করতে চাই না। সংবাদমাধ্যমে এই জাতীয় আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে নিশ্চয়ই কারও মুখের কথা হিসাবে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু সাংবাদিক নিজে কোনও খবরে 'সংসার করব না' বোঝাতে 'ভাত খামু না' কথাটি ব্যবহার করতে পারেন না।

আঞ্চলিক শব্দের মতোই স্থানীয় উচ্চারণ রীতি এড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে একটি সর্বজনীয় উচ্চারণ ও বানান বিধি অনুসরণ করতে হয়। যেমন বাংলাদেশে বরিশালবাসীদের অনেকে বরিশালিয়া বলে থাকেন। আবার বরিশালবাসীরা নিজেদের বলেন, বৈশশালয়া। পশ্চিমবঙ্গে গোপালকে গোপলা, ভূপালকে ভূপলা গণেশকে গণশা বলার চল আছে। সংবাদের ভাষায় এই সব শব্দ কারও উদ্ধৃতিতে ব্যহহার করা যেতে পারে। সাংবাদিক নিজের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বরিশালিয়া বা গোপলা, কোনওটাই ব্যবহার করতে পারবেন না। আমরা যে শাক-সবজি, মাছ ইত্যাদি খাই সেগুলির বেশিরভাগেরই আঞ্চলিক নাম আছে। যেমন কুমড়ো। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার মানুষ কুমড়োকে ডিঙলি, ডিঙলা ইত্যাদি বলা হয়। খবরে কিন্তু কুমড়োই লিখতে হবে।

৫.৪ সংবাদের ভাষার উপাদান সমূহ

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সংবাদের ভাষা সাহিত্যের ভাষা নয়। যদিও একথাও মনে রাখা দরকার, এই ব্যাপারে চরম কোনও বিরোধ নেই। সংবাদমাধ্যমে খবরের ভাণ্ডারে বৈচিত্র রক্ষায় সাহিত্যধর্মী ভাষার প্রয়োজন আছে বৈকি। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘস্থায়ী দাগ কাটা, পাঠকের মনোজগতে জায়গা দখল, পাঠককে খানিক বিনোদন, আমোদ, শোক-সন্তপ্ত করে তোলার বিষয় থাকে। সেখানে সংবাদে প্রত্যাশিত হল বোধগম্য দ্রুত পাঠ। রয়ে সয়ে পড়ায় অবকাশ কম। এখনকার ব্যস্ত জীবনে তো খবরের কাগজ পড়া, রেডিও, টিভির খবর শুনতে আলাদা করে সময় বের করা কঠিন। আর পাঁচটা কাজের ফাঁকে মানুষ সংবাদপত্র পড়ে, টিভি দেখে, রেডিও শোনে।

আর একটি দিক হল, সাহিত্যের ভাষা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে পাঠক, শ্রোতার ফারাক আছে। সব সাহিত্য সকলের জন্য নয়। এই ক্ষেত্রে পাঠক, শ্রোতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের একটা প্রভাব কাজ করে। সেখানে সংবাদের ভাষাকে হতে হয় সর্বজনীন। তা পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষ। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য আলাদা খবর কাগজ প্রকাশিত হয় না। মনে রাখতে হবে ভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয় বহন করে। বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পিছনে বিশেষ ভূমিকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন। বাংলার ক্ষেত্রে বলা চলে সাহিত্য নয়, ভাষা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে সংবাদপত্র চালু হওয়ার পর। ১৮১৮ সালের মে মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম বাংলা কাগজ বাঙ্গাল গেজেট। সেখানেই থেমে থাকেনি, দিকদর্শনের মতো একের পর এক নতুন খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলির ভাষা ধীরে ধীরে সাহিত্যের থেকে ভিন্ন হতে শুরু করে পাঠকের চাহিদা বিবেচনায় রেখে। 'সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ভাষাবিদ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' রচনায় এই সংক্রান্ত অংশটির উল্লেখ করেছেন।

সুকুমার সেন লিখেছেন, 'সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা সাময়িকপত্র বাঙ্গালা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া ইহাকে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণের উপভোগ্য রসসৃষ্টির বাহন করিয়া তোলে।' আনিসুজ্জামানের কথায়, 'এ সামান্য কথা নয়। ১৮০১ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা বই যা সাধন করতে পারেনি, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্র তা পেরেছিল।' (উদ্ধৃতিতে পুরনো বানান বিধি অক্ষত রাখা হয়েছে)

আলোচনাকে বিবেচনায় রেখে খবরের কয়েকটি উপাদান চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল১. সরল ভাষ্য। ২. পরিমিত শব্দ সংখ্যা। ৩. লেখার প্রাতিষ্ঠানিক বিধি।

১. সরল ভাষ্য :

'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় গুপী-বাঘার গাওয়া (কণ্ঠ-অনুপ ঘোষাল) গানের সেই লাইনগুলি নিশ্চয়ই মনে আছে। যে গানের দুটি লাইন হল, 'ভাষা এমন কথা বলে বোঝে রে সকলে।। উঁচা-নিচা ছোট বড় সমান।।' সাংবাদিকতায় ভাষার প্রয়োগ কেমন হওয়া দরকার তা যেন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার এই লাইনগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। লিখা কিংবা ভাষ্য যাই হোক না কেন শব্দের ব্যবহার হতে হবে সর্বজনীন।

সাংবাদিকতার সব মাধ্যমেই শব্দের ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরেণ্য সাংবাদিক বরণ সেনগুপ্ত বলতেন, খবরের ভাষা এমন হতে হবে যাতে বাড়ির কাজের মহিলা যিনি হয়তো ক্লাস ফোর পাশ, কিংবা স্কুলেই যাননি কোনও দিন তিনিও যেন ক্লান্ত দুপুরে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে তৃপ্তি পান। তিনি তাই বলতেন, সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে, খবরের কাগজ পাণ্ডিত্য ফলানোর জায়গা নয়। অনেকেই এই ভুলটা করে বসেন। নিজের জ্ঞান ফলাতে এমনভাবে খবর লেখেন, যে বেশিরভাগ মানুষের

তা মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এটা করা যাবে না। সাংবাদিককে লেখার সেই কৌশল আয়ত্ব করতে হবে যাতে খবরটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পদস্থ চাকুরিজীবী, গৃহবধূ থেকে বাজারে আলু-পটল-মাছ বিক্রেতা, সকলে পড়ে বুঝতে পারেন।

খবরে ভাষার এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হলে অবশ্যই প্রচলিত, পরিচিত শব্দ ব্যবহার জরুরি। এমন নয় যে সেই শব্দগুলি পাঠক-শ্রোতা-দর্শক নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। এমন অসংখ্য শব্দ আছে যা আমরা কথা বলার সময় ব্যবহার করি না; কিন্তু লেখাপত্রে, কারও মুখে শোনার ফলে সেগুলির সঙ্গে পরিচয় আছে। তারমানে পূর্ব শর্ত হল অপরিচিত শব্দ তা যতই বিশেষ অর্থবহ কিংবা শ্রুতিমধুর হোক না কেন, ব্যবহার করা যাবে না। যেমন শ্লাঘা শব্দটি। প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, দুই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। একটা সময় পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রায়শই শব্দটির ব্যবহার দেখা যেত। বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত এই বাংলা দৈনিক কিন্তু বিগত এক দশক যাবৎ ভাষার ক্ষেত্রে নতুন পথে চলার চেষ্টা শুরু করেছে। খবরের ভাষাকে তারা যথাসম্ভব সাধারণের ভাষা করার প্রয়াস চালাচ্ছে। এই ভাবনার পিছনে যদিও বাণিজ্যিক কারণই মূল চালিকা শক্তি। কারণ, রাজ্যে, দেশে সাক্ষরতা, শিক্ষার হার বেড়েছে। অন্যদিকে, অন্য অনেক পণ্যের তুলনায় খবরের কাগজের দাম বেশ কম। ঘন ঘন দাম বাড়ে না। বরং খবরের কাগজ একমাত্র পণ্য যার দাম বাড়ানো হলে কর্তৃপক্ষ সে জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। আরও একটি কারণ হল, গ্রাম ও শহরের দূরত্ব এখন অনেকটা ঘুঁচে গিয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও সকাল সকাল খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়েছে রাস্তাঘাট তৈরির ফলে। গ্রাম-মফস্বলের নতুন পাঠক তৈরি, তাদের ধরে রাখার জন্যও ভাষায় সারল্য রক্ষা আরও বেশি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তাই 'শ্লাঘা বোধ'-এর মতো শব্দের ব্যবহার এখন আর আনন্দবাজারের খবরে দেখা যায় না। 'মায়াকান্না'-র মতো গভীর অর্থবহ অথচ সহজ বানান ও উচ্চারণের শব্দ থাকতে 'কুম্ভীরাশ্রু' শব্দটি সংবাদে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

খবরের কাগজে, রেডিও, টিভির খবরে প্রায়ই দেখা যায়, কানে আসে, 'বাজারে নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধগামী'। কখনও ঊর্ধমুখীও লেখা হয়ে থাকে। কথাটি খুব সহজ করে লেখা যেত, 'বাজারে রোজকার জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে'। মাঝখানে বড়জোর 'প্রয়োজনীয়' শব্দটি জিনিসপত্রের আগে ব্যবহার করা যেত। রোজকার শব্দটির মধ্যেই ধরা আছে নিত্য প্রয়োজনের বিষয়টি। 'ঊর্ধমুখী' শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত নির্বিশেষে মানুষ খুব কমই ব্যবহার করে থাকে। কথা বলার সময় আমরা কিন্তু বলি না 'রোজই গরম ঊর্ধমুখী'। বলি, 'রোজই গরম বাড়ছে।' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'কেমন লিখব, কেমন বলব' নিবন্ধে বলেছেন, 'খবরের কাগজে দেখলামএকটা পাড়ায় আগুন লেগেছে। প্রতিবেশী পাড়ার লোকজন এসে আগুন নেভায়। দমকল তখনও আসেনি।' এরপর তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'এখানে প্রতিবেশী পাড়া কেন লিখব? কথাটা হবে পাশের পাড়া থেকে লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। আমি বুঝতে পারছি, neighbouring area থেকে অনুবাদ করে 'প্রতিবেশী পাড়া' করা হয়েছে। আর এক জায়গায় দেখলাম, "স্বাধীনতা তখন 'করমর্দনের দূরত্বে'। কেন করমর্দনের পরিবর্তে 'হাতের নাগালে' বললে কী হয়।'

সহজ ভাষ্য আরও পূর্ণতা পায় সরল বাক্য গঠনের ফলে। ছোট ও সরল বাক্য সংবাদের যে কোনও মাধ্যমের জন্যই প্রাক শর্ত। ক্রিয়াপদের ব্যবহার সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। তৎসম ও তদ্ভব, দেশজ, বিদেশি ইত্যাদি নানা প্রকাশের শব্দ আছে। তৎসম শব্দ

২. পরিমিত শব্দ সংখ্যা :

'খবরের মাপ' বলে একটা কথা সংবাদমাধ্যমে চালু আছে। এই মাপ আসলে শব্দ সংখ্যা দিয়ে নিরুপণ করা হয়। কোন খবর কত শব্দের হবে সেটা অবশ্যই বিষয়ের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। তার অর্থ এই নয়, খবরকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য শব্দ সংখ্যা একটি মানদণ্ড। অবশ্যই নয়। এখানেও খাবার ও খবরের একটি সাদৃশ্য আছে। তা হল, পরিমিত আহার যেমন স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি, তেমনই খবরকে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনোগ্রামী করে তুলতে দরকার পরিমিত শব্দের ব্যবহার। সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন কিছু সাংবাদিককে বড় লেখা ছেঁটে ছোট করতে হয়। আবার উল্টোও করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কেউ কোনও একটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে পাঁচশো শব্দ লিখলেন। আর একজন একই পরিমাণ তথ্য-পরিসংখ্যান এবং বর্ণনা লিখলেন আড়াইশো শব্দে। এখানে ভাষা বা শব্দ ব্যবহারে মুন্সিয়ানা রক্ষা করতে হয়।

শব্দের পরিমিত ব্যবহার দুটি কারণে জরুরি। এক. মানুষের দীর্ঘ লেখা পড়ার অবকাশ নেই। দুই. খবর গল্প, উপন্যাস, এমনকী ছোট গল্পও নয়। চট করে পড়ে ফেলা যায়, এমন পরিমিত সংখ্যায় শব্দ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক বিধি :

প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে লেখার শৈলি এবং বানানের পৃথক বিধি আছে। সংবাদমাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি কর্মরত থাকেন। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা জীবন সকলের এক রকম নয়। স্বভাবতই একটি বিধিই পারে প্রতিটি প্রতিবেদনকে নিখুঁত এবং সমমানের করে তুলতে। যে কারণে একটি খবরের কাগজের প্রতিটি খবর পড়ে মনে হয় সেগুলি একজনই লিখেছেন।

যদিও প্রাতিষ্ঠানিক বিধি নিয়ে বিতর্ক আছে। বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের পৃথক বানান বিধির সঙ্গে অনেকেই সহমত নন। কারণ, শিক্ষার্থীরাও নিয়মিত খবরের কাগজ পাঠ করে। সেখান থেকে তারা বানান শেখে। আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন-এর বানান বিধি আলাদা। যদিও সবগুলিই হয়তো ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ। সংবাদমাধ্যম যেহেতু মানুষের নিত্যসঙ্গী তাই, অভিন্ন বানান বিধিই যথাযথ হত। দুর্ভাগ্যের হল, তা হয়নি। আনন্দবাজার বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন বানান বিধি অনুসরণ করে।

যেমন, 'এই সময়' কাগজে 'গরু'-কে লেখা হয় 'গোরু'। ইংরিজি 'Police' কথাটি খবরের কাগজে 'পুলিশ' এবং 'পুলিস' দুই-ই লেখা হয়। Police-এর মতোই Force শব্দটির শেষেও ত্বত্র আছে। কিন্তু বাংলায় লেখা হয় ফোর্স। এটির ক্ষেত্রে ফোর্শ লেখা হয় না।

সাহিত্যের পাশাপাশি সংবাদের ভাষাতেও যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। যেমন, একই কথা যতিচিহ্নের ব্যবহারে অর্থ বদলে যান। 'আপনি বলবেন', 'আপনি বলবেন!', 'আপনি

বলবেন?'—তিন রকম অর্থ বোঝায়। খবরের ক্ষেত্রে অর্থ উপযোগী যতিচিহ্নের ব্যবহার না করলে অর্থ বদলে গিয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

একই কথাটির বানান বিভেদে অর্থ বদলের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়। 'আপনি কি খাবেন?', 'আপনি কী খাবেন?' লাইন দুটির অর্থ বদলে দিয়েছে ই-কার এবং ঈ-কার ব্যবহারের মাধ্যমে। প্রশ্নবোধক কথায় উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' বাচক হলে 'কি' লিখতে হবে। অন্যক্ষেত্রে হবে 'কী'।

সংবাদের ভাষায় আরও কয়েকটি দিক খেয়াল রাখতে হয়। ইংরিজিকে নামের আগে মিঃ, মিসেস লেখার চল আছে। বাংলায় একটা সময় শ্রী, শ্রীমতি লেখার চল ছিল। প্রয়াত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্রী, শ্রীমতী লেখা হত না। এখন কোনও ক্ষেত্রেই লেখা হয় না। এছাড়া ইনি, উনি, সে, তিনি ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগগত ফারাক আছে। অপরাধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদমাধ্যম এখনও তিনি, আপনি প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে না। তবে একটা ভাল দিক হল জাত-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে খবরে সকলকে সম্মান জ্ঞাপন নিশ্চিত করা গিয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদনে তুমি, তুই লেখার চল ছিল।

৫.৫ সম্প্রচারের ভাষা

বানানে উচ্চারণ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যতদিন যাচ্ছে বাংলা বানানে ই-কারের ব্যবহার বাড়ছে। ঈ-কারের ব্যবহার কমছে। তবে সেটা খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রেডিও ও টেলিভিশনের মতো সম্প্রচার মাধ্যম, যেখানে মূলত কানে শোনার

জন্য লিখতে হয়, সেখানে বানানে আপস চলে না। 'র' এবং 'ড়'-এর উচ্চারণের ফারাক রক্ষা জরুরি। বারি (জল) এবং বাড়ি (বাসস্থান)-র উচ্চারণের ফারাক না থাকলে শ্রোতা অর্থ গুলিয়ে ফেলবে।

সম্প্রচারের জন্য লেখালেখির ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণদুই-ই বিশেষ জরুরি কারণ সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রের থেকে এই দুই মাধ্যমের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'তথ্যপ্রচারে আকাশবাণীর দায়দায়িত্ব প্রসঙ্গে: কয়েকটি চিঠি আর দুটি সম্ভাষণ' শীর্ষক নিবন্ধে তাঁর বাবার লেখা একটি চিঠির অংশ উদ্বৃত করেছেন'শিক্ষক-অধ্যাপকেরা ভুল শেখালে অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু আকাশবাণী ভুল প্রচার করলে নানা কারণেই বহু লোক বিভ্রান্ত হয়।'

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথায়, সম্প্রচারকের প্রধান কাজ হল, * যত বেশি সম্ভব বেশি লোকের কাছে পৌঁছানো। * তাই তাঁর ভাষা এমন হওয়া উচিত, যেটা খুব বেশিসংখ্যক লোক বুঝতে পারে। * মান্য চলিত বাংলাকে তিনি যতটা সম্ভব কথ্য ভাষার কাছাকাছি রাখবেন। কিন্তু তাকে তিনি কখনই কথ্য ভাষা করে তুলবেন না। * তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন আভাস তিনি দেবেন না, যাতে তিনি যে ঘটনার কথা বলছেন তার বিরোধী অথবা সমার্থক বলে তাঁকে মনে হয়। তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতে কোনও পক্ষপাতের ছায়া যেন না পড়ে। (সম্প্রচারের ভাষা নানা প্রসঙ্গ, ভবেশ দাশ, পরম্পরা)

দীর্ঘদিন আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেছেন সম্প্রচার-সাংবাদিক ভবেশ দাশ। তাঁর কথায়, 'রেডিয়ো-টেলিভিশনের লেখায় উঠে আসতে হবে বলার ভাষা, শোনার ভাষা। এখানেই সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে রেডিয়ো-টেলিভিশনের পার্থক্য। একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের মধ্যেও ভাষার তফাত আছে। একটি ক্ষেত্রে বক্তা অন্তরালবর্তী, আরেকটি ক্ষেত্রে বক্তা সামনে হাজির। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে শুধু মুখের ভাষা নয়, দৈহিক ভাষাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে মুখের ভাষা, দৈহিক ভাষার ইঙ্গিত মিলিয়ে তখন একটিই ভাষা।' এর সঙ্গে চলমান ছবি বা ভিডিও আলাদা মাত্রা যোগ করে।

সম্প্রচার সাংবাদিকতায় উচ্চারণও এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। উচ্চারণ বিকৃতি শ্রোতাকে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত করে। অনেক শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ সম্প্রচারে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, আমরা বেচারা লিখি। অনেকে উচ্চারণ করে থাকেন ব্যাচারা। রেডিও, টিভিতে কিন্তু বেচারা উচ্চারণ করতে হবে। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে আমরা রেডিও, টেলিভিশনের স্ক্রিপ্টের বানানও বদলে যায়। যেমন আমরা লিখি 'কলকাতা'। রেডিও-র স্ক্রিপ্টে লেখা হয় 'কোলকাতা'।

রেডিও, টেলিভিশনের খবরের ক্ষেত্রে আরও একটি জরুরি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। তা হল পরিসংখ্যান। সংবাদপত্রের খবরে আমরা বড় কোনও সংখ্যা লিখতে পারি। যেমন লেখা হল সরকারের অমুক দফতরের বাজেট এবার ৮৬ কোটি ৪৯ লাখ ৭৬ হাজার ৩৬২। এতবড় একটি পরিসংখ্যান রেডিও বা টেলিভিশনের খবরে পাঠ করলে শ্রোতা, দর্শক সেটা আয়ত্ব করতে পারবেন না। সে জন্য জরুরি পরিসংখ্যানটি পুরোটা না বলে শুরুতে প্রায় যোগ করে দেওয়া। যেমন বলা হল, প্রায় ৮৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। প্রায় শব্দটি যোগ করা সর্বদা বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, অপরিহার্য না হলে পরিসংখ্যানের ব্যবহার যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। প্রচলিত ভাষার ব্যবহার সম্প্রচারের খবরের ক্ষেত্রে আরও বেশি জরুরি। কারণ, খবর মানুষ কানে শুনবেন। খবরের কাগজের ক্ষেত্রে কোনও শব্দ বা বাক্য বোধগম্য না হলে অর্থ জেনে নেওয়া সম্ভব। রেডিও বা টিভির খবর যেহেতু মুহূর্তের মধ্যে প্রচারিত হয় তাই এমন শব্দ ব্যবহার অনুচিত যা শ্রোতার কানে খটমট শোনাবে।

৫.৬ সংবাদ অনুবাদ

আগের অনুচ্ছেদে এজেন্সির খবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ এজেন্সিগুলি মূলত ইংরিজি ও হিন্দিতে খবর সরবরাহ করে থাকে। সেগুলিকে প্রয়োজন মতো আঞ্চলিক ভাষায় তর্জমা করে নিয়ে হয়। খবর ছাড়াও বহু নিবন্ধ লেখক ইংরিজিতে লিখে পাঠান। তাঁদের লেখাগুলিই কাগজের নিজস্ব ভাষা অনুযায়ী অনুবাদ করে নিতে হয়। আজকাল নিবন্ধ লেখকদের সিন্ডিকেট আছে। নামী সাংবাদিক, রাজনীতিক, নিবন্ধকার সিন্ডিকেটকে লেখা দেন। সিন্ডিকেট সেটি নানা

ভাষায় ছাপার ব্যবস্থা করে। বলা চলে এটিও এক ধরনের এজেন্সি। কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম, শশী তারুর, সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিক ও সাংবাদিক সেশাদ্রি চারি নিয়মিত কলম লেখেন। তাঁদের লেখা একাধিক ভারতীয় ভাষায় ছাপা হয়। স্বভাবতই অনুবাদ সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ, লেখক ইংরিজি বা হিন্দিতে লিখে যে কথা বোঝাতে চেয়েছেন তার প্রতিফলন থাকা চাই অন্য ভাষায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে।

এই ব্যাপারে ফের কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মরণ নেওয়া যাক। তিনি 'কেমন লিখব, কেমন বলব' নিবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি যখন নিউজে কাজ করতাম, মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় যে বক্তৃতা দিতেন তা অনুবাদের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি হিমশিম খেয়ে যেতাম। তার কারণ, মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজি এমনি শুনতে খুব সহজ সরল, কিন্তু আমার মনে হতো অনেক কথাই দ্ব্যর্থবোধক। আমার যে অর্থ মনে হচ্ছে তা হয়তো নাও হতে পারে। অমূল্যচন্দ্র সেন (ভাষাবিদ) আমায় বলেছিলেন, আগে একটা sentence-এর মানে কী তা বুঝে নাও। ওই sentence-টায় কী বলা হচ্ছে তা দেখে নাও। তারপর নিজের মনে ভাবো যে এই বক্তব্যটা বাংলায় জানাতে হলে তুমি কীভাবে জানাবে। তারপর সেটাই লেখো।'

উপরের কথাগুলির অর্থ, অনুবাদ মানে ইংরিজি অক্ষরগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে নতুন বাক্য রচনা নয়। ভাবটা তুলে ধরা আসল। অনেক সময় খুব সাধারণ অনুবাদেও বড় ধরনের ভুল হয়ে থাকে। যেমন এই লাইনটি Recruitment to the post of Constables in Bihar Police। একজন ভুল করে অনুবাদ করেছিলেন, বিহার পুলিশের ভিতর কিছু কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। প্রকৃত অনুবাদ হবে, বিহার পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগ করবে। এটা খুবই সাধারণ ভুলের নমুনা। বড় ধরনের ভুল হয় বিশেষ অর্থবহ শব্দ অর্থাৎ idiom এবং Phrase বা একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের বিশেষ অর্থবহ অংশ নিয়ে।

ইংরিজিতে মিশ্র বাক্যের ব্যবহার বেশি। বাংলায় অনুবাদের সময় বাক্য ছোট করাই উচিত। ইংরিজির মতো বাংলাতেও যতটা সম্ভব Active voice-এ লেখা উচিত। ইংরিজিতে প্রথমে কর্তা, তারপর ক্রিয়া এবং সবশেষে ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করা হয়। বাংলায় সবশেষে বসে ক্রিয়াবিশেষণ, মাঝে বসে ক্রিয়াপদ এবং শুরুতে যথারীতি কর্তা।

৫.৭ সারাংশ

সংবাদে ভাষাই আসল। কারণ, সংবাদ যিনি রচনা করেন আর যিনি পড়েন বা শোনেন, তাদের মধ্য মুখোমুখি খবর বিনিময় হয় না। বস্তুত কেউ কাউকে চেনেন না। ভাষাই দু-পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি করে। ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া খবর অর্থহীন। তাই সাংবাদিকের ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত জরুরি। তাই বলে ভাষাবিদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সকলের বোধগম্য করে লেখার মুন্সিয়ানা রপ্ত করতে হয় একজন সাংবাদিককে। সেটা কঠিন এবং সহজ, কোনওটাই নয়।

দরকার হল, ভাষা নিয়ে উপলব্ধি। তাহল, উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মনোজগতে জায়গা করে নেওয়া।

৫.৮ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. সংবাদের ভাষার বিশেষ দিকগুলি কী কী?

২. সংবাদে ভাষার গুরুত্বগুলি ব্যাখ্যা কর

৩. সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্প্রচারের ভাষার ফারাক কী কী?

৪. সংবাদ অনুবাদের মৌলিক সূত্রটি কী?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

টীকা লিখুন :

১. ভাষা

২. কথ্য ভাষা

৩. চলিত ভাষা

৪. সংবাদের ভাষা

৫. সম্প্রচারের ভাষা

৬. খবরের কাগজের ভাষা

৫.৯ সহায়ক গ্রন্থ

১. 'নিউজ রিপোর্টিং অ্যান্ড এডিটিং', কে এম শ্রীবাস্তব, স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

২. 'সংবাদ সম্পাদনা', সৌরিণ ব্যানার্জি (পরিমার্জন ও পরিবর্ধনসৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

৩. 'সংবাদবিদ্যা', পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১০।

৪. 'সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা', সুজিত রায়, দে পাবলিকেশনস, ২০২৪।

৫. 'সম্প্রচারের ভাষা প্রসঙ্গ', ভবেশ দাশ সম্পাদিত, পরম্পরা, ২০২৩।

৬. 'পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা', তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সংকলন, ২০১৩।

মডিউল ৩ : জনমানসে বিজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতার প্রভাব

একক ৬ ❑ জনমানসে বিজ্ঞাপন ও সংবাদপত্রের প্রভাব

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক প্রভাব

৬.৪ বিজ্ঞাপনের নেতিবাচক প্রভাব

৬.৪.১ ভোগবাদীমানসিকতা

৬.৪.২ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

৬.৪.৩ পণ্যায়িত করার কৌশল

৬.৪.৪ বিজ্ঞাপন ও বাস্তবের পার্থক্য

৬.৫ বিজ্ঞাপনের আইনি নীতি

৬.৬ সারাংশ

৬.৭ অনুশীলনী

৬.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৬.১ উদ্দেশ্য

জনমানসে বিজ্ঞাপনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রভাবকে দুভাবে ভাগ করা হয়। একটি হল ইতিবাচক প্রভাব, আরেকটি হল নেতিবাচক প্রভাব। এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা জনমানসে বিজ্ঞাপনের উভয়বিধ প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। বিজ্ঞাপনের নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে কীভাবে ইতিবাচক অর্থে প্রভাবিত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে তাদের মনে। কোন্ কোন্ আইনি নীতি বিজ্ঞাপনী প্রভাববের ক্ষেদ্ত্রতত্র কার্যকর—সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার সহায়ক হয়ে উঠবে এই এককটি।

৬.২ প্রস্তাবনা

বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব যেমন, ভোগবাদী মানসিকতার উন্মেষ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, পণ্যায়িত করার কৌশল, বাস্তব

ও বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি কোথাও ও কেন আলাদা, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নানাবিধ আইনি নীতির উপএককে বর্তমান এককটি অবস্থিত।

৬.৩ বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক প্রভাব

মানুষকে বিশেষভাবে যা জ্ঞাপন করে, তাই হল বিজ্ঞাপন বা advertisement। কী জ্ঞাপন করার হচ্ছে এবং কীভাবে তা জ্ঞাপিত হচ্ছে, একটি বিজ্ঞাপনের সাফল্য তার ওপরেই নির্ভর করে। ফলে বিজ্ঞাপনের সামাজিক প্রভাব অনিবার্য। এই প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দ্বিমুখী—ইতিবাচক এবং নেতিবাচক।

বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক প্রভাবগুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা যাক—

১. বিজ্ঞাপন মানুষকে বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করে। পণ্যের সেই তালিকা অসীম। বিজ্ঞাপনের পাঠ সেই সেই পণ্যসংক্রান্ত সচেতনতা কাজ করে মানুষের মনে—ইতিবাচক সেই সচেতনতাই মানুষকে তখন সেই পণ্যটির উপভোক্তা বা গ্রাহক হিসেবে গড়ে তোলে।

২. একই পণ্যের বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন গ্রাহককে পণ্যটির তুলনামূলক বিচারে সাহায্য করে। তুলনামূলক বিচার শেষেই গ্রাহক না ভোক্তা কোনো বিশেষ কোম্পানির পণ্যটি নির্বাচন করেন। বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত তথ্য সম্পর্কে না জানলে সেই কাজ প্রায় অসম্ভব।

৩. বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য পণ্যটি যাতে উপভোক্তা কেনেন, সেই ব্যবস্থা করা। এইভাবে বিজ্ঞাপন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অর্থনীতির এই লাভজনক ব্যাপ্তির কারণেই দেখা যায়, সমাজে অধিকাংশ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত তারকা তাঁদের নিজেদের কোম্পানি বা ব্র্যাণ্ডের প্রচারে বিশেষ লক্ষ রাখেন।

৪. জনস্বার্থমূলক বিজ্ঞাপনগুলির ক্ষেত্রে মানুষের সঠিক সচেতনতা বৃদ্ধিই একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন, পরিবার ও শিশুকল্যাণ মূলক বিজ্ঞাপন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা, পোলিও টীকাকরণ, অতিমারীর সময়ে কোভিডের প্রকোপ থেকে বাঁচতে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা, ডেঙ্গি প্রতিহতকরণে মানুষের কৃত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। কোনো পণ্য ক্রয়ের পর প্রতারণার শিকার হলে কীভাবে উপভোক্তা দপ্তর বা consumer's forum-এ অভিযোগ জানানো যায়, সেই পন্থাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই গ্রাহক জ্ঞাত হন।

৫. বিজ্ঞাপন দেশের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। বিজ্ঞাপনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রকারান্তরে দক্ষ কর্মচারীর নিয়োগকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৬.৪ বিজ্ঞাপনের নেতিবাচক প্রভাব

বিজ্ঞাপনের ইতিবাচক দিকগুলির পাশে নেতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। অনেকেই মনে করেন,

বিজ্ঞাপনের কাজ কেবল বার্তা প্রদান, অর্থাৎ কোনো পণ্য সংক্রান্ত তথ্যই দেয় বিজ্ঞাপন। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে, বিজ্ঞাপন আসলে উপভোক্তার মনকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি ফ্ল্যাট ভাড়ার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে যদি লেখা হয়, 'দোতলার ফ্ল্যাট, দক্ষিণ খোলা, তিন কামরা, দুটি বারান্দা, রান্নাঘর এবং দুটি বাথরুম আছে' তাহলে বোঝা যাবে, 'দোতলা', 'দক্ষিণ খোলা', 'দুটি বারান্দা' গ্রাহককে প্রভাবিত করছে। যিদিন ফ্ল্যাটের সন্ধানে আছেন, তিনি এই ধরণের ফ্ল্যাট সম্পর্কে অবশ্যই আগ্রহী হবেন। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন এভাবেই ভোক্তাকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞাপণের বিবিধ নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

৬.৪.১ ভোগবাদী মানসিকতা :

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে যেসমস্ত নেতিবাচক দিকগুলি আলোচিত হয়, তার অন্যতম হল, বিজ্ঞাপন মানুষের মনে ভোগবাদের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দেয়। বস্তুবাদ বা ভোগবাদের বীজ প্রোথিত করে মানুষের মনে। একথা অনস্বীকার্য, কোন্‌টি জীবনে প্রয়োজন আর কোন্‌টি বিলাসিতা—তা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য। মানুষের মানসিকতার ওপরেও তা নির্ভর করে। যেমন, দূরদর্শন বা মোবাইল ফোন (চলভাষযন্ত্র) যখন প্রথম আবিষ্কার হয় ও পণ্য হিসেবে বাজারে, প্রচলিত হয়, তখন সেগুলির সমাজের সিংহভাগ মানুষের কাছে আর্থিকভাবে ছিল অধরা। সেগুলি বিলাসিতা হিসেবেই পরিগণিত হত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শন আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর তাকেও পিছনে ফেলে আমাদের বেঁচে থাকার রসদে পরিণত হয়েছে মোবাইল ফোন। ফলে, এককালে যা ভোগবাদ বা বস্তুবাদের সমার্থক ছিল, কালের পরিবর্তনে তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভোগবাদের বা বস্তুবাদের মাপকাঠি কীভাবে স্থির করা হবে? সাধারণভাবে বলা যায়, আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের অতিরিক্ত (excess) যা কিছু, তাই-ই ভোগবাদ বা বস্তুবাদের সমার্থক। কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি সুষ্ঠ করা যায়—

ধরা যাক, এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপণে প্রলোভিত হয়ে নিজের প্রয়োজনানুযায়ী একটি মোবাইল ফোন কিনলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর দেখলেন, তাঁর ফোনের তুলনায় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য (features) সমন্বিত আরও শক্তিশালী কোনো ফোনের বিজ্ঞাপন। সেই মুহূর্তে তাঁর বর্তমান ফোনটিকে 'পুরোনো' বলে মনে হল এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন একটি ফোন তিনি কেনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। অবশেযে কিনেই ফেললেন। এটিই হল ভোগবাদ। অর্থাৎ আমার প্রাত্যহিত প্রয়োজন নিরাশনের জন্য আমার কাছে যা পণ্য আছে, তা সুস্পষ্ট না হয়ে আমি আরও-আরও-আরও বেশি ক্ষমতাশালী পণ্য্য কিনতে উৎসুক। বলাই বাহুল্য, এই 'আরও'-র কোনো হেষ নেই। এটি সীমাহীন। বিজ্ঞাপন মানুষকে এই সীমাহীন ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

পণ্য প্রচারের কৌশল হিসেবে প্রায় সর্বত্রই কোনো জনপ্রিয় তারকাকে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি হয়ে ওঠেন সেই পণ্যটির ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার। এখন, সেই ব্যক্তি যখন কোনো পোশাকের বিজ্ঞাপন করেন, তখন বিজ্ঞাপণী সংস্থা এমনভাবেই সেই বিজ্ঞাপণকে উপস্থাপন করেন যাতে মানুষের মনে, অবশ্যই আর্থিক সঙ্গতিপন্ন মানুষের মনে, সেই বিশেষ কোম্পানির পণ্যটি কেনার আগ্রহ জন্মায়। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব তাদের মনে করিয়ে দেয়, নিজের জীবনে যা হতে পারেননি, একটি বিশেষ কোম্পানির বিশেষ পণ্য ব্যবহার করদ্ধালে ওই পণ্যের ব্র্যাণ্ড অম্পাসাডারের মতো দেখাবে নিজেকে। Larger than life হওয়ার এই বাসনাই ভোগবাদের স্পৃহাকে উদ্‌বোদিত করে তোলে।

আধুনিক জীবনের জীবনের এই সমস্যাকেই চিহ্নিত করেছেন Baker Greyser Raymond তাঁর 'Advertising in America : The Consumer View' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, 'If we regrad as underirable these material value in our society, we must look beyond advertising for change.' ফলে, বিজ্ঞাপনে-মোড়া এই সমসেয় একমাত্র মানুষই তাঁদের যুক্তিশীল চিন্তাভীবত্রনায় নির্ধারণ করতে সক্ষম, কোন্ পণ্যটি তার দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি তার অতিরিক্ত বিলাস। জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে বিলাসের প্রয়েজদ্ধন অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সেই বিলাস যদি সুস্থ মানসিকতাকে অস্থির করে তোলে, ভোগবাদের অনুগত হয়, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানুষকেই।

৬.৪.২ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

বিজ্ঞাপনের কাজ মূলত দ্বিমুখী—বিপণন এবং জ্ঞাপন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত লক্ষ্য বিপণন এবং উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা বাড়ানো। ঠিক এই কারণেই মনে করা হয় যে, শুধু তথ্য জ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য নয়। পিণই একমাত্র লক্ষ্য। তাই সেই লক্ষ্যে স্থির থাকতে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি নৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। তাই অনৈতিক ও অকাঙ্খিত বিষয়ও বিজ্ঞাপণের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিককারণেই মানুষের জীবনশৈলী ও মূল্যবোধের ওপর সেই বিজ্ঞাপন নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাক। তামাকজাত দ্রব্য বা অ্যালকোহলজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রি হয়। মানুষের শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যই ক্ষতিকারক। কিন্তু এই দুই পণ্যই বাজারে সুলভ এবং উভয়ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের সম্ভার অফুরান। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে নৈতিকতার দিকটি আলগোছে পরিবেশন করে কীভাবে? এই ধরনের পণ্যের লেবেলে লেখা থাকে 'Cigaratte Smoking is injurious to health' অর্থাৎ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। লেখা থাকে, 'Drinking alcohol is injurious to health'। মদ্যপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আইনের মধ্যে থেকেই আইন-বিগর্হিত কাণ্ড। বলা হচ্ছে, ধূমপান বা মদ্যপান শারীরিক

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক, অথচ সেই পণ্য-উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে না। বন্ধ থাকছে না তার প্রচার বা বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি ধূমপান বা মদ্যপান করবেন, তিনি তার হানিকারক দিকটি জেনেই করবেন আর সেই নির্দিষ্ট কোম্পানি এই বলে দায় সারবে যে, তারা তো সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করেছে। এইভাবেই নৈতিক দায়িত্ব থেকে চ্যুত হয় বিজ্ঞাপন। ঘটে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, যুবসমাজের সিংহভাগ বিজ্ঞাপিত পণ্যের তুলনায় বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত মডেলকে অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে তারা মনে করে অমুক চিত্রতারকা বা খেলোয়াড় যদি তমুক পণ্যের বিজ্ঞাপন-মুখ হয়ে ওঠেন, তবে সেই চিত্রতারকা বা খেলোয়াড়ের অন্ধ ভক্ত হিসাবে তাদেরও সেই পণ্য কিনতে হবে—সেই পণ্যের প্রয়োজন থাক বা না-থাক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জনপ্রিয় তারকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে-পণ্যের বিজ্ঞাপনে সম্মত হলেন, তিনি বাস্তব জীবনে মোটেই সেই পণ্যের ব্যবহারকারী নন। হয় অন্য কোম্পানি উৎপাদিত সেই পণ্য ব্যবহার করেন—হতে পারে সেই কোম্পানি দেশি কিংবা বিদেশি; নতুবা সেই পণ্যের কোনো উন্নততর সংস্করণের ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত। তাহলে ব্যপারটা কী দাঁড়াল? তিনি নিজে বিজ্ঞাপনীমুখ হয়ে যে-পণ্যের প্রচার করেছেন, সেই পণ্যটির প্রতিই তার নিজের আস্থা নেই; অথচ তিনি সবাইকে সেই পরণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করছেন। কোনো কোনো তারকা এই বিষয়ে সচেতন। যেমন ক্রিকেটতারকা শচীন নিজে MRF কোম্পানির ব্যাট ব্যবহার করতেন এবং সেই কোম্পানির হয়েই বিজ্ঞাপনী প্রচারে সামিল হয়েছিলেন। আবার তিনিই অ্যালকোহল বা তামাকজাত পণ্যের প্রচারে নিজেকে সংযত করেচিলেন এই নৈতিক মূল্যবোধ সকলে কাছে প্রত্যাশিত নয়। তাই এই মূল্যবোধের অপক্ষয়কেই হাতিয়ার করে গড়ে উঠেছে একের পর এক ‘অনৈতিক’ বিজ্ঞাপণ।

বিজ্ঞাপন মানুষের মনে অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষের জন্ম দেয়। রামবাবু হয়তো বাড়িতে বাইশ ইঞ্চির দূরদর্শন সেট আনলেন। শ্যামবাবু বা তাঁর স্ত্রী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বত্রিশ ইঞ্চির দূরদর্শন সেট কিনে ফেললেন। ফলে, আধুনিক মানুষ এখন আর নিজের শর্তে ভালো থাকতে জানে না। তার ভালো-মন্দ-সুখ-অসুখ সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তার প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন। একের উন্নতি অন্যের মাৎসর্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও এর প্রভাব দেখা যায়। একজন গাড়ি dust proof বা ধুলোনিবারক রঙে রঞ্জিত করল; অমনি তার প্রতিবেশীও সেই একই কাজ করতে উৎসাহিত হয়ে উঠল— কোনেপক্ষই ভেবে দেখল না ধুলোনিবারক কোনো রঙের অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। নিজস্ব চিন্তাধারা যখন বিজ্ঞাপন দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন নীতি-মূল্যবোধ বিসর্জনে মানুষ হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপনের হাতে পুতুল বা ক্রীড়নক।

৬.৪.৩ পণ্যায়িত করার কৌশল

বিজ্ঞাপন আমলে কোনো পণ্যকে ‘বিশেষভাবে’ জ্ঞাপন করে। এই জ্ঞাপনকৌশলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পণ্যায়িত করার হরেক পদ্ধতি। কোন্ পদ্ধতিতে একটি পণ্যের প্রচার করলে গ্রাহক

বা উপভোক্তা তা গ্রহণ করবে, বিজ্ঞাপনী স্ট্রাটেজিতে সেটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এইদিকে নজর দিতে গিয়েই বিজ্ঞাপন মানুষের অবচেতনে Brand-এর মহিমা প্রোথিত করে দেয়। একই বিজ্ঞাপণের বারংবার প্রদর্শনে মানুষের মনে সেই বিশেষ ব্র্যাণ্ড এভং পণ্য একাকার হয়ে যায়। তখন অন্য ব্র্যাণ্ডের কমদামি পররা তখন তাকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না। ফলে, মানুষের অজান্তেই তার চাহিতা হয়ে ওঠে ব্র্যান্ডসর্বস্ব। কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা জন্য দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শ্রী রংগন চক্রবর্তীর 'বিষয় বিজ্ঞাপন' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

প্রতিদিন চায়ের সঙ্গে চাই ব্রিটানিয়া মারি বিস্কুট—বিজ্ঞাপনে এই চাহিদাকে বারবার বলে ক্রেতার মনে এই সঠিক চাহিদার সৃষ্টি করতে হবে যে, 'বিস্কুট' মানেই 'ব্রিটানিয়া মারি'। কোনো বিনণিতে গেলে প্রতিটি ব্র্যাণ্ডের পণ্য যেন বলে ওঠে, 'আমাকে দেখুন, আমকে কিনুন'। প্রতিটি ব্র্যাণ্ডই চায় প্রতিযোগিতার সেরা হয়ে উঠে গ্রাহকের মনে চিরস্থায়ী আসন তৈরি করতে। ধরা যাক, বিপণিতে গিয়ে যখন দেখা যায়, তাকে অনেক কোম্পানির সাবানা পাশাপাশি সাজানো আছে, তখন, একেবারে নতুন কোনো কোম্পানি ছাড়া বাকি সমস্ত কোম্পানির সাবানই আমাদের পরিচিত। নানা বিজ্ঞাপনে পত্রন্নতিটি কোম্পানির সাবার তাদের কাহিনি শুনিয়ে চলেছে। ভিকো তার বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছে, আযুবৈদিক জড়িবুটি থেকে প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি সেই স্বদেশি সাবানে জুড়ি মেলা ভার। লাক্স সাবানের, বক্তব্য, সে যুগ যুগ ধরে চিত্রতারকাদের প্রথম পছন্দ। মার্গো তার নিমের গুণাগুণ প্রচারে অকুণ্ট। অনদিকে পেয়ার্স গ্লিসারিন সাবান বলছে, তার রং-রূপের কাছে সময়ও হার মানতে বাধ্য। অধিকাংশক্ষেত্রে সাবানগুলির মোড়কেও সেই বিজ্ঞাপনী বার্তার ছোঁয়াচ—ভিকোর প্যাকে আয়ুর্বেদের অনুষঙ্গ, লাক্সে সৌন্দর্যকে রূপক, নিম গাছের পাতার ছবি মার্গোর প্যাকে, আর পেয়ার্সে গ্লিসারিনের উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। অর্থাৎ একটিই পণ্য নানা কোম্পানির সূত্রে নানাভাবে গ্রাহকের মনকে প্রভাবিত, কোনো বা বিভ্রান্ত করতে চাইছে। নানা কোম্পানির ভিড়ে যে-সাবানটির সঙ্গে, বলা ভালো, তার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে গ্রাহক একাত্ম অনুভব করবে, সেই সামানটিই কিনবে। অনেকক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা যায়, ছেলের জন্য লাইফবয়, পরিবারের মহিলাদের জন্য লাক্স এবং শীতকালে পারিবারিক সকল সদস্যদের জন্যই গ্লিসারিনযুক্ত পেয়ার্স সাবান কেনা হচ্ছে।

পেয়ার্স সাবানের কমার্শিয়াল বা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে কী দেখানো হয়? কমার্শিয়ালটিতে একটি বাচ্চা মেয়ে বাথটাবে পেয়ার্স মেখে স্নান করছে, এমন সময় তার মা আসে। অল্পবয়সী সেই মা মেয়ের সঙ্গে পেয়ার্স সাবান নিয়ে খেলতে খেলতে খেমনয়েকে ইতিহাস শেখায় : বাবর—বাবরকা বেটা হুমায়ুন—হুমায়ুনকা বেটা আকবর ইত্যাদি। গানটি আবার এ. আর. রহমানের সুরারোপিত 'রোজা' সিনেমার অত্যন্ত জনপ্রিয় 'দিল হ্যায় ছোটা সা, ছোটি সি আশা'র অনুকরণে গীত হয়। আর সমগ্র ঘটনার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় সাবান হিসেবে পেয়ার্স ব্র্যাণ্ডের গুণে অর্থাৎ স্বচ্ছতা। বিজ্ঞাপনের শুরুতে

মা আসে এক স্বচ্ছ কাচের আড়াল থেকে। মাঝে মাঝে তার মুখ দেখা যায় সাবরেন ভিতর দিয়ে, অনেক ফেনা হয় সেই সাবানে, সাবানের বুদ্বুদ বাতাসে ভাসতে থাকে। সেই সাবান পিছনে যায় ত্বকের ওপর। সবশেষে সাবনের গুণ বলা হয় বিজ্ঞাপনে। আসলে এই বিজ্ঞাপনে শুধু পেয়ার্স সাবানের গুণের কথাই বলা হয় না; মা-মেয়ের ?????, স্নানঘরের মুহূর্তগুলি, আলোর ব্যবহার, জনপ্রিয় হিন্দি গানের অনুকরণে গানের কলি—সবটি মিলিয়ে, সর্বোপরি মায়ের মুখনিঃসৃত গপ্পে বাবর-হুমায়ুন-আকবর—ভারতীয় রাজাদের পরম্পরার কাহিনি—আমসলে সাবানটিকে একটি ব্র্যান্ডের আকার দেয়। ফলে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই সাবান।

৬.৪.৪ বিজ্ঞাপন ও বাস্তবের পার্থক্য :

বিজ্ঞাপনে যা প্রদর্শিত হয়, সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। বিজ্ঞাপনে বলা হয়, অমুক সাবান একবার মাখলে ৭২ ঘণ্টা অর্থাৎ তিনদিনেরও বেশি সময় তরতাজা থাকা যায়। কিন্তু বাস্তবে তা অসম্ভব। কোনো হেলথ ড্রিঙ্ক দাবি করে, সেটি খেলে বাচ্চারা হবে ‘taller’, ‘sharper’বাস্তবে যে-প্রতিশ্রুতি কোনোদিনই পূরণ হয় না। উল্টে কী দেখা যায়, বাচ্চারা সেই হেলথ ড্রিঙ্কের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। বাচ্চাদের মধ্যে এই আসক্তি তৈরিই অর্থাৎ পণ্যটির কাটতই এখানে মূল লক্ষ্য—বাস্তবিক ‘taller’ ‘sharper’ করা নয়।

বিজ্ঞাপিত নানাবিধ পণ্যের মধ্যে অভিজ্ঞতাজাত পণ্য হল সেই পণ্য যা অভিজ্ঞতাসূত্রে অর্জিত। মূলত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এই পণ্যের আওতাভুক্ত। বিভিন্ন খাদ্যপণ্য (তা প্যাকেটজাত হোক বা প্যাকেটহীন)-র বিজ্ঞাপনে যা দেখানো হয়, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। খাদ্যদ্রব্যটিকে নয়নাভিরাম করে তোলবার জন্য ক্যামেরার সামনে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। যেমন, কোনো ক্রিম কেকের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, কেকটির অভ্যন্তরে এতই ক্রিম ঠাসা যে, কেকটি মাঝখান থেকে কাটা বা ভাঙার পর সেখান থেকে ক্রিম গড়িয়ে পড়ছে। অথচ বাস্তবে সেই কোম্পানির কেকটি দিয়ে যদি কেটে বা ভেঙে দেখেন, দেখা যায়, সামান্য একটুখানি ক্রিম মাঝখানে জমাট বেঁধে আছে—ফলে তা গড়িয়ে পড়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাহলে বিজ্ঞাপনে কীভাবে অমান দেখানো হয়? বিজ্ঞাপণী শুটিং-এর সময় কেকের এক অর্ধের মধ্য দিয়ে নল ঢুকিয়ে সেই নলের মাধ্যমে অর্ধতরল বস্তু প্রবেশ করানো হয়—যাতে মনে হয়, কেকটি ভাঙলেই সেই অর্ধতরল ক্রিম গড়িয়ে পড়ে।

একইভাবে গ্রিলড বা সেঁকা কোনো খাদ্যদ্রব্য বোঝানো সময় বিজ্ঞাপনী শুটিং চলাকালীন পোড়া মোবিল ব্যবৗের করা হয়। রানআনা করা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বেশিভাগ সময়ই অন্য উপাদানে সেগুলি নির্মিত হয়— আসল উপাদানে নির্মিত হলে সেটি আকর্ষক হবে না, তাই।

ফলে বিজ্ঞাপনে-প্রদর্শিত পণ্য এবং বাস্তবে প্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে চিরকালই পার্থক্য ছিল, আছে, থাকবে।

৬.৫ বিজ্ঞাপনের আইনি নীতি

বিজ্ঞাপনের নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা আইনি নীতি প্রণয়ন করা হয়। ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য লিখিত 'বিজ্ঞাপন ও বিপণন' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপণ : আইনি নীতি' শীর্ষক আলোচনাটি এখানে গৃহীত হল—

ব্রিটিশযুগে ১৮৬৮ সালে প্রণীত ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বা Indian Penal Code-এ প্রকাশনার ক্ষেত্রে কেটি আইন প্রযুক্ত হয়। সেখানে নির্দেশ করা হয় যে, কামোদ্দীপক, বিকৃতকামনার উদ্রেককারী বা নৈতিক চরিত্র কলুষিতকারী বই, পুস্তিকা, চিত্র ইত্যাদি অশ্লীল বলে গণ্য হবে এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত হবে। এখানে প্রত্যক্ষত বিজ্ঞাপনের উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে সেটিকেও-যে এই আইনের আওতাধীন ভাবা হত, তা বলাই বাহুল্য।

১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশিত হয়। ১৯১৪-য় পাঞ্জাব আবগারি আইন পাঞ্জাবে মদ নিষিদ্ধ করে এবং সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা বলবং হয়। ১৯৪০-এর ভেষজ ও প্রসাধনী আইনে ভেষজ ও প্রসাধনী আমদানি, উৎপাদন ইত্যািদি নিয়ন্ত্রণ জারি করার পাশাপাশি বিজ্ঞাপণে সরকারি বিশ্লেষকের রিপোর্ট প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। বিনা প্রেসক্রিপশনে বিক্রিযোগ্য ওষুধ ব্যতীত অন্য ওষুধের বিজ্ঞাপন-প্রকাশও সেই আইনে রদ করা হয়। ১৯৫০-এ অন্যায়ভাবে বিজ্ঞাপনে কোনো প্রতীক ও নামব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা জারি হয়েছিল।

১৯৫৪-য় ভেষজ ও ঐন্দ্রজালিক নিরাময় আইনে বিভিন্ন যৌনরোগ নিরাময়ের আশায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ তাকে প্রতারিত করতে না পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ওই আইন প্রণয়ন। মৌখিক বা মুদ্রিতভাবে সেই জাতীয় বিজ্ঞাপনের প্রকাশ আইনটিতে নিষেধ করা হয়।

যুব সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করতে পারে বা তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে সমর্থ এমন দৃশ্য প্রদর্শন, প্রদর্শনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬-য় একটি আইন চালু হয়ড। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখিত থাকে যে, যুবসমাজের হানিকর কোনো দৃশ্যের নির্মাণ, প্রদর্শন, প্রচার আমলে এক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞাপন রচনাকারীর অধিকার সংরক্ষিত হয় ১৯৫৭ সালের রচনাস্বত্ব আইনে।

১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত হয় বোম্বে লটারি আইন (নিয়ন্ত্রণ আইন) এবং বিদেশি ব্র্যাণ্ড-নাম ব্যবহার সম্পর্কিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন (FERA বা Foreign Exchange Regulation Act)। ১৯৭৬ক্ষ্ম এ মানসম্মত ওজন ও পরিমাপ আইন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন বিধি ও প্রমিয়াম, বিভিন্ন রাজ্যের পণ্য নিরোধক আইন জারি হয়।

১৯৮৪ সালে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক আইনের প্রেক্ষাপটে বিভ্রান্তিকর এবং অসঙ্গত বা অন্যায় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চালু হয় MRTP বা The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act। এই আইনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো পণ্য বিক্রি বা তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এই আইন সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে, সেগুলি হল—পণ্যের মান বা উপাদান মকুটে মিথ্যাচার, পুরোনো পণ্যকে নতুন বলে বিক্রি, পণ্যটির পোষক হিসেবে ভুয়ো সংসস্থার উপস্থিতি প্রচার, বিক্রেতা সম্পর্কে অলীক তথ্য প্রকাশ, পণ্যের উপযোগিতা সূত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদর্শন, পণ্যের গুণমান ঠিক না হলে তা পরিবর্তনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে পাঠক এবং গ্রাহককে বিভ্রান্ত করা ইত্যাদি।

১৯৮৬ তে একটি আইন বলবৎ হয়, যেখানে বলা হয়, নরীশরীরের অশোভন প্রদর্শন নিষিদ্ধ। সেই আইনকে তুড়ি মেরে বর্তমানে যেভাবে নারী এমনকি পুরুষদেহকেও পণ্য হিসেবে প্রদর্শিত হয়, তাতে নতুন কোনো আইন প্রয়োগ সম্ভব কিনা, তা সমাজতত্ত্ববিদদের বিচার্য।

১৯৮৫তে প্রতিষ্ঠা পায় বেসরকারি স্বনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ASCI বা The Advertising Standards Council of India। এটি আসলে ভারতের বিজ্ঞাপণ মানক পর্ষদ। ভারতের বিজ্ঞাপন বাজারকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এই সংস্থা। সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল Indian Society of Advertisers, The Advertiser's Association of India এবং The Indian Newspapers Society-র মিলিত উদ্যোগে। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞপনের প্রতি মানুষের অঅস্থা অর্জনের জন্য বিজ্ঞাপনের মনোন্নয়ন। দেশীয় পণ্যের পাশাপাশি বিদেশগত পণ্যের ক্ষেত্রেও সেটি সমানভাবে প্রযোজ্য। ASCI-র অঅচরণবিধি পণ্য বিক্রির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ না করলেও বিজ্ঞাপণের বিষয়বস্তু থেকে তার মোড়ক সম্পর্কিত সব বিষয়ের ওপরেই বিধি আরোপ করে। তবে, নির্দিষ্ট কোনো শিল্প বা ব্যবসায়িক সংস্থার নিজস্ব যে-ব্যবসা সংক্রান্ত নিয়মকানুন রয়েছে, ASCI সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। দেশের নিজস্ব আইনকেও অস্বীকার না করে তারই পরিপূরক হিসেবে বিধি প্রণয়ন করে ASCI।

১৯৯৪ সালে Cable Television Network Rules, প্রেস কাউন্সিলের সাংবাদিকদের আচরণবিধি এবং ASCI-র নির্দেশিকা অনুসারী কোনো সম্প্রদায় অথবা সমাজের কোনো অংশকে যেকোনোভাবে আঘাত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিগণিত হয়। বেতার এবং দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন যন্তরকার ওই দুই সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলদের নির্দেশিকার পরিচালিত হতে থাকে। সেই নির্দেশিকা আসলে ASCIর আচরণবিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নির্দেশিকা অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সম্প্রচার নিষিদ্ধ হয়, সেগুলি হল—

১. মিত্র রাষ্ট্রের সমালোচনা।

২. যেকোনো ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শব্দ প্রয়োগ।

৩. অশোভন ও মানহানিকর বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

৪. আইনশৃঙ্খলার বিঘ্নকারী উত্তেজক ও প্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার।

৫. আদালত অবমাননাকর প্রচার।

৬. রাষ্ট্রপতি ও বিচার বিভাগের কুৎসাকর বিজ্ঞাপন

৭. দেশের সঠিক সংহতির প্রতিকূল বক্তব্য প্রচার।

৮. নাম করে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্ত, সংস্থা বা পণ্যের সমালোচনা।

৯. নারীর মর্যাদাহানিকর বিজ্ঞাপন প্রদশন।

১০. পণ্য বা বাল্যবিবাহে উৎসাহদানকারী বিজ্ঞাপন

১১. সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বা ধূমপানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন। তবে, নির্দেশ অনুযায়ী সিগারেট বা মদের লোগো সংবলিত বিজ্ঞাপন প্রচারে বাধা নেই।

১২. সদ্যোজাত শিশুর বিকল্প খাদ্য বা বোতলে দুগ্ধপানে উৎসাহব্যঞ্জক বিজ্ঞাপন।

১৩. শিশুর নিরাপত্তা বিঘ্নকল্পারী বিজ্ঞাপনপ্রচার।

১৪. প্রামানহীন অলৌকিক গুণসম্পন্ন পণ্যের প্রদর্শন।

১৫. অতি উচ্চকিত দৃশ্য বা স্রাব্য বিজ্ঞাপন

১৬. ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন।

২০০৬-এর ২ আগষ্ট ভারতের কেন্দ্রীয় ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক ASCI-কে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করে। সেইদিন মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের বাণিজ্যিক টেলিভিশনগুলিকে ASCI-র ওই আইন মান্য করা প্রায় বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। 'Cable Television Networks (Amendment) Rles, কবচ'-এ বলা হয়, 'No advertisement which violets the code for self-Regulation in advertising, as adopted by the Advertising standards Council of India (ASCI), Mumbai, for public exhibition in India, from time to time, shall be carried in the cable service'। অর্থাৎ, ASCI-র নির্দেশিকা লঙ্ঘনকারী বিজ্ঞাপনগুলি টেলিভিশনে প্রদর্শিত হবে না।

চারিত্রিকভাবে ASCI একটি স্বনিয়ন্ত্রক সংস্থা বলেই এই সংস্থা তাদের বিধিভঙ্গকারী কোনো বিজ্ঞাপন বা সেই সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতে অভিযোগ জানাতে অক্ষম। তবে ASCI নির্দিষ্ট অভিযোগসম্পন্ন বিজ্ঞাপনগুলি তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছে প্রেরণ করলে প্রয়োজনবোধে সেই তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক নির্দিষ্ট বযবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, ২০০৬-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ASCI-র

কাছে অভিযোগ করা হয় যে, ডাবর কোম্পানি তাদের পণ্য 'প্রমিস টুথপেস্ট' সম্পর্কে এক বিজ্ঞাপনে দাবি করেছে, একটি ব্যবহারে শুধু দাঁতের পোকাই করে, তাই-ই নয়; পুনরায় দাঁতের পোকা হওয়ার আশঙ্কাও কমায়। প্রকৃত্য সত্য এই যে, সারা জীবন ফ্লোরাইডেড টুথপেস্ট ব্যবহার করলেও পোকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। ASCI-র প্রথম অধ্যায়ের ১.১ এবং ১.৪ ধারা অনুযায়ী অভিযোগটির যথার্থ্য স্বীকার করা হয় এবং আইন অনুযায়ী বন্ধ হয়ে যায় বিজ্ঞাপনটির সম্প্রচার।

২০০৭-দ্দের জানুয়ারী মাসে এক বিজ্ঞাপনে আইনকস প্রেক্ষাগৃহ জানায়, সপ্তাহের শেষদিন ও ছুটির দিন বাদে ওই হলে টিকিটের দাম ৫০ টাকা। এক ব্যক্তি শুক্রবারের প্রদর্শণীর জন্য টিকিট কিনলে তাঁর কাছ থেকে ৮০ টাকা নেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির অঘিযোগের ভিত্তিতে দেখা যায়। আইনক্স শুক্রবারকে সপ্তাহের শেষদিন হিসাবে ধার্য করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইনক্সের বিজ্ঞাপনটি ছিল বিভ্রান্তিকর। ASCI তা মেনে নেয় এবং আইনক্স কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেয় ভবিষ্যতের এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

একইভাবে, ভ্যানিটি গোল্ডের Zodiac Power Ring-এর বিজ্ঞাপনের দাবি অতিরঞ্জিত বলে অভিযোগ উঠলে ASCI তা মেনে নেয় এবং সংস্থার পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপনটির প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। পাশাপাশি দেখা যায়, ২০০৬-এর নভেম্বর গো-এয়ার সংস্থা এক বিজ্ঞাপনে জানায় তাদের প্রথম বার্ষিক উপলক্ষে ২০০৬-এর ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত একলক্ষ লোককে বিনামূল্যে বিমানের টিকিট প্রদত্ত হবে। এক ব্যক্তি ১৩ নভেম্বর টিকিটের জন্য বার্তা প্রেরণ (SMS) করলে তাঁকে বিমান-কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বিনামূল্যের সব টিকিট নিঃশেষিত। ওই ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে ASCI মেনে নেয় যে, বিজ্ঞাপনটি ছিল আসলে বিভ্রান্তিকর। সংস্থাটিও ভবিষ্যতে এমন বিজ্ঞাপণী প্রচারে নিষেধাজ্ঞায় সম্মত হয়। এইভাবেই বিজ্ঞাপন জগৎকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে সমর্থন করেছে ASCI।

TRAI বা The Telecom Regulatory Authority of India বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত বিজ্ঞাপনের দৈর্ঘ্য ও তা প্রচারের সময় নির্দেশ করে ২০১২তে Standard Quality of Service (Duration of Advertisement in Television Channels) REgulation জারি করে। এই বিধির মূল বক্তব্য হল—

১. এক ঘণ্টা সময় পরিসরে মোট ১২ মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপন প্রদর্শণ করা যাবে না।

২. দুটি বিজ্ঞাপন পর্বের মধ্যে ন্যূনতম পনেরো মিনিটের ব্যবধান রাখতে হবে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সেই ব্যবধান হবে তিরিশ মিনিট। তবে কোনো ক্রীড়ার ধারাবিবরণীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ বলবৎ হবে না।

৬.৬ সারাংশ

বিজ্ঞাপনের কাজই হল বিশেষভাবে জ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন 'বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে বলেই বিভিন্ন পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে গ্রাহক অবগত হতে পারেন। বিজ্ঞাপনের দ্বারাই উপভোক্তা বিভিন্ন পণ্যের

একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে পছন্দের পণ্যটি নির্বাচণের স্বাধীনতা অর্জন করেন। জনস্বার্থমূলক বিজ্ঞাপনগুলি এক অর্থে জনসেবামূলক। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ক্রমান্বয়ে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। ভোগবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়। পণ্যের একর করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়। বিজ্ঞাপন যা দেখায়, বাস্তবে অনেকক্ষেত্রেই সেই প্রতিশ্রুতি রঞ্জিত হয় না। গ্রাহক যাতে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারিত না হতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই নির্মিত হয়েছে বিজ্ঞাপনের নানা আইনি নীতি।

৬.৭ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. একটি উদাহরণে বুঝিয়ে দিন, বিজ্ঞাপন কীভাবে জনমানসে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম।

২. 'বিজ্ঞাপন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়'—বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার যুক্তি সজ্জিত করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বিজ্ঞাপন কীভাবে ভোগবাদী মানসিকতার পুষ্টিসাধন করে, তা উদাহরণযোগে স্পষ্ট করল।

২. MRTP আইন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. ASCI-এর নির্দেশিকা বলতে কী বোঝেন?

গ. অতি সংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. উপভোক্তা দপ্তরের কাজ কী?

২. FERA কী?

৩. পাঞ্জাব আবগারি আইন কত কালে কার্যকর হয়?

৬.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বিষয় বিজ্ঞাপন', রংগন চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

২. 'বিজ্ঞাপন ও বিপণন', ড: নন্দলাল ভট্টাচার্য, লিপিকা, প্রথম প্রকাশ-২০১৫, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০২৩)।

৩. বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতি, আইন এবং সংগঠন', জয় সরকার, পি. জি. ড়ি জে. এম. সি. ষষ্ঠপ্তর (খ)-এর পাঠউপকরণ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪।

একক ৭ ❑ জনমানসে সাংবাদিকতার প্রভাব

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ জনমানসে সাংবাদিকতা (মুদ্রিত মাধ্যম)

৭.৩.১ প্রথম পর্ব (১৮৭০-১৮৫০)

৭.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫১-১৮৯৯)

৭.৩.৩ তৃতীয় পর্ব (১৯০০-প্রাক্-স্বাধীনতা)

৭.৩.৪ চতুর্থ পর্ব (১৯৪৭--১৯৬৯)

৭.৩.৫ পঞ্চম পর্ব (১৯৭০-১৯৮৯)

৭.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব (১৯৯০-একবিংশ শতাব্দী)

৭.৪ জনমানসে সাংবাদিকতা (বৈদ্যুতিন মাধ্যম)

৭.৫ সারাংশ

৭.৬ অনুশীলন

৭.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৭.১ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই তৎকালীন বিবিধ সংবাদপ্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে সেটি। ফলে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রকাশিত নানা সংবাদপত্র কীভাবে তাঁদের সাংবাদিকতায় সমকালনী মানুষকে প্রভাবিত করেছে, কীভাবে জনমানসে কোনো বিশেষ সংবাদপত্র দীর্ঘস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ঠিক কোন্ মানসিকতায় সংবাদপত্রের সম্পাদনা করতেন, কীভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির রোষে বিভিন্নত সংবাদপত্রের সম্পাদককে অহেতুক নিপীড়কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—সেই আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার উল্লেখে জনমানসে তার প্রথাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করাই বর্তমান একটির উদ্দেশ্য।

৭.২ প্রস্তাবনা

মুদ্রিত মাধ্যমের সাংবাদিকতা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে কীভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই আলোচনা এখানে যুগবিভাগের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ প্রথম পর্ব, ১৮৫১ থেকে ১৮৯৯ দ্বিতীয় পর্ব, ১৯০০ থেকে স্বাধীনতালাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। চতুর্থ পর্ব শুরু হয়েছে স্বাধীনতা লাভ থেকে। সেটি ১৯৬৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৭০ এর দশক থেকে ১৯৮৯অবধি সাংবাদিকতার বদলটি এখানে আলোচিত হয়েছে। এই পর্ব শেষ হয়েছে ১৯৯০-এ মুক্ত অর্থনীতি ভারতে প্রবেশের পর কেবিংশ শতক পর্যন্ত জনমানসে সাং ভারতে প্রবেশের পর একবিংশ শতক পর্যন্ত জনমানসে সাংাদিকতার প্রভাব আলোচনায়। এরপর এখানে আছে অন্যান্য নানা মাধ্যমে সাংবাদিকতা কীভাবে জনমানসে প্রভাবিত কদ্রেহর, সেই আলোচনাটি। পরিশেষে সারাংশ, অনুশীলনী ও সহায়ক গ্রন্থে একটি সজ্জিত।

৭.৩.১ জনমানসে সাংবাদিকতা : প্রথম পর্ব (১৮৭০-১৮৫০)

ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-ই ছিল সাংবাদিকতার একমাত্র স্তম্ভ। সাময়িক পত্রের পাশাপাশি—নির্বাচিত কিছু সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা কীভাবে তৎকালীন জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল, তা এখানে আলোচিত হল।

জেমস অগাস্টাস হিকির 'Bengal Gazette or The Original Calcutta General Advertiser ছিল 'A Weekly Political and Commercial Paper open to all parties but influenced by none.'। এই 'বেঙ্গল গেজেট' কেই ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্রে মর্যাদা প্রদান করা হয়। ভারতে বসবাসীকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারী তথা কর্মকর্তা, যাঁরা বিভিন্ন দুর্ণীতির অংশীভুক্ত ছিলেন, তাঁদের সেইসব দুর্ণীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল 'বেঙ্গল গেজেট'। পাশাপাশি, ভারতীয় মজুরদের প্রতি সংঘটিত অত্যাচারের কথাও সেখানে প্রকাশিত হত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এহেন বিরোধিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে হিকিকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। অর্থাৎ সমকালনীতসমাজের সঠিক প্রতিফলন যেভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত, প্রকাশিত সেইসব সংবাদের অভিঘাতে। অর্থাৎ সাংবাদিকতার ধরনে সামাজিক নানা ঘটনার জন্ম হত। জনমানসে সাংবাদিকতার প্রভাব একারণেই অনস্বীকার্য।

১৭৮০তে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় আটত্রিশ বছর পর ১৮১৮ তে প্রকাশ পেল 'সমাচার দর্পণ'। এটিই প্রথম ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের উদ্যোগেই 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এই পত্রিকার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কারের সমালোচনা। হসেই লক্ষ্যপূরণে হিন্দুধর্মবিরোধী-লেখায়-পারদর্শী পণ্ডিতদের

দিয়ে লেখানো হত। অর্থাৎ 'সমাচার দর্পণ'-এণ উদ্দেশ্য ছিল রাজশক্তির বিরোধিতা না করা। তবে এই অবিরোধিতায়, 'সমাচার দর্পণ'-যে খ্রিষ্টধর্মেরও মুখপত্র হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমন নয়।

ইংরিজি শিক্ষায়-শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায় স্বাভাবিকভাবেই 'সমাচার দর্পণ'-এর বিরোধী ছিলেন। ফলে। উৎকৃষ্ট বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের লক্ষ্যে তিনি 'বঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম দেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে রামমোহনের লেখা প্রকাশিত হয় এই 'বঙ্গাল গেজেটি'তেই। হয়তো বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত বলেই এই পত্রিকা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

এরপর জেমস্ সিল্ক বাকিংহরহ্মাম কলকাতা থেকে একটি অর্ধসাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর। নাম ছিল 'ক্যালকাটা জার্নাল'। মূলত শাসকদের অকর্মণ্যতা, অযোগ্যতা প্রদর্শনই ছিল সাংবাদিকতার লক্ষ্য। তবে, তার পাশাপাশিই সাধারণ মানুষের বক্তব্য বা অভাব-অভিযোগও সেখানে মুদ্রিত হত। সমকালে জনসাধারণের মত প্রকাশের অবকাশপ্রদানে অভিনব এই পত্রিকাটি স্বাভাবিকভাবেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেইকারণেই সেটি ১৮২১ সালের মে মাসে অর্ধসাপ্তাহিক থেকে দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়।

১৮২১-এর ৪ ডিসেম্বর রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের সামাজিক নানা কুসংস্কার সংক্রান্ত চিন্তিত মতবাদ প্রকাশিত হত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, নারীশিক্ষার প্রচলন, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন, দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা, জীবনবিমা তথা ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের আহ্বান—ইত্যাদি বিষয়গুলি চিল পত্রিকার আলোচনার মূল ভরকেন্দ্র। অর্থাৎ জনসাধারণকে নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সমকালে সংবাদপত্র ছাড়া জনমানসকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করার অন্য কোনো পন্থা ছিল না। ফলে সমাজ সংস্কারকগণ বিভিন্ন সময়ে এই সংবাদপত্রকেই করে তুলেছিলেন তাঁদের বার্তা প্রচারের মূল হাতিযার।

'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের মনে এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, ১৮২৩-এ তৎকালীন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল জন অ্যাডাম সংবাদপত্র দমনমূলক একটি অধ্যাদেশ না অডিন্যান্স জারি করেন—'Regulation of the Press Ordinance'। এই অর্ডিন্যান্স 'Adam's Gay" বা ়্যাডামের কণ্ঠরোধকারী অধ্যাদেশ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এই আইনের করে আইনটি বাতিলের দাবিতে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন রামমোহন, আবেদন পাঠান ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের কাছেও। কিন্তু আইনটি বলবং থাকে।

বাকিংহামের মতো ভারতদরদী এবং রামমোহনের মতো সমাজসংস্কারক নিজেরদ চিন্তাভাবনাকে জনসাধারণের মনে প্রসারিত করার জন্য অধ্যার্থে ভারতীয় জনগণকে সমাজ বিষয়ে শিক্ষিত করে

তোলার লক্ষ্যে সংবাদপত্র প্রকাশকেন্দ্রিক যে-উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে নবজোয়ার আনেন অংলো ইন্ডিয়ান তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিডিয়ান ডিরোজিও এবং তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণরা। সেই সময় অ্যাডামের অধ্যাদেশ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্ষোভ চলছে। সেই পরিস্থিতিকে নতুন গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কলকাতায় এলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। উদারমনা বেইন্টঙ্কই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির প্রচারসংখ্যা বিষয়ে একটি সমীক্ষা করান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যার নিরিখে ভারতীয় জনমানসে সেগুলির প্রভাব নির্ধারণ করা। সমীক্ষার ফল প্রকাশে দেখা গিয়েছিল, সমকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরিজি দৈনিক ও অর্ধসাপ্তাহিকগুলির মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ১,১২৫—তাছাড়া, বাংলা ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত আটটি সংবাদ ত্রের সম্মিলিত প্রচারসংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। সংবাদপত্রগুলি যে সামাজিক পরিবর্তনের (social reforms) ক্ষেত্রে বিহেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল— সমীক্ষার ফলে সেই তথ্যও উদঘাটিত হয়।

বেন্টিঙ্কের উদার মানসিকতার কারণেই ১৮৩০—৩১ থেকে বেশ কিছু নতুন চিন্তাধারা সমন্বিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এগুলির প্রকাশস্থান ছিল মূলত পূর্বভারত। ভারতীয় সাংবাদিকতার গবেষক ও অধ্যাপক দেবাশিস চক্রবর্তীর। ১৬টি ছিল বাংলা চালু সংবাদপত্র। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে নতুন ১৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রচেষ্টায় যে নতুন কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, বেন্টিঙ্কের অনুনপ্রেরণায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে সেগুলিরই নবরূপায়ণ ঘটল। পূর্ব ভারতের পাশাপাশি তখন পশ্চিম ভারতও সংবাদপত্রগুলিতে সামাজিক আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। র্শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ ও কৌতুহলই ছিল এর মূল ভরকেন্দ্র। এই গোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করতেন, ধর্ম বা সামাজিক কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা ছিল একমাত্র সংবাদপত্রই সেই পরিসর। সেখানে সেই বিষয়ে বিশদে আলোচনা সম্ভব।

একদিকে যখন সংবাদপত্র ততা সাংবাদিকতার এই নববিকাশের যু চলছে, সেই সময় বিশ্ব জুড়ে চলছে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীপ্রচার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ ও প্রসারিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। ফলে, সমকালীন বিশ্বের সেইসব ঘটনার অভিঘাতেও বাংলা-থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির সাংবাদিকতা হয়ে উঠল আরও যুক্তিবাদী। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি। তৎকালীন সংবাদপ্তরগুলি যখন ধর্মকেন্দ্রিক নানা তর্কবিতর্কে নিমজ্জিত ছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' তখন বিশুদ্ধ সংবাদ পরিবেশনকেই পত্রিকার ভরকেন্দ্রে স্থাপন করেন। প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা

ও জীবনচরিত সংগ্রহ করে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। তবে, একথাও ঠিক, ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। প্রগতিশীলদের তিনি সমর্থ ককরতেন ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কিংবা বিধবাবিবাহের প্রচলনের মতো যুগান্তকারী সামাজিক আন্দোলনে ঈশ্বর গুপ্ত সামিল হতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় ইংরিজি শিক্ষার প্রচলন ঘটে। ১৮২৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ বা হিন্দু কলেজ—যা পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই প্রেসিডেন্সিতেই ১৮২৬-এ তরুণ অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইতিহাস ও ইংরিজি সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জনকারী ডিরোজিও স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল, সংস্কারযুক্ত আধুনিক মনস্ক অধ্যাপক। পুঁথিগত শিক্ষাদানের পরিবর্তে তিনি ছাত্র মনে কৌতূহল জাগ্রত করতেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই ইয়ং বেঙ্গলের অন্দোলন ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে নানা বিষয়ের আলোচনা হত। সেখানে ছিল সাহিত্য, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ, আস্তিকতা-নাস্তিকতা ইত্যাদি। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিশ্বাস করত, জনমত গঠন ও জনশিক্ষা প্রসারে সংবাদপত্রই হয়ে উঠতে পারে অন্যতম এক শাণিত অস্ত্র। বিধবাবিবাহের প্রচলন, দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, কৃষির উন্নতি—সমাজের সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের উৎসাহ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর উদ্যোগেই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর জরুণরা প্রথমে ‘পার্থিনন’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন না করায় পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৩১-এই তাঁরা প্রকাশ করেন ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকা। এর প্রধান পরিচালন ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রত্রিকাটির মূল লক্ষ্যই ছিল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ। সেই কারণেই পত্রিকার প্রশিত হয় নরবলির সমালোচনা, কৌলিণ্য প্রথায় বহুবিবাহ রদ, কণ্যা বিক্রয়ের প্রতিবাদ, দেবালয়ে অনাচারের বিরোধিতা, সমাজপতিদের দুর্নীতি-ভণ্ডামি, দুর্গোৎসব ও পুজো-পার্বণে আর্থিক অপচয়ের সমালোচনা, স্ত্রীশিক্ষা তথা ইংরিজি শিক্ষায় প্রচলন, দেশীয় ব্যবসার প্রচলন, আদালতে বাংলা ভাষার স্বীকৃতিপ্রদানের পক্ষে সওয়াল ইত্যাদি। এছাড়া, আফ্রিকার দাস ব্যবসা, রায়তদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও চিৎকৃত ছিল এই পত্রিকা। সামাজিক ক্ষেত্রে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। তবে, পত্রিকাটির পরিচালকদের একাংশ পরবর্তীকালে সরকারি চাকরি এবং ব্যবসায় মনোনিবেশ করায় ১৮৪০-এর নভেম্বরে ‘জ্ঞানাণ্বেষণ’ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩৫-এ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’। সংবাদপত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল ৮৪ বছর—এর মধ্যে ৭৬ বছর এটি দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। সাংবাদিকতার গুণে জনশিক্ষার প্রসার, কৃষির উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষকদের স'বার্থরক্ষা

হত্যাদি জনহিতকর বা লোকহিতকর বিষয়গুলি এখানে যেভাবে উত্থাপিত হচ্ছিল, সেটিই ছিল পত্রিকাটির দীর্ঘ আয়ুষ্কালের অন্যতম কারণ।

১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯ সময়কালে বিভিন্ন বাংলা পত্রিকার প্রকাশিত হয়, যেমন, 'সংবাদ অরুণোদয়', 'জ্ঞানসম্বতারিণী' 'সমাজার জ্ঞানদর্পণ', 'সংবাদ রমসুদগর', 'মহাজন দর্পণ' ইত্যাদি। কোনো পত্রিকাই এক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি—হয়তো জনমানসে পত্রিকাগুলি সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি অথবা প্রতিটি পত্রিকার প্রায় একই ধরণের বিষয়কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে 'মহাজন দর্পণ' নামক ভারতের প্রথম বাণিজ্য বিষয়ক দৈনিক সংবাদপত্র। এটির সম্পাদক ছিলেন জয়কালী ঘোষ। ১৮৪৯ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ। মূলত সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই সাংবাদিকতায় পদার্পণ করে পত্রিকাটি। ক্ষেত্রে জয়কারলী ঘোষের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতেই হয়। সেইসময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্রমঅবক্ষয়ে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে। ফলে কলকাতর ভিড় বাড়ছে ব্যবসায়ীদের। স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-ভিত্তিক সংবাদের চাহিদা তৈরি হয়। তাই 'সমাজ দর্পণ' মানুষের সেই আকাঙ্খার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল।

এক্ষেত্রে আরো একটি সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—'সম্বাদ রসরাজ'। সাংবাদিকতার সাহস প্রদর্শন করতে গিয়ে পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্য ছিল, 'সাহসপূর্বক সকল লোকের দোষ প্রকাশ করিয়া পাপের দমন ও ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবার জন্যই এই পত্র সৃষ্টি হইয়াছে'। তৎকালীন সমাজের বহু যশস্বীর স্বরূপ উদঘাটন করে সৎ সাংবাদিকতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন সম্পাদক।

৭.৩.২ জনমানসে সাংবাদিকতা : দ্বিতীয় পর্ব (১৮১৫-১৮৯৯)

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা প্রকাশনার জগতে অদিরসাত্মক বইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটল। 'বটতলার বই' হিসেবে পরিচিত সেই সমস্ত অশ্লীন বইয়ের সম্ভার বাঙালির বাড়িতে হাজির হল ফেরিওয়ালাদের মারফত। অশ্লীল কাহিনির পাশাপাশি বইগুলিতে থাকত অশ্লীল ছবির মুদ্রণও। ১৮৫৬ সালের আইনে এই ধরনের প্রকাশনার ওপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সরাসরি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করে তুলেছিল কাগজটি। ফলে সেটিই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র। ১৮৫৩ সালের ৬ জানুয়ারি ইংরিজি সাপ্তাহিক হিসেবে সংবাদত্রটি জন্মলাভ করে। এর প্রেক্ষাপটে ছিল দীর্ঘবছর ধরে নীলচাষকে কেন্দকরে জনমানসে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন হরিশচন্দ্র। তাঁরই অনুপ্রেরণায় রচিত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি—মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেটিরই ইংরিজি অনুবাদ করলেন 'Indigo

Mirror" শিরোনামে। শিশিরকুমার ঘোষ। যিনি পরবর্তীকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক হন, গ্রামগ্রামান্তর থেকে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি সংগ্রহ করে বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে তা প্রেরণ করতেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। সাংবাদিকতার ধরনে গ্রাম্য কৃষক থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের মনে সেই সমস্ত সংবাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বলাযেতে পারে, বাংলার নীলবিদ্রোহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সূত্রে।

১৮৫৭ সালে বিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনির অধীনস্থ ভারতীয় সৈনিকদের সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল মিশ্র। দু'-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমকালীন সংবাদপত্রগুলি সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি। 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ'-এ ড: পার্থ চট্টোপাথায় জানাচ্ছেন, '...সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহকে তাঁরা আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে একটি উৎপাত বলেই মনে করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের ঘৃণা আরও তীব্র ছিল। কারণ তা ছিল মূলত রাজনৈতিক বিদ্রোহ। এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল সংবাদ প্রভাকর। ...সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্র তৎকালীন প্রচলিত জনমতের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।'

এক্ষেত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল ব্যতিক্রম। সিপাহী বিদ্রোহকে সেখানে 'The Great Indian Revolt' বা 'মহান জাতীয় বিপ্লব' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন যে-সব অত্যাচারিত রাজন্যবর্গ, তাদের রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদের গর্জে উঠেছিলেন সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র। লিখেছিলেন, 'kThese is no merit in mangling a corpse but to grant life to the lifeless is an attribute to divinity'. সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধী সংবাদপত্রগুলিকে নস্যাৎ করেছিলেন তিনি। তাঁর পাথেয় ছিল বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাড়াও 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামক একটি দ্বিভাষিক পত্রিকার সেই সময় নিয়মিত সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ করত এবং সেইসময় নিয়মিত সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ করত এবং সেইসূত্রে পাঠকের মন্তব্যধর্মী নিবন্ধও সেখানে প্রকাশিত হত। হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সেই পত্রিকায় সম্পাদক শ্যামানন্দ সেন সিপাহী বিদেদ্রাহকে 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকাশ' বলে বর্ণনা করেন। ১৮৫৭-র সে এবং জুন মাসের বহু সংখ্যায় সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত নানা সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পত্রিকাটি সেই সময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সমকালে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সম্মিলিতভাবে সিপাহীদের সমর্থনে গর্জে উঠল হয়তো সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতি অন্যরকম হত। কিন্তু তা না ঘটায় মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকের অত্যাচার বর্ধিত হয়। ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আকাঙ্খা ক্রমে দুর্নিবার হয়ে উঠল। অন্যদিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এই সময় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী একটি আইন

জারি করে ঘোষণা করলেন, লাইসেন্স ছাড়া কোনো সংবাদপত্র নিজস্ব ছাপাখানা রাখতে পারবে না এবং লাইসেন্সও পাওয়া ফলে শর্তসাপেক্ষে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে সংবাদপত্রসমূহ।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালির নেতৃত্বে নানা সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পাদনায় চেন্নাই থেকে প্রকাশিত হেয় 'এথেনিয়াম' এবং 'হিন্দু ক্রনিকল' নামক ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা। বারাণসী থেকে 'কাশীবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক ছিলেন কাশীদাস মিত্র। এছাড়া, উমাকান্ত ভট্টাচার্যের 'বারাণসী চন্দ্রোদয়', ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়েরী 'স্টার' ও দীননাথ গঙ্গেপাধ্যায়ের 'মাদারল্যাণ্ড' লক্ষ্ণৌ থেকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'লখনউ টাইমস', 'সমাচার হিন্দুস্থানী', এলাহাবাদ থেকে নীলকমল মিত্র ও প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রিফ্লেক্টার', 'মধুসূদন মৈত্রের 'প্রয়াগদূত' ইত্যাদি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও প্রকাশিত হচ্ছিল নানাবিধ পত্রিকা। গুজরাটি ভাসায় 'মুম্বাইয়া সমাচার', 'মুম্বাইনা চাবুক', 'দূরবীন', 'সত্যপ্রকাশ', 'বর্তমান', 'সুরাট সমাচার' ইত্যাদি। মারাঠি-ভাষায়-প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বোম্বে দর্পণ', 'দিগ-দর্শন', 'প্রাভাকর', 'ধ্যান প্রকাশ', উপদেশ চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা সমাজ', 'ইন্দুপ্রকাশ ইত্যাদি। এই সমস্ত পত্রিকাগুলি সমকালীন নানা বিষয়ে আলোকপাত করত—যেমন বিধবা বিবাহপ্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন্য, বাল্যবিবাহ রদ। তবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কিংবা সংবাদপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে পত্রিকাগুলি সোচ্চার ছিল না। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালীন অধিকাংশ পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ আইনেরই সমর্থক ছিল।

১৮৫৩-য় উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৩৫। বিক্রি সংখ্যা ছিল (প্রচার সংখ্যা) ২২১৬। ১৮৫৮-য় অধিকাংশ পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। ১২টিক ছিল প্রচলিত। তবে সেগুলির গ্রাহকসংখ্যা ছিল তুলনামূলক অনেক বেশি। অর্থাৎ বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে সংবাদপত্রপাঠের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল। তবে বাংলার বহির্দেশে সংবাদপত্র সম্পর্কে সচেতনতা তখনো তৈরি হয়নি। ফলে বর্হিবঙ্গে বাঙালি বা অবাঙ্গালি প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্থায়িত্ব ছিল কম।

জাগরণের যুগে শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট'-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত ভূদেববাবুর পরামর্শেই শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন দক্ষিণ বিভাগীয় ইন্সপেক্টর জনসন প্র্যাট এই পত্রিকাটি সরকার আনুকূল্যে প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল জনমানসে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির প্রচার। এছাড়া, বাণিজ্যিক খবর ও সংবাদ-নির্ভর রচনা লেখ বা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছিলেন। হাইকোর্টের আইনি সংবাদ, প্রাকৃতিক নানাবিধ খবর, অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ নিয়মিত প্রকাশিত হত 'এডুকেশন গেজেট'-এ। আবার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনদের মতো কবিদের কবিতাও সেখানে ছাপা হত। ১৮৭২

সালের ১৫ নভেম্বর এডুকেশন গেজেট ভাগীরথী নদীর প্রবহমানতা রক্ষার্থে যে-প্রস্তাব রাখে, তারই ফলশ্রুতি বর্তমানের ফারাক্কা ব্যারেজ।

১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ'। পত্রিকাটির মূল উদ্দেহ্য ছিল জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তদের পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তদের চেতনার বলিষ্ঠ উন্মেষ ঘটালো। পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার প্রতিও 'সোমপ্রকাশ'-এর আগ্রহ ছিল চিত্তাকর্ষক। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকেই সমর্থন করেছিল এই পত্রিকা। বিধবা বিবাহের পক্ষেও মত প্রকাশে এই পত্রিকা পিছপা হয়নি।

মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত যে সমস্ত পত্রিকা ইংরেজ-বিরোধী বক্তব্যের স্পষ্ট প্রকাশে জনমোনসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিত'। সম্পাদক প্রসিদ্ধ ছিলেন 'কাঙাল হরিনাথ' নামে। তিনি ছিলেন মূলত একজন সমাজসেবক। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঠিক বঞ্চনার কাহিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের পাশাপাশি সাহিত্যধর্মী রচনার প্রকাশও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মাসিক পত্রিকা থেকে ক্রমে সাপ্তাহিকে পরিণত হওয়া 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' হয়ে উঠেছিল বিবিধ রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যম। ফলে, সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশের ঠিক এক বছর আগে ১৮৬২তে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সংবাদদাতা শিশিরকুমার ঘোষ এবং তাঁর ভাইয়েরা মিলে যশের জেলার অমৃতবাজার গ্রাম থেকে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম ছিল 'অমৃত প্রবাহিণী' পত্রিকা। এটি ছিল একটি গ্রামীণ সংবাদপত্র। পরবর্তীকালে এটিই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সূচনা। এই পত্রিকা ভারতীয় সাংবাদিকতায় এক নবযুগের দিশারী।

১৮৬০-এ ভারতে ব্রিটিশ দণ্ড সংহিতার অনুকরণে প্রণীত হয়েচিল ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বা Indian Penal Code। এই আইনে সরারি সংবাদপত্র বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি ঠিকই, তবে মানহানি আইনকে এমনভাবে প্রযুক্ত করা হয়েছিল যাতে যেকোনো সময়েই প্রয়োজনবোধে সংবাদপত্রের প্রকাশক, মুদ্রক এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করা যেতে পারে। ১৮৬৭ সালে কার্যকর হল Press and Registration of Books আইন। এই আইনবলে ব্রিটিশ রাজ সংবাদপত্র প্রকাশ ও মুদ্রণস্থল নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করল। কিন্তত্তু ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ কার্যকরী Oriental Languages Press Act বা Vernacular Press Act (প্রাচ্যভাষা প্রেস আইন) চালু করলেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর অফ বেঙ্গল স্যার অ্যঅম্লে ইডেন। এ আইনের মূল বিষয় ছিল,

সাংবাদিকতায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি করা—অর্থাৎ, সংবাদপত্রগুলি এমন কোনো সংবাদই মুদ্রিত করতে পারবে না, যা দেশের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করে। বিশেষ খবরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ম্যাজিস্ট্রেট এমনকি কমিশনার অফ পুলিশের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আদালতের নির্দেশ ছাড়াই সংবাদপত্র অফিসগুলিতে তল্লাশি চালানোর াত্রনুমতিও এই আইনে বলা হল। কিন্তু এই আইনের কার্যকারিতা শুধু প্রাচ্যভাষা সংক্রান্ত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইংরিজি-াভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র থেকে গেল এই আইনের বাইরে। ইডেনের বক্তব্য ছিল, ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি সাংবাদিকতার ধরণে জনসাধারণের ক্ষমতা যথার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না। কয়েকটি পত্রিকাকে তিনি সরাসরি জনবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যেমন 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', 'বঙ্গহিতৈষী', ইত্যাদি। সমকালে দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু বোম্বেতে তিখন প্রকাশিত হচ্ছে ৩০টি সংবাদপত্র। বাংলায় ৮৭টি। উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভারতের প্রদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৬০। মাদনত্মাজ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ১৯টি সংবাদপত্র। এত বিপুল সংখ্যক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতেই, অর্থাৎ বলিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে কোণঠাসা করতেই চালু হয়েছিল প্রাচ্যভাষা প্রেম আইন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' আত্মপ্রকাশের পর সম্পাদক শিহিরকুমার ঠিক করেন, বাংলা ভাষার পাশাপাশি পত্রিকাটির একটি অংশ ইংরেজিতে মুদ্রিত হবে, কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন্ত্রদায়ের কাছে পৌঁছতে গেলে সেটি ছিল অনিবার্য। ফলে দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক হিসেবেই পত্রিকাটি পাঠকের কাছে উপস্থিত হল। এদিকে ১৮৭৮-এ প্রাচ্যবাগ প্রেম আইন বরদ্ম ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট কার্যকরী হওয়ার পর শিশিরকুমার ড়ড়ঘোষ অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে আইন প্রণয়নের পরদিন থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে শুধু ইংরিজি ভাষা মাধ্যমেই প্রকাশ করলেন। ফলে প্রাচ্যভাগ আইনের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'।

নির্ভীক সাংবাদিকতার কারণে পত্রিকাটি সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাঠকের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্পাদক শিশিরকুমার জনমত তৈরির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সভা-সমিতিতে যুক্ত হন। অর্থাৎ, সক্রিয় সাংবাদিকতাই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। ফলে, সমাজিক সংস্কার ও প্রগতির স্বার্থে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দেলনে পত্রিকাটির প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৮৮৯ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র একদিন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার পত্রিকার একজন গ্রাহক। কিন্তু আপনার লেখাগুলি এতই ক্ষুরধার যে আমার ভয় হয় এগুলো পড়ে পাঠকের মনে প্রভাব না পড়ে এবং দেশব্যাপী না বিক্ষোভ শুরু করে দেয় জনতা।' শিশিরকুমার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন 'আমার পত্রিকার নীতিই ছিল,

জনগণের চেতনাকে জাগরুক করা। তাদের মনে স্বদেশপ্রেমের যে প্রদীপ জ্বলছে, তাকে উসকে দেওয়া। এখন জনতা জেগে মরে রয়েছে। এদের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে হবে। এরজন্যই আমাদের কলমের ভাষা এত ক্ষুরধার এবং অন্তর্ভেদী।' অর্থাৎ শিশিরকুমারের সাংবাদিক নীতিই ছিল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অস্তিত্বরক্ষা।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বা প্রাচ্যভাষা প্রেস আইনটি ব্রিটিশ সরকার ১৮৮১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রত্যাহত করতে বাধ্য হয়। দেশব্যাপী বিক্ষোভ চিল তার অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শকিত প্রয়োজনে কত নির্মম হতে পারে, সেই সম্পর্কে একটি ধারণা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় এই আইনের সূত্রেই। এই আইনই জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় সংঘটিত করে তুলেছিল। তাই দেশীয় সংবাদপত্রের চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে। সবে মিলে এই আইন জনগণকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌জিবিত করে তোলে এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'।

'অমৃতবাজার পত্রিকাই' ব্রিটিশ সরকারের এক চক্রান্ত পাঠকের দরবারে হাজির করে। পত্রিকায় মতিলাল ঘোষ লেখেন, প্রাচ্যভাষা প্রেস আইন রচনার আগেই বাংলার ছোটলাট ইডেন বিভিন্ন প্রভাবশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকেদের সরকাকারের বিরোধী সাংবাদিকতা না করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং মিলিয়ে সেই সংবাদপত্রগুলিকে নানা আর্থিক সুবিধাপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। বলাই বাহুল্য, কিছু সংবাদপত্র স্বাভাবিকভাবেই সেই ফাঁদে পা দেয়; কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পক্ষে সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ স্পষ্টই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানিয়ে দেন যে, দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক থাকা উচিত, যিনি অন্তত প্রলোভনের শিকার হননি।

'বেঙ্গল' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শাণিত করেন। ভারতসভা গঠিত হয়েছিল দেশের কল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য। তারাই তখন দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। সভার পক্ষ থেকে লালমোহন ঘোষকে বিলেতে পাঠানো হয় এই আইনবিরোধী জনমত গড়ে তোলার জন্য। ব্রিটিশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের কাছেও খবরটি পৌঁছে যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশে আইনটি প্রতিহত করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। অর্থাৎ সাংবাদিকতাই সেক্ষেত্রে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সোজা কথায়, ভার্ণাকুলার প্রে অ্যাক্ট প্রত্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে জনগণ ও সংবাদপত্রের যৌথ উদ্যোগ তখন অত্যন্ত স্পষ্ট। গড়ে উঠছে নানা সামাজিক সংগঠন। তাদের মাধ্যমেই সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হচ্ছে। সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ইন্ডিয়ান লিগ, ভূমধ্যকারী সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বা তার কিছু পূর্ববর্তী সময়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনগুলিই মূলত সংবাদপত্র সম্পাদকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তাঁদের সাংবাদিকতায় ভরসা রেখে জাতীয়তাবাদের প্রচার ও জনমানসে জাতীয়তাবোধ জাগরণের দুরূহ প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল। যেমন, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনদ্ধার মুখ্য বিষয় ছিল স্বদেশপ্রেম। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, যাঁর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা অনেক নব্য বঙ্গীয় যুবকই সংবাদপত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। 'সমাচার পত্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন গৌড়ীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় জনমানসে সমাজ সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। তাই সেখানে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সমকালীন বিভিন্ন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত মানুষ, যেমন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ চৌধুরী প্রমুখ। দ্বারকানাথ এবং প্রসন্নকুমারের তত্ত্বাবধানেই ১৮৩৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েচিল ভূমধ্যকারী সভা বা জমিদারি অ্যাসোসিয়েশন। জমিদার স্তর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও সংগঠনটি ছিল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সমিতির সভ্যদের মতে, জমিদারদের স্বার্থরক্ষাই ছিল রায়তের স্বার্থরক্ষা।

ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি ভারতীয় সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতা ছিল মূলত অব্যবসায়িক। সংগঠিত শিল্প হিসেবে তখনো সংবাদপত্র গড়ে ওঠেনি। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের হাত ধরে চলতে চলতে ক্রমশ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। ঊনবিংশ শতকের শেষে পৌঁছে ভারতীয় সংবাদপত্রে বাঁকবদল ঘটতে শুরু করল। ১৮৭০-এ রাজদ্রোহ আইনে অভিযুক্ত হল তৎকালীন বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসী'। একই আইনে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল বাল গঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকাকে। আঠারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হল তিলকের। ১৮৯৬-এ প্রকাশিত হল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত সংবাদপত্র 'মাসিক বসুমতী'। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই সংবাদপত্রের সাংবাদিকতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মানসিক বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে উদ্দীপ্ত করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্লাবন সৃষ্টি।

তৃতীয় পর্ব

৭.৩.৩ জনমানসে সাংবাদিকতা :তৃতীয় পর্ব: (১৯০০-প্রাক্-স্বাধীনতা)

ঊনবিংশ শতকের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে ভারতীয় সাংবাদিকতায় পদার্পণ করল কিংবা শতাব্দীতে। স্বাধীনতা সংগ্রামী অকুতোভয় বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত 'কেশরী' ও 'মারাঠা' নামক দুটি মারাঠি

সংবাদপত্র তো ছিলই। ইংরেজ সরকারের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত ‘বন্দেমাতরম্’। ভারতের স্বাধীনতা ও সেইসঙ্গে সংবাদপত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের ঘোষণাই ছিল, ‘আমরা ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (স্বরাজ) চাই।’ বাংলার বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

‘বন্দেমাতরম্’-এ সমসাময়িক হিসেবেই প্রকাশিত হয় ‘যুগান্তর’। প্রথম সম্পাদক ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। পরে সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি ছিলেন বিবেকানন্দের অনুজ। ‘বন্দেমাতরম’-এর মতোই ‘যুগান্তর’ ছিল উগ্র বিপ্লববাদের সমর্থক। ফলে এই পত্রিকা অচিরেই জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করে। ১৯০৭-এ এই পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। এই ১৯০৭-এই জুলাই মাসে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় দুটি রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ ছাপানোর ‘অপরাধে’ সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ‘রাজদ্রোহী’ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তাঁকে। সেইসময় কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ভূপেন্দ্রনাথ বিচারকের উদ্দেশ্যে জানান, ‘দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যা কর্তব্য বুঝেছি, করেছি, আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন।’ ফলে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ স্বদেশচেতনার জন্ম দেয় ‘যুগান্তর’। জনমনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে সংবাদপত্রটি আক্ষরিক অর্থেই ‘অন্যযুগ’-এর সমার্থক হয়ে ওঠে ‘যুগান্তর’।

ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে বিশ শতকে মহাত্মা গান্ধীর অবদান Young India’ এবং ‘হরিজন’ পত্রিকার সম্পাদনা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি তোলার পাশাপাশি জনগণের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সম্মানজনক করে তোলা ছিল তাঁর সাংবাদিকাতার নিজস্বতা। গান্ধী বলেছিলেন, ‘One of the objects of a newspaper is to understand the popular feeling and give expression to it, another is to rouse among the people certain desire sentiments, and the third is fearlessly to expose popular defects.’ ১৯২১-এ প্রকাশিত ‘Young India’ পত্রিকার ১৯২৫-এর ২ জুলাই গান্ধী লেখেন, ‘I have taken up journalism not for its sake but merely as an aid to what I have conceived to be may mission of life.’ অর্থাৎ সাংবাদিকতাকে গান্ধী নিজের জীবনের ‘mission’ হিসেবে ভেবেছিলেন—শুধু সাংবাদিকতার জন্যই সাংবাদিক জীবনকে তিনি নির্বাচন করেননি।

ইংরিজি সংবাদপত্রে গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেন্দ্রিক রচনাগুলি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একই সঙ্গে, সেই সমস্ত রচনাগুলি ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। অহিংসার পূজারী ছিলেন গান্ধী। কিন্তু লেখনী ধারণের সময়ে যথাযথ প্রতিবাদের ভাষা চয়নে কুণ্ঠিত ছিলেন না তিনি।

সমকালীন আরও একটি পত্রিকা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে উদিত হয়। ১৯২২-এর ১৩ মার্চ মৃণালকান্তি ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। এই সংবাদপত্রের মূল মন্ত্রই ছিল স্বদেশ ও স্বরাজ। প্রকাশের মাত্র পাঁচদিন পরই তাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'সম্পাদকীয়'তে ঘোষিত হয়, 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার আর উহা আমাদের লাভ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের জাতির থাকা-না-থাকা সমান।' এই দৃপ্ত ঘোষণাই পত্রিকাটিকে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির চোখে 'রাজদ্রোহী' হিসেবে প্রতিপন্ন করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত পত্রিকা-সম্পাদককে মোট ঊনিশবার কারাদণ্ডসহ জরিমানা করা হয়। সাংবাদিকতায় আধুনিক বাংলা ভাষার প্রবর্তন, নতুন বানান বিধি, নতুন লাইনোটাইপ পদ্ধতিতে ছাপার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সংবাদ প্রকাশের নতুন পরিবেশনভঙ্গিতে পত্রিকাটি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সমকালে ১৯২৩-এই প্রকাশ পেল ইংরিজি সংবাদপত্র 'হিন্দুস্তান টাইমস'। প্রকাশস্থল ছিল দিল্লি। প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিল এই পত্রিকা। তবে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনই ছিল তার মূল ভরকেন্দ্র। মূলত শিখ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও এবং পরবর্তীকালে শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা পত্রিকাটি কিনে নিলেও একসময়, এই পত্রিকার সম্পাদক হন মহাত্মা গান্ধীর পুত্র দেবদাস গান্ধী। ১৯৩২-এ চেন্নাই থেকে প্রকাশিত 'Indian Express'-এরও সম্পাদক ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী জি. রামচন্দ্র।

স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রের চাহিদাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসকদের দমননীতি এবং তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বাংলার বিপ্লববাদের সংবাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল সংবাদপত্রগুলিই। চল্লিশের দশকে (১৯৩১-এ শুরু) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেই যুদ্ধের প্রভাব ও ভারতীয়দের জীবনের আসন্ন অনিশ্চিয়তার প্রেক্ষাপটে কিঞ্চিৎ আগাম সতর্কতা পাওয়া যেত সংবাদপত্রগুলির সূত্রেই। এই দশকে মূলত ব্রিটিশ সরকারের নানা দমনপীড়নমূলক নীতির বিরোধিতাতেই জন্মগ্রহণ করে একাধিক সংবাদপত্র। সাংবাদিক শশাঙ্ক শেখর সরকারের মতে, এই চারের দশকে (কলকাতায়) অনেক কাগজ গড়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষায় 'নবযুগ', 'প্রত্যয়', 'পশ্চিমবঙ্গ', 'স্বরাজ', 'ভারত', 'মাতৃভূমি', 'কৃষক', 'হিন্দুস্তান', 'পলাশী', কিশের', 'সত্যযুগ' ইত্যাদি। পিছিয়ে ছিল যা ইংরিজিতে প্রকাশিত সংবাদপত্রও। 'Eastern Express', 'Star of India', 'Morning News', 'The Nationalist' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতটাই তৎকালে সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে যে, তৎকালীন ব্যাঙ্কগুলিও সংবাদপত্রগুলির প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের

পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

১৯৪২-এ ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের ওপর একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করে। সেটি ছিল এই, বিশ্বযুদ্ধের সংবাদ ও সংবাদ-শিরোনামের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের সংবাদপত্রবিরোধী নানা আইনের সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি পরিচিত ছিল। ফলে ৮ আগস্টের এক সভায় সাংগঠনিকভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, ২১ অগাস্ট থেকে সব সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ থাকবে। সমগ্র দেশের ৯৬টি সংবাদপত্র সংগঠিতভাবে প্রতিবাদী ভূমিকায় সোচ্চার হয়ে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ রাখে। ফলে ব্রিটিশ সরকার ২৯ অগাস্ট পূর্বের নির্দেশিকা রদ করতে বাধ্য হয়। যদিও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি অবিচল ছিল। সেইসব নীতির বিরোধিতায় ১৯৪৩-এর ৬ জানুয়ারি ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলি একদিনের ধর্মঘটে সামিল হয়। এর আগে সংবাদপত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করলেও সেই প্রথম সমগ্র দেশ জুড়ে একদিনের ধর্মঘটে সামিল হয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্মিলিত শক্তি ব্রিটিশ সরকারকে ভীত করে তোলে।

১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু ১৯৪৬-এ মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং সেখানে ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার প্রাসাররোধে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সাধ্যমত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছিল। তাসত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করে দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেয়। বিদ্বেষমূলক দাঙ্গার খবর মুদ্রণের 'অপরাধে' মোট সাতাশটি সংবাদপত্রের কাছ থেকে ২৯,৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অথচ সেই কারণে জামিন বাবদ দাবি করা হয়েছিল ১,১২,০০০ টাকা। শাস্তিপ্রাপ্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', Eastern Express', 'বসুবতী', 'ভারত', 'স্বাধীনতা', 'Hindustan Standard', 'যুগান্তর', 'Modern Review', 'Star of India', 'হিন্দুস্তান', 'লোকমান্য' ইত্যাদি।

৭.৩.৪ জনমানসে সাংবাদিকতা :চতুর্থ পর্ব: (১৯৪৭-১৯৬৯)

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় পত্রপত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক এবং পরবর্তীকালে সরকারি দুর্নীতির বিরোধিতা। বিংশ শতকের শুরুতে সেই সংবাদপত্রের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যক্ষভাবে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হওয়া এবং সেই লক্ষ্যে জনমত সংগঠন। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশীদার হয়ে উঠেছিল তৎকালীন পত্রপত্রিকাগুলি।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প তখনো নির্মীলিত হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর দশায় জন্ম হল স্বাধীন দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ। সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সাময়িকভাবে ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছিল

ঠিকই; কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা সয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভিড়, বেঁচে থাকার নারকীয় প্রচেষ্টা, রাষ্ট্র সরকার তথা ভারত সরকারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অসহায়তা, সামাজিক নৈরাজ্য—ইত্যাদির কবলে পড়ে সাংবাদিকতার ভারসাম্য থাকল না। সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ল ঠিকই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি হয়ে উঠল যথার্থ সাংবাদিকতার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলির মুখপত্রস্বরূপ। ১৯৪৮-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হল রাধাগোবিন্দ দত্তের 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা। প্রায় সমকালে প্রকাশিত হয় 'প্রত্যহ' নামের দৈনিক—যেখানে তৎকালীন-প্রচলিত সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষার সংবাদ মুদ্রিত হতে থাকে। ১৯৪৮-এর ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রকাশ পায় ইংরিজি দৈনিক 'The Nation'। মূলত নেতাজির স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শেই পুষ্ট ছিল কাগজটি। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের মুখোশ উদ্ঘাটন করে গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠন শ্রমিক ট্রাস্ট সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট প্রকাশিত হল 'লোকসেবক'। ১৯৫১-য় প্রকাশ পায় কংগ্রেসী নেতা অতুল্য ঘোে সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'জনসেবক'। এটি ছিল মূলত কংগ্রেসের মুখপত্র। ১৯৫১ তেই প্রকাশিত হয় বামপন্থী রাজনৈতিক দল রেভেলিউশনারি সোস্যালিষ্ট পার্টির 'গণবার্তা'। কলকাতার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও নতুন নতুন বিভিন্ন সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই প্রথম চলচ্চিত্র, খেলাধূলা ইত্যাদি বিনোদনমূলক বিষয়গুলি সাংবাদিকতার হাত ধরে সংবাদপত্রের অঙ্গীভূত হল। 'Times of India' থেকে ১৯৫১-য় প্রকাশ পেল ফিল্ম বিষয়কই একটি পত্রিকা 'Filmfair'। ১৯৫০-এ প্রকাশিত হয়েছে 'Star and Style'। ১৯৫৩-য় আত্মপ্রকাশ ঘটল 'Cine Advance'-এর। বাংলা সিনেমা পত্রিকা ছিল 'উল্টোরথ'।

অর্থাৎ সংবাদপত্রের জগতে একটি পালাবদল লক্ষ করা গেল। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের পত্রপত্রিকাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা। সাংবাদিকরা মোটের ওপর ছিলেন দেশভক্ত এবং তাঁরা সাংবাদিকতাকে পেশার পাশাপাশি আদর্শ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। সংবাদপত্রের মালিকরাও ব্যবসার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন সেই আদর্শের ওপরেই। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেখা গেল, অতীতের দেশভক্ত সংবাদপত্র মালিক বা সম্পাদকরা হয়ে গেলেন উচ্চ পদাধিকারী। কেউ হনেদ্বল রাজনীতিবিদ, কেউ মন্ত্রী, আবার কেউ-বা রাজনীতির উঁচু মহলের ঘনিষ্ঠ কোনো কেউকেটো। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি এই সুযোগে তাঁদের আদ্যোপান্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে সংবাদপত্রের বাজার ধরতে আগ্রহী হলেন। বদল দেখা দিল সাংবাদিকতায়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবাদপত্রকে ব্যবসায়িকভাবে অতীব লাভজনক করে তুলতে চাইলেন তাঁরা। ব্যবসার আড়ালে অন্তর্হিত হল পেশাগত সততা এবং দায়বদ্ধতা। আদর্শবাদী সাংবাদিকরাও ক্রমে অন্তর্হিত হতে থাকলেন। যাঁরা অস্তিত্বের লড়াই চালালেন, তাঁরা নিজেদের সংবাদপত্রের একজন বেতনভুক কর্মচারী হিসেবেই নিজে চিহ্নিত করলেন। সংবাদপত্রের মালিকদের কাছে দেশসেবা হয়ে দাঁড়াল নেহাত এক গৌণ ব্যাপার। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়ে উঠল সেখানে

মুখ্য। তাই সেই সময় বিভিন্ন সংবাদের হাতে-লেখা কপির ডান কোণে লেখা থাকত 'বিজ্ঞাপনের স্বার্থে'। অর্থাৎ সাংবাদিকতায় বিজ্ঞাপনের স্বার্থে যেকোনও খবরকে গুরুত্বপ্রদানের চল শুরু হল তখন থেকেই। অযোগ্য মানুষ সংবাদপত্রের মালিক বা সম্পাদক হিসেবে আসীন হলেন। শুধু আর্থিক লাভ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন না—সম্পাদক বা মালিকগোষ্ঠীর সম্মান ও প্রতিপত্তির দিকটিও তাঁদের নজর এড়াল না। ফলে, সার্বিকভাবেই ভারতীয় সংবাদপত্র মহলে এক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজে লাগানো হল খবরের কাগজগুলিকে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে মালিক বা সম্পাদকরা যেভাবে সংবাদকর্মীদের সেই সংবাদপত্র পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করতেন, সেই আন্তরিকতা আর থাকল না। মালিক পক্ষ ও সংবাদকর্মীরা তখন হয়ে দাঁড়ালেন মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে অন্বিত। সাংবাদিকতা পেশার প্রতি আদর্শের টান হল অন্তর্হিত।

যদিও এইসব নেতিবাচকতার পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদপত্রে ইতিবাচক যে-পদক্ষেপগুলি সূচিত হয়ে উঠল, সেইগুলি এইরকম—সংবাদপত্রের সজ্জা, কাগজের গুণমানবৃদ্ধি, মুদ্রণের গুণগতমান বৃদ্ধি, ভাষা ও সংবাদ পরিবেশনে নতুনত্বের আস্বাদ ইত্যাদি। তবে একথাও অনস্বীকার্য, আদর্শের সঙ্গে সমঝোতার দরুন স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সংবাদপত্রগুলিতে মিথ্যে সংবাদ, অর্ধসত্য খবর, গুজবের পাশাপাশি অশ্লীল নানা ছবির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। সেই নেতিবাচক প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজে পরিবর্তন লক্ষ করা গেল।

ভারতীয় সংবাদপত্রের এই যুগসন্ধিক্ষণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন হল। Investigative reporting অর্থাৎ (মূলত) শহরভিত্তিক অন্তর্তদণ্ডভিত্তিক সাংবাদিকতা এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রগুলির আগ্রহ। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম যাঁরা করতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার অমিতাভ চৌধুরী, যিনি 'স্ত্রীনিরপেক্ষ' ছদ্মনামে পরিচিত। এরই পাশাপাশি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ তখন উৎসুক হয়ে উঠল বিদেশের আন্তর্জাতিক খবর সংগ্রহে। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই ভারতের অন্যতম এক সংগঠিত শিল্প বা Organised Industry হিসেবে জন্ম নিতে শুরু করল সংবাদপত্র।

স্বাধীনতা পরবর্তী পরে ১৯৭০ দশকের আগে পর্যন্ত শহরভিত্তিক বড় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সেটি এই যে, বৃহৎ দৈনিকগুলি গ্রামাঞ্চলের সংবাদ পরিবেশনে আগ্রহী ছিল না। ফলে সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু নগরভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের হাতিয়ার। গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি জানতে গেলে নির্ভর করতে হত গ্রামীণ সংবাদপত্রগুলির ওপর।

৭.৩.৫ জনমানসে সাংবাদিকতা :পঞ্চম পর্ব: (১৮৭০-১৯৮৯)

১৯৭০-এর দশকে ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষিত হল। পূর্বে যে

সমস্ত পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার সিংহভাগই ছিল বাহ্যিক। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা দিল। এককথায় দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন। পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা, আবেগ, নৈতিকতা ইত্যাদি প্রায় বিলোপের পথে হাঁটল। যেকোনো খবরকে পাঠকের রুচি অনুযায়ী সাজাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল সংবাদপত্রগুলি। এমনকি বীভৎস হত্যাকাণ্ড, নারকীয় ধর্ষণ ও পরিবেশিত হতে থাকল চটুল ভাষার মোড়কে। সামাজিক দায়বদ্ধতার লেশমাত্রও সেখানে থাকল না। অর্থাৎ, হত্যা বা ধর্ষণের মতো ঘটনা শুধু 'ক্রাইম নিউজ' হিসেবেই দেখা দিল। বীভৎসতাকেও করা হল গণ্য। পাশাপাশি কিছু আদর্শবাদী সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের মতবিরোধ দেখা দিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়েও মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেই মতবিরোধের প্রেক্ষাপটে এক সংবাদপত্রের সঙ্গে অন্য সংবাদপত্রের সংঘাত বাঁধেনি। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সমলে ১৯৭০-এর দশকে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে এক সংবাদপত্রের সঙ্গে অন্য সংবাদপত্র গোষ্ঠীর ভয়ঙ্কর বিরোধ সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলল। খবরের সত্যাসত্য বিচার করতে গিয়ে পাঠকও হয়ে পড়ল বিভ্রান্ত। সংবাদকে শুধু 'পণ্য' হিসেবে প্রদর্শন করতে গিয়ে অনেক মিথ্যে গুজবকেও 'সংবাদ' হিসেবে পরিবেশন করা হল। সেই গুজবের সত্যতা যাচাই করার নৈতিক আদর্শ বা সময় কোনোটাই থাকল না সংবাদকর্মীদের।

সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীণ রূপেও দেখা দিল নানাবিধ পরিবর্তন। অতীতে অপ্রচলিত সাধু ভাষা থেকে মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনের চলিত ভাষায় লেখা হল সংবাদ। যুগের পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয়তাকে শিরোধার্য করে নিতান্ত ব্যক্তিগত। বৈষয়িক, সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম—এরকম সংবাদ বিলুপ্ত হল। জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য সংবাদপত্রে ছাপা হতে থাকল নানাবিধ চিত্র। পরে তা রঙিন চিত্রে পর্যবসিত হয়। সংবাদপত্র বাশ্যিকভাবে হয়ে উঠল পরিপাটি, ধোপদুরস্ত। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠল। সংবাদপত্রে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকল, সেগুলিতে প্রযুক্ত হল সংবাদধর্মী শব্দাবনী। ফলে বিজ্ঞাপণও এক ধরনের সংবাদ হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থিত হল। দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংবাদে আরও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করল সংবাদপত্রগুলি। শুধু ক্রীড়াজগতের সংবাদপ্রদানের স্বার্থেই বরাদ্দ হল আরও কেটা পাতা। রাজনৈতিক খবরের পাশাপাশিই তার গুরুত্ব পেতে থাকল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনোদনের সংবাদ।

১৯৭৫-এ দেশব্যাপী জারি হল জরুরি অবস্থা। সেই সময়েও ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন। তাঁর বিরোধিতা করে কোনো সংবাদপত্রে যেন কোনো সংবাদ পরিবেশিত না হয়। ফলে সংবাদপত্রগুলি তখন হয়ে উঠল সরকারের হাতের পুতুল। সরকারের নির্দেশ অমান্য করলে বিনা বিচারে কারাবাস ছিল দস্তুর। ভারতের খবর যাতে কোনোভাবে বিদেশে পরিবেশিত না হয়, সেক্ষেত্রেও জারি হয়েছিল

সরকারি নির্দেশিকা। এই জরুরি অবস্থাকে অনেকেই ব্রিটিশ রাজত্বের প্রচলিত অ্যাডামস্ গ্যাগ-এর কালা আইনের প্রত্যাবর্তক হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হওয়ায় জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে এবং সংবাদপত্রের ওপর জারি-হওয়া যাবতীয় নির্দেশিকা অর্থহীন হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

১৯৮-এর ২৫ মার্চ প্রকাশিত হয় 'আজকাল' পত্রিকা। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের সম্পাদনায় 'আজকাল' হয়ে ওঠে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কাগজ। গতানুগতিক রাজনৈতিক খবর পরিবেশনের পরিবর্তে সামাজিক সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতেন সম্পাদক। পরবর্তীকালে অশোক সেনগুপ্ত পত্রিকাটি সম্পাদার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বল্প পরিসরে কীভাবে পাঠযোগ্য সম্পাদকীয় পরিবেশন করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে ক্রীয়াসংক্রান্ত বিশেষ সংবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপ্রদানে দৈনিক সংবাদপত্রের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দেওয়া যায়—সেই দিকদর্শনে 'আজকাল' ছিল পথিকৃৎ। দৈনন্দিন ঘটনাবলীকে নানা সূত্রে যাচাই করে প্রায় ক্রুশেঢ জার্নালিজম (cRUSADE JOURNALISM)-এর ভঙ্গিতে সংবাদের অন্তর্তদন্তের ক্ষেত্রে 'আজকাল'-এর সমান্তরাল কোনো সংবাদপত্র সমকালে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এই 'আজকাল' পত্রিকাই প্রথম সান্ধ্য দৈনিকের প্রচলন করে—নাম ছিল 'সান্ধ্য আজকাল'। পরবর্তীকালে এই প্রকাশন সংস্থা থেকে মুক্তির আলো দেখে টেলিভিশন সংক্রান্ত পত্রিকা 'টেলিভিশন' কিশোর পত্রিকা 'সকাল', খেলাবিষয়ক পত্রিকা 'খেলা'।

১৯৮৪-র ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় বরুণ সেনগুএপ্তর মালিকানায় এবং সম্পাদিত 'বর্তমান'। গ্রামীণ সংবাদকে বিহেষ গুরুত্বপ্রদান করা হত এই পত্রিকায়।

বিশ শতকের আশির দশক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। পাঞ্জাবের খলিস্তান আন্দোলন, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামজন্মভূমি কেন্দ্রিক বিতর্ক ইন্দিরা, গান্ধীব, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পশ্চিমবঙ্গে কামতাপুরী আন্দোলন, আসামের বোড়ো আন্দোলন দেশকে নানা চক্রান্তের শিকার করে তোলে। সমগ্র সময় জুড়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাবের 'পাঞ্জাব কেশরী' এবং 'হিন্দ সমাচার'-এর ফলে সবচেয়ে বেশি হিংসার শিকার হয়। দেশের বহু সাংবাদিক উগ্রপন্থী আন্দোলনের শিকার হন এবং অনেকে প্রাণ হারান।

বিশ শতকের শেষে সংবাদপত্রের জগতে জগতে সাংবাদিকতার এক সংকট তৈরি হল। এই সংকটের মূল কারণ ছিল দূরদর্শন বা টেলিভিশনের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ সংঘাত ও প্রতিযোগিতা। টেলিভিশনের প্রচলন শুরু হওয়ায় মানুষ স্বজ্ঞভাবিকভাবেই দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হল— যা শুধু দৃশ্যমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না স্বাভাবিকভাবেই। ১৯৯৪-এ কোল টিভির প্রচলনের পর এই সংঘাত ও সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠল। সংবাদপত্র ??? মানুষ যে-সংবাদ জানতে পারত, তা আগে-ঘটে-যাওয়া বিশেষত, গতদিনের। টেলিভিশনের কেবল

চ্যানেল আমার পর মানুষ বর্তমানের সংবাদ সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করার অবকাশ পেল। ফলে সংবাদপত্র হয়ে উঠতে থাকল 'প্রাচীন'। টেলিভিশনের এই তাংক্ষণিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না সংবাদপত্রগুলি। তখন অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে দূরদর্শনের নেতিবাচক দিকগুলিকে সংবাদপত্রের খাতিরে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হল। সাংবাদিকের পক্ষ থেকে সংবাদচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা হল, যাতে পাঠক সংবাদটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যে-চিত্র টেলিভিশনে দেখা যায়নি, চেষ্টা করা হল, যাতে সেই অ-দেখা ছবি সংবাদমাধ্যমে মুদ্রণ করা যায়। অনুসন্ধানমূলক তথ্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রের সীমিত পৃষ্ঠসংখ্যার প্রসার ঘটল। সপ্তাহে একাধিক দিন ছাপা হতে থাকল ক্রোড়পত্র বা supplimentary। সেইসব ক্রোড়পত্রগুলি ছিল মূলত বিনোদনমূলক। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের চাহিদাকে মাথায় রেখে নানা পেশাগতা কর্মখালি বা পড়াশোনার সংবাদ-ও পরিবেশিত হতে থাকল। সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষনকে ধরে রাখাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩.৬ জনমানসে সাংবাদিকতা : ষষ্ঠ পর্ব (১৯৯০-একবিংশ শতাব্দী)

বিশ শতকের শেষেই, ১৯৯৩-এ, কেন্দ্রীয় সরকার মুক্ত অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে আবারও পরিবর্তন আসে। অর্থনীতি 'মুক্ত' হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগ শুরু হল। প্রতিটি কোম্পানি চাইল, বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে নিজেদের ভারতের বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই মুদ্রণসুযোগকে কাজে লাগাল বিভিন্ন সংবাদপত্রসংস্থা। অর্থনীতি ও বাণিজ্যসংক্রান্ত পত্রপত্রিকার হঠাৎ নতুন প্রকাশ ঘটল। বিজ্ঞাপণ মুদ্রণ, প্রেস কনফারেন্সের সংবাদ, ইণ্টারভিউ—ইত্যাদির মাধ্যমে সংবাদসংস্থাগুলি আয়ের এক নতুন উৎস খুঁজে পেল। এই উৎসই আরও অনুকূল হল যখন একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির সংবাদপত্রের জগতে অনুপ্রবেশ অটুট রয়ে গেল। সংবাদপত্রগুলির মালিক হলেন পুঁজিপতি—যাঁরা অধিকাংশক্ষেত্রেই কোনো কর্পোরেট সেক্টরের বাসিন্দা। পাশাপাশি দেখা গেল আরেক গোষ্ঠীকে, যাদের নিজস্ব টাকা নেই; কিন্তু অন্যের টাকায় মগজ ব্যবহার করে ব্যবসাকে অর্থকরী বা লাভজনক করে তুলতে পারেন। এঁরা হলেন বিভিন্ন চিট ফাণ্ডের মালিক।

ফলে রাতারাতি পাল্টে গেল বাংলা সাংবাদিকতার মান। কম দাকে অনেক পৃষ্ঠার সংবাদপত্র প্রচলিত হল। দু'টাকায় তিরিশ পাতা, কখনো ছত্রিশ পাতার কাগজ—রঙিন মুদ্রণ, সঙ্গে উত্তেজক নানা চিত্রে ভরপুর 'বিনোদনে'র ক্রোড়পত্র। প্রভাবস্বরূপ পাঠকচরিত্রও বদলাতে শুরু করল। শিক্ষিত সচেতন পাঠকগোষ্ঠী এধরনের সংবাদপত্র থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন ঠিকই; কিন্তু বৃহত্তর সমাজ সংবাদপত্রের সেই পপ্রলোভনকে অস্বীকার করে দূরে থাকতে পারল না। ২০১০-এর পর দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গই ঝড় উঠছে চিট ফাণ্ডের তীর্থক্ষেত্র। সরকারি হিসেবে প্রায় ৬২টি অর্থলগ্নীকারক সংস্থা কলকাতা ও

তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় বিপুল লাভজনক ব্যবসা করেছে, বেসরকারি হিসেবে সেইসব সংস্থাগুলির সংখ্যা ১৮৭। এই সংস্থাগুলি স্বাভাবিকভাবেই 'টার্গেট' করেছিল সংবাদপত্রগুলিকে। সেই কারণেই লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই সময় থেকেই একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা। াবশ্য, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নতুন প্রস্তাবনা সংবাদপত্র বাজার দখল করায় অনেক তরুণ তরুণীর রোজগারের পথ খুলে যায়। হাতে-কলমে কাজ শেখারও কাজ করার সুযোগ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নতুন সংবাদকর্মরা। পরোক্ষভাবে সেটিতে কিছু পেশাদার ব্যক্তি বা সংস্থারও লাভ হয়েছিল।

সংবাদপত্র প্রকাশনার জগতে এই আমূল পালাবাদরে ফলে লক্ষণীয় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা গেল সাংবাদিকদের মধ্যে। সৎ ও আদর্শবাদী যে সমস্ত সাংবাদিক, সাংবাদিকতা পেশাকে আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের একাংশ স্রোতের অনুকূলে ভেসে গেলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রভূত অর্থ উপার্জন।

পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়ে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে কিছু কিছু সংবাদপত্র তখন অভূতপূর্ব কিছু নতুননত্বের আমদানি করল। সেইসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কথা-বলা সংবাদপত্র বা Talking Newspaper। প্রথমে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মূলত দৃষ্টিহীন মানুষদের কথা ভেবেই এই ধরনের সংবাদত্রের ধারণা এনেছিল। পরবর্তীকালে সেই ভাবনাকেই ভরকেন্দ্রে হেরখে ভক্সওয়াগন নামক গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি প্রথম পাঁচ কোটি টাকা খরচে করে কথা বলা সংবাদপত্র সৃষ্টি করে। ২০১০-এ 'Times of India'-র দিল্লি, বোম্বে, ব্যাঙ্গালের, পুণে এবত চেন্নাই শাখার তাদের নতুন নির্মিত গাড়ির প্রচারাহনর্থে বিজ্ঞাপনটি ওই কথা-বলা সংবাদপত্রের অঙ্গীভূত করে দেয়। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল একেবারে অন্তিম পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রের প্রথম ভাঁজটি খোলামাত্রই গজতে শুরু করেছিল একটি রোবোটিক কণ্ঠস্বর, যা পাঠকদের ওই কোম্পানি-নির্মিত গাড়ির বিবিধ গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন করছিল। চমকের এই নতুনত্বের পাঠকের মুখে মুখে ফিরছিল বিজ্ঞাপনটি এবং বিজ্ঞাপনী প্রচারের সেই অত্যাশ্চর্য স্ট্র্যাটেজি যাকে বিজ্ঞাপণী পরিভাষঅয় বলা যায় Unique Selling Proposition বা USP।

বছর দুয়েক পর ভক্সওয়াগন আবার চমক নিয়ে হাজির হয়। তাঁদের কোম্পানির নতুন দুটি গাড়ির catchline ছিল— 'Feel the shiever of excitement'। এক্ষেত্রেও একাধিক সংবাদপত্রের শেষপৃষ্ঠায় আঙুল ছোঁয়ানোমাত্র সমগ্র শরীরে বয়ে যেত একটা শিহরণ (vibration)। পরে দেখা যায়, বিজ্ঞাপণটির নির্দিষ্ট অংশে লাগানো আছে একটি vibrator। বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞাপনটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সেটি ছিল অভিনব।

বর্তমানের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাক্ষরতার হার বাড়তে থাকায় সংবাদপত্রের প্রচার বেড়েছে। সংবাদপত্রকে এখন ডিজিটাল যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে হচ্ছে। ফল মিডিয়া জগতে প্রচার ও প্রসারের

লক্ষ্যে সমস্ত সংবাদপত্র এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ই-পেপারের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। ফলে, সংবাদপত্রের সার্কুলেশন এবং দুটি ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ডিজিটাল প্রযুক্তিতেই অত্মসমর্পণ করবে সংবাদপত্র। প্রিণ্ট মিডিয়া থাকলেও আয়ের জন্য তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ওপরেই নির্ভরশীল হতে হবে। আগামী প্রজন্মের পাঠক হয়তো কোনোদিন 'সংবাদপত্র' বলতে ই-পেপারকেই বুঝকে—সংবাদপত্রের প্রিরট মিডিয়া তাদের কাছে থেকে যাবে না-দেখানে এক অতীতের ফসিল হিসেবেই। সংবাদপত্রের ই-পেপার তখন হয়ে দাঁড়াবে Branding-এর মূল ভরকেন্দ্র।

৭.৪ জনমানসে সাংবাদিকতা (বৈদ্যুতিন মাধ্যম)

আগের উপপত্রকে আমরা দেখেছি, মুদ্রিত মাধ্যম সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা কীভাবে জনমানসকে প্রভাবিত করতে পারে। এই উপএককে আমরা জনমানসে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকতা আলোচনা করব।

সাধারণবাবে সাংবাদিকতা কী করে? গণতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণকে পারিপার্শ্বিক ও বৈশ্বিক সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। সাংবাদিকতার নানাবিধ অঙ্গ। প্রকারভেদসহ, জনমানসে তার প্রভাব সংক্ষেপে এইরকম—

সাংবাদিক যখন কোনো একটি ঘটনার বিবৃতি প্রদান করেন, তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই সংবাদের শিরোনাম। শিরোনাম দেখামাত্র সংবাদটি জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। শিরোনামের উপরেই মূলত নির্ভর করে কোনো একটি সংবাদ পাঠক পড়বেন বা দেখবেন কিনা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিরোনামটি করা হয়। চিত্তাকর্ষক। সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য পেশার প্রতি সং থেকে মানুষের কাছে সংবাদ পরিবেশন করা। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, নৈতিক মূল্যবোধের বিসর্জনে এমনভাবে সংবাদ, পরিবেশিত হয়, যাতে মানুষ সেই সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। যেমন, ধরা যাক, একই সমধারী দুজন মানুষ—একজন বিখ্যাত, ান্যজন খ্যাতিহীন সাধারণ মানুষ। কখনও দেখা যায়, সমমাসী হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খ্যাতিহীন সাধারণ মানুষটি সংক্রান্ত মেন চমকপ্রদ কোনো ঘটনার বিবরণ সংবাদে পরিবেশিত হচ্ছে, যাতে শিরোনামে ব্যক্তিটির নাম দেখামাত্র তা বিখ্যাত ব্যক্তিটির নাম স্মরণ করিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। পাঠক সম্পূর্ণ সংবাদটি জানার পরয বুঝতে পারছেন সাংবাদিকের সংবাদ পরিবেশনের এই কৌশলটি।

একথা অনস্বীকার্য যে, সাংবাদিকতার আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকেই তাদের সংবাদের উৎস বা উপাদান সংগ্রহ করেন। ফলে সেই উপাদান হওয়া উচিত বিশ্বাসযোগ্য। ক্ষেত্রসমীক্ষা ব্যতিরেকে

সফল সাংবাদিকতা সম্ভব নয়। ধরা যাক, কোনো একটি দুর্ঘটনা ঘটল। একজন সাংবদ্ধাদিক কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, দুর্ঘটনার কারণ কী? তিনি সেই অনুযায়ী তাঁর প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করলেন। পাঠক বা দর্শক সেটি পড়ল বা দেখল। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল, যেসব মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিল। তারা পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে দুর্ঘটনার আসল কারণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ফলে কোনো সংবাদ কতখানি সত্য, তা যাচাই না করলে সেই অর্ধসত্য সাংবাদিকতার পাঠক নিরাশ হন।

ব্রডকাস্ট বা যন্ত্রচার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেতার ও টেলিভিশনকে ব্যবহার করা হয়। সংবাদ ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সম্প্রচারই সেখানে মূল লক্ষ্য। সংবাদ, বুলেটিন, তথ্যচিত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য তথ্য ও পরিসংখ্যামূলক অনুষ্ঠান এই যন্ত্রচার সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্ত। এই সাংবাদিকতা অত্যন্ত সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। কারণ দিনের প্রতিটি মুহূর্তে সাংবাদিককে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হয়, নাহলেই মুহূর্তের 'Breaking News'টি তিনি অধরা থেকে যাবে। তাই কোন্ সময় কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ Breaking News এবং সম্প্রচার প্রয়োজন, সাংবাদিকতার সেই প্রাথমিক জ্ঞানটি থাকা দরকার সাংবাদিকের। Breaking News এমন হওয়া উচিত যা জনমানসে প্রভাব সৃষ্টি করলেও তা এমন উত্তেজনা জাগাবে না যাতে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হবে। যেহেতু এই ধরনের সাংবাদিকতায় প্রোডিউসার, নিউজ অ্যাঙ্কর, ক্যামেরাম্যান বিভিন্ন মানুষের দলীয় সমন্বয় প্রয়োজন পড়ে, তাই সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতার মাথায় রাখতে হয়, যিনি সেই খবর পড়বেন, তিনি সমাজ-প্রচলিত 'সুন্দর' বা 'সুন্দরী' না হলেও যেন 'presentable' হব, না হলে মানুষ তাঁকে দেখতে চাইবেন না। এর পাশাপাশি তাঁর কণ্ঠস্বর হওয়া উচিত যথাযথ, উচ্চারণ হওয়া উচিত পরিষ্কার ও সুষ্ঠ। দর্শক যদি একবার অনুভব করেন, অমুক নিউজ অ্যাঙ্কর ভালো খবর পড়তে পারেন না, তাহলে তিনি সেই নিউজ অ্যাঙ্কর এবং প্রয়োজনবোধে সেই খবরের চ্যানেল ছেড়ে অন্য খবরের চ্যানেলে নিজের অবস্থান মুহূর্তে পরিবর্তন করবেন।

চিত্র সাংবাদিকতা কীভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম? হাজার শব্দ দিয়ে যা বর্ণনা করা সম্ভভ নয়, তা চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা সম্ভব। ফলে চিত্র সাংবাদিকতা এক অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম, যা একইসঙ্গে উৎকর্ষের বাহক ও সর্বনাশের দূত। চিত্র সাংবাদিকতা মুহূর্তের মধ্যে কোনও অখ্যাতকে খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত করতে পরে। আবার সেই শীর্ষ থেকে পূর্বের অবস্থান বা তার চেয়েও নিম্নগামী কোনো াবস্থানে তাকে স্থিত করতে পারে চিত্র সাংবাদিকতাই। সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের সঙ্গে সংযোগস্থাপন। কাজেই, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, চিত্র সাংবাদিকতার কারণে কোনো নিরুদ্দিষ্ট তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাচ্ছেন, কোনো-মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হলে সেই ছবি প্রকাশনার পর অসহায় মানুষটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার পাচ্ছেন। আবার এর পাশাপাশিই কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের যদি এমন কোনো আবরণ চিত্র

সাংবাদিকের ক্যামেরাবন্দী হয়, যা সমাজের চোখে ইতিবাচক নয়, তবে তা স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে এই প্রতিক্রিয়া জাগায় যে, 'এই লোকটা এরকম? আমরা তো জানতামই না! ভাগ্যিস ক্যামেরার এর কাণ্ড ধরা পড়ল!' তবে, চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোন ঘটনা চিত্রবন্দী করা হবে, তা বিহেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, একজনে বিখ্যাত চিত্র সাংবাদক একটি ছবি তুলেছিলেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে অপুষ্টিহীন এক শিশুর সামনে এক হিংস্র প্রাণী। এই ছবি বহু পরষ্কারে ভূষিত হলেও সেই চিত্র সাংবাদিক ওই চিত্রগ্রহণের নৈতিক দায় অস্বীকার করতে না পেরে আত্মহননের পথ নির্বাচন করেছিলেন। কোনো হিংসাত্মক বা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিতে পারে এরকম চিত্র ক্ষেত্র বিশেযে লোভনীয় হলেও সাংবাদিকতার নিরিখে সেগুলি পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, একটি বিখ্যাত ইংরিজি ট্যাবলয়েডের প্রথম পাতায় একবার একটি বিস্ফোরণ-পরবর্তী রক্তাকক্ষত চিত্র প্রকাশের পর, বহু মানুষের আপাত উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। অর্থাৎ এককথায়, বাণিজ্যিক স্বার্থে, অর্থ উপার্জনের তাগিদে, আলোচনার বা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার লক্ষ্যে চিত্র সাংবাদিকতার চিত্রের প্রবৃত্ত নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তদন্তমূলক সাংবাদিকতা কী? যে-প্রতিবেদন কোনো অপরাধ, দুর্ণীতি কিংবা বেআইনি কর্মকারেডর সংবাদ পেশের প্রয়োজনে তদন্তের ভিত্তিভূমিতে স্থিত হয়, তাকেই বলে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা। প্রথাগত সাংবাদিকতার বিপরীত্রেত দাঁড়িয়ে এই ধরনের সাংবাদিকতার অনেক ক্ষেত্রসমীক্ষা ও নিরীক্ষার পর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদটিও হয় বিস্তৃত। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, এইধরণের অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন বিভিন্ন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। কাজেই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা না হলে জনমানসে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেকা দিতে পারে। তদন্ত করতে গিয়ে যেদি কোনো শূন্যস্থান বা সমস্যার জট না ছাহনড়ে, তাহলে তাকে সেই অবস্থাতেই প্রবেশন করন্ধ দরকানরে। 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' তার পরিবেশন কাম্য নয়। সাধারণত জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার অন্তর্ভূক্ত। মানুষ প্রতি কিস্তিতে সেই প্রতিবেদন পড়েন এবং সম্ভাব্য সত্য ঘটনাটির সঙ্গে নিজে পরিচিত হন।

জনসাধারণের খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ উদ্‌বোধিত করে তোলে ক্রীড়া সাংবাদিকতা। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোন্ নামী বা অনামী খেলোয়াড় প্রায় প্রতিদিন নতুন নজির গড়ে তুলেছেন, কোন্ বিখ্যাত খেলোয়াড় জনগণের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হলেন—এসমস্ত সংবাদ পরিবেশন করাই ক্রীড়া সাংবাদিকতার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের মতো তৃতীয় বিশেষর ক্রিকেট-উন্মাদ দেশে এই ক্রীড়া সাংবাদিকতা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আজ নতুন করে জানানোর নেই। যখন সমাজমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্ম হয়নি, তখন দূরদর্শনে ক্রিকেট বিশ্বকাপ লাইভ দেখার পরের দিন পাড়ার চায়ের দোকানে, অফিসের আড্ডায়, ছোট কোনো জমায়েতের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, 'অমুক ক্রিকেটার

ভালোই-না খেললেন', 'তমুক তো বলাটা ঠিক দেখতেই পেল না', 'অমুককে দেখলে, কী সুন্দর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচটা নিল', 'যাই বল, তমুক কিছু আউট ছিল না—স্পষ্ট দেখলাম ফিল্ডারের হাতে ক্যাচটা পৌঁছানো অগে বল মাটি ছুঁয়েছিল' ইত্যাদি। সংবাদমাধ্যমে এই ধরনের সাংদিকতার ক্ষেত্রে যদি মুহূর্তের ভুলে কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়, তাহলে জনমানসে তার নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

সাংবাদিকতার একটি প্রচার হল ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতা। সেটা কী? যেসমস্ত খবরে উত্তেজনা থাকে বা যেসব বিষয়ে গাল-গল্প-গুজব মিশ্রিত হয়, সেই ধরনের সংবাদ যখন পাঠকের বা দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য অতিরঞ্জিতভাবে পরিবেশিত হয়, তখনই তাকে ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতা বলে। আগে এই ব্যাপারটিই ছিল হলুদ সাংবাদিকতা বা Yellow Journalism। সেখানে থরাকত নান গুজব, কেচ্ছা। বর্তমানে ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতার মূল ভরকেন্দ্র কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব—হতে পারে, তিনি ক্রীড়াজগতের, রাজনীতির বিনোদন জগতের। ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতার কারণেই পাপারাৎজির উত্থান। কিন্তু পাপারাৎজির কাণ্ডকারখানা যখন সীমাতিক্রমী হয়, তখন তা জনমানসে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন, প্রিন্স ডায়না যখন পাপারাৎজির হাত থেকে বাঁচতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা যান, তখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ সেই প্রাণনাশী ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতা। সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধন-ই এই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। এই উন্নয়নমূলক সাংবাদিকতার কাজ কী? সরকারি কর্মসূচী প্রকল্প ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে জনগণের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবেদনের আকারে পরিবেশন করা। যেমন, যেসমস্ত মানুষ সরকারি খাতাকলমে কোনো কেটি নির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধালাভের জন্য নথিভুক্ত, বাস্তবে দেখা যায়, কোনো বিশেষ কারণে তিনি বা তাঁরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উন্নয়নশীল সাংবাদিকতা এই বিষয়টিতে আলোকপাত করায় জনগর সচেতন হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি উদ্যোগে সেইৈ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়।

সাংবাদিকতার নানাবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী হল ডিজিটাল সাংবাদিকতা। সেটা কী? ইন্টারনেটে বা আন্তর্জালভিত্তিক সাংবাদিকতা। এই সাংবাদিকতার সূত্রেই জন্মলাভ করেছে নানা পরিভাষা—অনলাইন সাংবাদিকতা, সাইবার সাংবাদিকতা ইত্যাদি। ডিজিট্যাল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্য ও সংবাদের জোগান অফুরান অথচ উৎপাদন খরচ সাধ্যাতীত। অনেকক্ষেত্রে তাই দেখা যায় যে, একজন সাধারণ মানুষ তার সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরাযুক্ত মোবাইলে কোনো একটি ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দী করে তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট বা আপলোড করছেন। ডিজিটাল সাংবাদিকতার এই দিকটি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এতই আকর্ষক হয়ে উঠেছে যে, তাঁরা এই ডিজিট্যাল সাংবাদিকতাকে

নিজেদের জীবনের পেশায় রূপান্তর করেছেন। ডিজিট্যাল মিডিয়া পেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, ডিজিটাল বিপনি বিশেষজ্ঞ, কনটেন্ট ক্রিয়েটার, ডিজিটাল সাংবাদিক প্রমুখ।

বর্তমান যুগে সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি ও প্রভাব বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত। মিডিয়া বা সংবাদপত্র আজ শুধু একটি শিল্প নয়; তা দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক নানা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। অতীতে সাংবাদিকতা ছিল শুধু ছাপাখানা নির্ভর। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির 'কল্যাণে' সেই ব্যপ্ত এখন কে আঙুলের স্পর্শের অপেক্ষায়। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রের 'online edition' আজ জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছে। কোভিড মহামারী চলাকালীন অনেক মানুষই hard copy-তে সংবাদপত্র কেনা বন্ধ করেছিলেন। দেখা গেছে, কোভিড মহামারী বিদায় নিলেও পাঠকের এক বৃশৎ অংশ পুনরায় সেই hard copy-র সংবাদপত্র কেনার অভ্যেসে ফিরে আসেননি। তাঁরা বিভিন্ন সংবাদপত্রের e-edition নিজের সুবিধা ও সুযোগমত পড়ছেন। এতে প্রথমত তাঁদের অর্থ সাশ্রয় ঘটছে, দ্বিতীয়ত সর্বক্ষণ খবরকে নিজের পকেটবন্দী করা যাচ্ছে।

গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিপ্লব এনেছে স্যাটেলাইট টিভি, অনলাইন টিভি, কমিউনিটি ও সিটিজেন রেডিও ব্লগ। এর পাশাপাশিই বর্তমানে সাংবাদিকতায় AI (Artificial Intelligence) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে।

পারিপার্শ্বিক নানা হিংসাত্মক ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিককে সেই সব ঘটনা পরিবেশিত করতে হয়। কখনো সেই সাংবাদ ভিন্ন হিংসার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ সাবাদিক যদি এমনভাবে পক্ষপাজদুষ্ট খবর প্রচার করেন যে, অমুক ধর্ম সম্প্রদায় তমুক ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করেছে, তাহলে তা ধর্মোন্মাদ দেশে সাম্প্রদায়িক ভিদে ও হিংসার জন্ম দেবে। বর্তমানে ঠিক ক'টি সংবাদ মানুষকে একটি শান্তিকামী ও সুস্থ নিরুদবিগ্ন সমাজের কথা বলে? এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শান্তিকামী সাংবাদিকতা বা peace journalism। পক্ষ ও বিপক্ষের নানা মতভেদ সত্বেও পরিহেযে সংঘাত নিরাশন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকতার প্রার্থিত ভূমিকার পক্ষে তাই অধিকাংশ মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন।

ঠিক এই কারণেই সাংবাদিকতায় 'Fake News' বা ভুয়ো খবর-এর প্রচারের প্রতি মানুষ একসময় আকর্ষণ বোধ করলেও কালক্রমে তার বিরুদ্ধে জনমানস গঠিত হয়েছে। সমাজমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ায় তাঁরা তীব্র ভাষায় এই ধরণের খবরকে আক্রমণ করছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেকা যায়, সাংবাদিক যদি কোনো মানুষ বা প্রাণীর প্রতি অন্যায্য আচরণ করেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। 'body shaming' করেন, তাহলে মানুষ সেটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেন না। সেই সংবাদ মুদ্রিতমাধ্যমে প্রকাশিত হলে মানুষ চিঠি লিখে তার

প্রতিক্রিয়া জানান। বর্তমানে সেই পদ্ধতির পরিবর্তে খবরটির ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত দ্রুত। ফলে অতীতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা যেমন একতরফা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করত; বর্তমান প্রযুক্তির দুনিয়ায় জনমানসও সমানভাবে সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষক। তাই পূর্বের তুলনায় সাংবদ্ধাদিকতা-পেশায়-যুক্ত মানুষ অনেক বেশি সচেতন। তিনি জানেন, তাঁর সামান্য ত্রুটিও মানুষ ক্ষমা করবেন না। তাই তাঁকে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনেক ভেবেচিন্তে হব্দ প্রয়োগ করতে হয়। মুহূর্তের ভুলেই তাঁকে নিয়তো 'ট্রেলিং'-এর শিকার হতে হবে।

স্বাভাবিকবাবে এই 'ট্রোল' যারা করেন, তৃাদের সিংহভাগ নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আর এই সূত্রেই ক্রমে জন্মলাভ করেছে নাগরিক সাংবাদিনকতা বা Citizen Journalism। কী এই নাগরিক সাবাদিন্কতা? পেশাদার সাংবাদিক নন, অথচ যেমন মানুষ ওয়েবসাইট, ব্লগ, সমাজমাধ্যমে ব্যবহারে তথ্য প্রচার করেন, এমন ব্যক্তি যখন সাংবাদিকতাকে পরিচালনা করেন, তখন সেটিই হল নাগরিক সাংবাদিকতা। এই 'নাগরিক সাংবাদিকরা প্রশিক্ষিত পেশাদার সাংবাদিকদের মতো নির্ভরযোগ্য কিনা, সেই নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই নাগরিক সাংবাদিকতা বিহেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। ধরা যাক, কোনো একটি স্থানে হঠাৎ কোনো দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই অঞ্চলের নাগরিকরা ঘটনাস্থল থেকে তাৎক্ষরিক পাঠ্য ও দৃশ্যগ্রাহ্য (visual) প্রতিবেদন প্রদান করছেন। তাই দেখা যায়, রাজনৈতিক উত্থান-পতনে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন দেশের মানুষ এবং যেসমস্ত দেশে সরকারই প্রিন্ট তথা ব্রতকাস্ট মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, সেই দেশের নাগরিক হটস্পট সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদানেরড় জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করছে।

প্রযুক্তিগত বিস্ফোরণের কারণে একবিংশ শতককে বলা হয় 'নতুন মাধ্যম' বা New Media'-র যুগ। এই যুগে প্রত্যেকেই চায় প্রচারের আলোয় বিরাজ করতে। আর সেটি করতে গিয়েই অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সাংবাদিকরা সাংবাদিকতাকে হাস্যাসুদ করে তুলছেন। যেমন, প্রবল বর্ষায় যখন রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে, তখন সেই দুর্যোগের ছবি 'সবার আগে' 'প্রাণবন্ত' ও 'বিশ্বাসযোগ্য' করে তোলার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা এক হাঁটু কখনো কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে হাস্যকরভাবে লাইভ বিবৃতি দিয়ে চলেন। কেন তাঁনরো এমনটা করেন? তাঁরা ভাবেন, দর্শক ওই দৃশ্য দেখে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচনার পাশাপাশি ওই নিউজ চ্যানেলের উদ্দেশে সাধুবাদ প্রদান করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেকা যায় ঠিক তার বিপরীত ঘটনা। ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক স্বার্থে এহেন জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ সাংবাদিকতার মানুষ মোটেও প্রসন্ন হন না—বরং সাংবাদ চ্যানেলটির প্রতিই বিরক্তিপ্রদর্শন করেন।

বোর দেখে নেওয়া যাক, জনমানসে সাংবাদিকতার প্রভাব বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ কী বলেছেন?

১. Gwen Ifill–'Without journalism, there is no democracy. Without Journalism, there is no freedom'

২. G.K. Chesterton—'Journalism is popular, but it is popular mainly as fiction. Life is one world, and life seen in the newspapers is another.'

৩. Rupert Murdoch–'Journalism is a public trust, a respossibility to report the truth with accuracy and fairness. Journalism is also a business, and like any business, it has to attract customers.

৪. Henry Anatole Grunwald–'Journalism can never be silent" that is its greatest virtue and its greatest fault.'

৫. Malcolm Turnbull–'A Journalist's job is not to make judgements; it is to provide information.'

৬. Anas Aremeyaw Anas–'Journalism is almost results. It's alcont affecting your community or society in the most progressive way.'

৭. Soledad O'Brien–'Journalism can be a gateway to positive change in society, or it can perpetuate the status quo.'

৮. Cory Booker–'Good journalism gives people the information they ned to live their lives. Great journalism takes it further, giving people the tools to change their lives.'

৯. Christione Amampour–'Journalism's ultimate purpose is to inform and educate the public, spark debate and hold power to account.'

১০. Dan Rather–'The rise of social media has transformed journalism into a conversation rather than a monologue.'

৭.৫ সারাংশ

১৭৮০ থেকে অর্থাৎ জেমস হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বর্তমানে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্র মুদ্রিত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংবাদপত্রগুলি কালের নিরিখে তাদের সাংবাদিকতার ধরণে কীভাবে জনমানসক প্রভাবিত করেছিল, সেটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুদ্রিত মাধ্যম ছাড়া প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকতায় মানুষ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে, একবিংশ শতকের new media-র

যুগে জনমানস-ও কীভাবে সাংবাদিকতাকে পরেভাবিত করেছে, সেটি এই এককের দ্বিতীয়ার্ধে আলোচিত হয়েছে। জনমানসে সাংবাদিকতার প্রভাব বিষয়ে বিভিন্ন যুগের নানা ব্যক্তিত্ব মন্তব্য করেছেন। অসংখ্য বক্তরব্যের মধ্যে থেকে নির্বাচিত কয়েকটি শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে এই এককে পরিবেশিত হয়েছে।

৭.৬ অনুশীলনী

(ক) বিস্তৃত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রাক্-স্বাধীনতা মুদ্রিত মাধ্যমের সাংবাদিকতা কীভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল, আলোচনা করুন।

২. প্রাচ্যভাষা প্রেম আইন সাংবাদিকতাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।

৩. সমকালীন সাংবাদিকতা কীভাবে সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে জনমত গড়ে তুলেছিল?

৪. সামাজিক সংগঠনগুলি কীভাবে সাংবাদিকতাকে সামাজিক সচেতনতা প্রসারে ব্যবহার করেছিল?

৫. সাংবাদিকতার দুটি ইতিবাচক প্রভাব উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'সাংবাদিকতা নিরপেক্ষা না হলে তা জনমানসে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'—মন্তব্যটির পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার যুক্তি সাজান।

২. একটি উদাহরণ সহ নাগরিক সাংবাদিকতার প্রভাব বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

৩. মুদ্রিত মাধ্যমের সাংবাদিকতা কীভাবে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করে, উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

৪. সাংবাদিকতা কীভাবে বিতর্কের জন্ম দিয়ে জনমানসে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, সাম্প্রতিককেটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. Fake news journalism-কে আপনি সমর্থন করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

(গ) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. ভারতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোন্‌টি?

২. 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক কে ছিলেন?

৩. 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রত্রিকা কবে প্রকাশিত হয়?

৪. 'Indigo Mirror' কার লেখা?

৫. গুজরাটি-ভাষায়-প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের উল্লেখ করুন।

৬. প্রাচ্যভাষা আইন কবে কার্যকর হয়?

৭. ডিজিটাল সাংবাদিকতার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের নামোল্লেখ করুন।

৭.৭ সহায়ক গ্রন্থ :

১. 'ভারতীয় সাংবাদপত্রের বিবর্তন ও প্রভাব', মুজিত রায়, দে পাবলিকেশন্‌স, বইমেলা, ২০১৩।

২. 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ-জানুয়ারি ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৭।

৩. 'সাংবাদিকতা-ধারণা ও প্রকারভেদ', ড: পল্লব মুখোপাধ্যায়, পি. জি. জে. এস. সি, সপ্তম পত্র (খ), নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথঙ সংস্করণ-জুলাই, ২০২৩।

৪. 'সাংবাদিকতার বিবর্তন : প্রতিপক্ষ ও স্বাধীনতা' হারুল হাবীব, 'যুগান্তর' ৩১ জানুয়ারি, ২০২২। (https://www.jugantar.com/tp-ub-editorial/515457)